শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

গৌর রাধে শ্যাম। জয় হরে কৃষ্ণ হরে রাম।

চরিত-সুধা

অর্থাৎ

মদ্ রাধারমণ চরণদাস দেব বাবাজী মহাশয়ের

জীবনচরিত

প্রথম খণ্ড

তৃতীয় সংস্করণ

প্রকাশক

শ্রীরামদাস বাবাজী

শ্রীধাম নবদ্বীপ

শ্রীরাধারমণ বাগ

—৪৬৪

মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।


শ্রী
রাধারমণ
প্রেস

নিবেদন

অশেষ মঙ্গলময় পরম করুণিক শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীশ্রীরাধারমণ চরণদাস দেব বিগত ১২৬০ সালে পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়া ১৩১২ সাল পর্য্যন্ত ভারতের নানাদিক্‌দেশ পরিভ্রমণপূর্ব্বক কলি-পাবনাবতার পরমদয়াল প্রেমদাতা শ্রীশ্রীনিতাইগৌরাঙ্গ ও শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দদেবের নামলীলাগুণগানে অসংখ্য ভগবদ্বিমুখী, নাস্তিক, মদ্যপায়ী, অসচ্চরিত্র, প্রাণিহিংসক, দেবদ্বিজগুরুবৈষ্ণবদ্বেষী, কলিহত, মায়ামুগ্ধ, ঘোর পাষণ্ড মাদৃশ জীবাধমকে ভগবদুন্মুখী, বিশুদ্ধ ভক্তিপথের পথিক ও ধর্ম্মপরায়ণ করতঃ জগতের অশেষ কল্যাণসাধন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সেই নিরুপম লীলাখেলার কথা প্রকাশ করিতে যাওয়া আমাদের ন্যায় অজ্ঞ জীবের পক্ষে সম্পূর্ণ ধৃষ্টতা বই আর কিছুই নহে। তাঁহার পবিত্র ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্য-পরিপূর্ণ রসময় চরিত্র প্রকাশ করিতে গিয়া লীলা-সমূহের বা উপদেশাবলীর নিগূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করিতে না পারায় হয় ত হিতে বিপরীত হইবে, এই ভয়ে এই দুঃসাহসিক কার্য্য হইতে আমরা এতদিন বিরত ছিলাম।

গত বৎসর আমি শ্রীধাম বৃন্দাবন গিয়াছিলাম। তথায় শ্রীশ্রীরাধা-রমণদেবের সেবাইত পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত রাধারমণ গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীশ্রীগুরুদেবের জীবনচরিত প্রকাশ করিবার জন্য আমাকে বিশেষভাবে আদেশ করিলেন। তখন মনে মনে ভাবিলাম, আমাদের ন্যায় অনভিজ্ঞ জীবকে প্রভুপাদ এরূপ আদেশ করিলেন কেন? আমাদের দ্বারা কি

এই দুরূহ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারিবে? নরাধম জীব আমরা তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিলেও কৃপাময় আমাদিগকে বিস্মৃত হন না। গত অগ্রহায়ণ মাসে সহৃদয় পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী প্রভুপাদ কৃপা করিয়া শ্রীধাম নবদ্বীপ রাধারমণ বাগ আমাদের আশ্রমে পদার্পণপূর্ব্বক আমাকে এবং আমার গুরুভগিনী শ্রীমতী ললিতা সখী দাসীকে প্রণয়-ভর্ৎসনাসূচক কৃপাবাক্য দ্বারা এ বিষয়ে বিশেষভাবে উত্তেজিত করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে আদেশ করতঃ সাহস দিলেন যে, "তোমাদের কোনই চিন্তা নাই; কারণ প্রভু এবং প্রভুর পরিকরগণের লীলাখেলা যে কোনরূপেই হউক, প্রকাশ করিতে পারিলেই আত্মশোধন হইয়া থাকে।" আরও আজ্ঞা করিলেন যে, "তোমরা যদি লিখিতেও না পার, অন্ততঃ তাঁহার লীলাবিবরণসকল সংগ্রহ করিয়া আমাকে দিলে আমিই না হয় লিখিয়া প্রকাশ করিয়া দিব।"

মহতের আজ্ঞা শিরোধারণপূর্ব্বক মহৎকৃপা-শক্তিবলে বলী হইয়া সেই দিন হইতেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। "অনুকম্পা হি মহতাং সর্ব্বাভীষ্ট-প্রদায়িনী" এ কথাটী প্রত্যক্ষ অনুভব করিলাম। মহদানুকূল্যে জগৎ অনুকূল হইয়া থাকে। দেখিতে দেখিতে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই শ্রীশ্রীগুরুদেবের প্রথম জীবনের অনেক ঘটনা সংগৃহীত হইল। মহৎকৃপা-বলে আজ শ্রীশ্রীগুরুদেবের জীবনচরিতের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। মনে মনে আশা ছিল যে, শ্রীশ্রীগুরুদেবের জীবনচরিত সংগ্রহ করিয়া সাধারণকে বিতরণ করিতে সমর্থ হইব। কিন্তু "উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ।" ইউরোপীয় মহাসমর হেতু কাগজ, কালি, মুদ্রাঙ্কণ প্রভৃতির অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধিবশতঃ এবং ধার করিয়া সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করিতে হওয়ায় বাধ্য হইয়া প্রথম খণ্ডের মূল্য ১।০ পাঁচসিকা করিতে হইল।

আমি এই গ্রন্থের লেখক নহি। কেবলমাত্র শ্রীশ্রীগুরুদেবের অনুগত সঙ্গিগণের নিকট হইতে যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহাই একত্রে প্রকাশ করিলাম। সর্ব্বসাধারণের নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে, ভাষার দোষ সংশোধনপূর্ব্বক শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ, শ্রীশ্রীনিতাইগৌরাঙ্গ ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের লীলাসম্বলিত শ্রীশ্রীগুরুদেবের পুণ্য চরিত-সুধা পান করিয়া সকলে আনন্দলাভ করুন।

পরিশেষে আন্তরিক কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি যে, গৌরগত-প্রাণ, সুলেখক, প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা দ্বিজ বলরামদাস ঠাকুরবংশীয় পণ্ডিতপ্রবর পূজ্যপাদ হরিদাস গোস্বামী প্রভুপাদপ্রমুখ যে সকল মহাত্মার সম্পূর্ণ আনুকূল্যে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইল এবং যাঁহারা সংগ্রহকার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম। ইতি—

সন ১৩২৫ সাল, ১০ই ফাল্গুন। }

বিনীত
প্রকাশক।

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

পরম মঙ্গলময়, করুণাসাগর, বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীশ্রীনিতাইগৌরাঙ্গ ও শ্রীশ্রীরাধা-রাধারমণ দেবের করুণায় এবং সাধু বৈষ্ণবগণের অনুগ্রহে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুদেবের পুণ্য চরিত-সুধার প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণ শেষ হইয়া যাওয়ায় সংগ্রহকারীর অনবধানতাবশতঃ যে যে স্থানে

ঘটনাবলীর অসামঞ্জস্য এবং অসংলগ্নতা ছিল, সে সমস্ত সংশোধনপূর্ব্বক দ্বিতীয়বার মুদ্রাঙ্কণ করতঃ সর্ব্বসাধারণের নিকট উপস্থিত করিতে সমর্থ হইলাম। আশা করি সহৃদয় পাঠকবর্গ নিজ উদারতাগুণে ভাষার অসংলগ্নতা বা অশুদ্ধি সংশোধনপূর্ব্বক শ্রীশ্রীগুরুদেবের পুণ্য চরিত-সুধা আস্বাদনে পরিতৃপ্ত হইয়া আমাদিগকে কৃতার্থ ও উৎসাহিত করুন। অলমিতি

সন ১৩৩৭ সাল,
১লা বৈশাখ।

বিনীত
প্রকাশক।

তৃতীয় সংস্করণের নিবেদন

পরম মঙ্গলময়, করুণাময়, কলিযুগপাবনাবতার শ্রীশ্রীনিতাইগৌরাঙ্গ ও শ্রীশ্রীরাধারমণ দেবের এবং সাধুবৈষ্ণবগণের কৃপায় পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুদেবের পুণ্য চরিত-সুধার প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় পুনরায় তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট উপস্থিত করিতে সমর্থ হইলাম। এই সংস্করণ প্রকাশে মুদ্রাকরের অবহেলা বশতঃ সুদীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ায় সহৃদয় পাঠক পাঠিকাদিগের নিকট যে ত্রুটী ঘটিয়াছে তাহাতে সাতিশয় লজ্জিত ও দুঃখিত। অতএব আপনারা নিজগুণে ঐ ত্রুটী মার্জ্জনা করিয়া সাদরে গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হইব।

ইত্যলম্

বিনীত—
প্রকাশক.

উৎসর্গ পত্র

নমঃ।

জয় নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জয় হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥

মদেকশরণ পরমারাধ্য

শ্রীশ্রীরাধারমণৈকজীবন

শ্রীল শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ দাদা

শ্রীশ্রীগুরুপরায়ণেষু—

মায়াজালে পড়ি, ডুবিয়া আছিনু, সংসার-সাগর মাঝে।
কেশে ধরি বলে, আনিলে তুলিয়া, করুণাবারিধি তুমি।
পুনঃ কৃপা করি, শ্রীগুরুচরণ, করাইলে দরশন।
ছিল না শকতি, সাধনা করিয়া, পাইতে অমূল্যনিধি।
পরম রতন, ভাব-বিভূষণে, ভূষিতা করিয়া পুনঃ।
সঁপিলে সে-পদে, জনমের মত, মো হেন অধম জনে।
নিশিদিশি কত, উপদেশামৃতে, সিঞ্চিত করিয়া হিয়া।
বুঝাইয়া দিলে, স্থাবর জঙ্গম, গুরুর প্রকাশ বলি।
চিরদিন তরে, কৃতজ্ঞতাপাশে, বাঁধা তুয়া শ্রীচরণে।
কি ধনে তুষিব, ভাবি দিবানিশি, কি দিয়ে করিব সুখী।
যে তে মতে লিখি, তোমার প্রভুর, অমিয় **চরিত-সুধা**।
শ্রীকরকমলে, করিনু অর্পণ, করি করপুটাঞ্জলি।
করিয়া গ্রহণ, নবদ্বীপ দাদা! আস্বাদিয়া হও সুখী।
এই নিবেদন, ক্ষম অপরাধ, চরণে প্রণতি তব।

শ্রীচরণাশ্রিতা

কাচিৎ

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

বন্দনা

বন্দেহহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতান্ শ্রীবিশাখান্বিতংশ্চ ॥

দেব গজানন, বিঘ্নবিনাশন,
নিবেদন করি পায়।
দেবী সরস্বতী, বিশুদ্ধা ভারতী,
স্ফূর্ত্তি কর রসনায় ॥
করুণাসাগর, দেব মহেশ্বর,
দয়াময়ি ভগবতি।
শঙ্করী শঙ্কর, করুণা বিতর,
শ্রীচরণে সদা নতি ॥
পরাণ রতন, শ্রীরাধারমণ,
নিবেদন করি পায়।
যত লীলাখেলা, তুঁহু আচরিলা,
যেন মোর স্মৃতি হয় ॥

দাদা নবদ্বীপ, ভকতি অধিপ
কি আর বলিব আমি।
মোর মনঃকথা, হৃদয়েরি ব্যথা,
তুঁহু জান অন্তর্য্যামী॥
লীলার পাথার, তোমার দাদার,
লীলাগুণ কেবা জানে।
বড় সাধ চিতে, এককণা ছুঁতে,
তাই করি নিবেদনে॥
নাহি ভাষাবোধ, অতীব অবোধ,
হৃদয় কঠিন অতি।
বালিকার কথা, শুনিয়া কি দাদা,
হইবেক তব প্রীতি॥
নাচিতে না জানি, তবু নাচাইছ,
করুণাবারিধি তুমি।
লিখিতে না জানি, তবু লিখাইছ,
কি আর বলিব আমি॥
ফলাফল কিবা, গুণাগুণ যত,
ইথে নাহি মোর দায়।
যথাযথ যাহা, লিখাইও তাহা,
এই নিবেদন পায়॥

সূচীপত্র

ভূমিকা

শ্রীমন্নবদ্বীপ-নবপ্রদীপঃ প্রভাব-পাষণ্ড-গজৈকসিংহঃ।
স্বনামসংখ্যারূপসূত্রধারী চৈতন্যচন্দ্রো ভগবান্মুরারিঃ॥

ভক্ত মহাজন-চরিতানুশীলন· এবং আস্বাদন ভক্তিমার্গাবলম্বী সাধকের পক্ষে যে কতদূর শুভকর এবং পরমানন্দদায়ক, তাহা ভক্তমাত্রেই অবগত আছেন। বিশেষতঃ ভক্তিধর্ম্মপ্রচারক মহাত্মাদিগের পুণ্য চরিতাধ্যয়ন এবং তাঁহাদিগের লৌকিকী লীলারসাস্বাদন আত্মশোধনের প্রধান উপায় বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। একথা শাস্ত্রানুমোদিত এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনবাক্য। শ্রীভগবানের মধুর লীলারসের ন্যায় তাঁহার চরণাশ্রিত একান্ত ভক্তগণের লীলারস মধু হইতে মধু। শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে,—ভগবান্ বিষ্ণুর অবতারকথা এবং তাঁহার পরিকরস্বরূপ ভক্তদিগের নানাবিষয়িণী ইতিবৃত্তই ঈশকথা *। ভগবদ্ভক্ত মহাজনগণের পুণ্যচরিতকাহিনী সকল শাস্ত্রে ঈশকথা বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে এবং জীবের অন্তিমকালে ঐ সকল কথাই যে শ্রোতব্য এবং আলোচ্য তাহাও শাস্ত্রবিধি। সূত যখন রাজা পরীক্ষিৎ কর্ত্তৃক কলিনিগ্রহের কথা বলিতে লাগিলেন, তখন শৌনক ঋষি কহিলেন,—"হে মহাভাগ! যদি এবিষয়ে বিষ্ণুবিষয়ক কথা অথবা নারায়ণের চরণকমল-পীযূষপায়ী সাধুভক্তগণের কোন প্রসঙ্গ থাকে, তবে অনুগ্রহপূর্ব্বক বর্ণনা করুন; নচেৎ এতাদৃশ সময়ে অসদালাপে কোন প্রয়োজন নাই। তাহাতে বৃথা আয়ুঃক্ষয়ই

* অবতারানুচরিতং হরেশ্চাস্যানুবর্ত্তিনাম্।
পুংসামীশকথাঃ প্রোক্তা নানাখ্যানোপবৃংহিতাঃ॥—শ্রীমদ্ভাগবত।

হয় মাত্র। * অতএব শাস্ত্রবাক্যানুসারে সাধুভক্তচরিতানুশীলন ভক্তিমার্গাবলম্বী সাধক ভক্তবৃন্দের অবশ্যকর্ত্তব্য। শ্রীগৌরাঙ্গলীলার ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন :—

কৃষ্ণ ভজিবারে যার আছে অভিলাষ।
সে ভজুক কৃষ্ণের মঙ্গলপ্রিয় দাস।—চৈঃ ভাঃ

বিশেষতঃ যে সকল সাধু মহাজনগণ ভগবৎ প্রেরণায় কলিহত জীবের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া যুগধর্ম্ম নাম প্রচারপূর্ব্বক অসংখ্য অধম পতিত জীবকে কেশে ধরিয়া সংসার-রৌরব হইতে উদ্ধার করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের পুণ্যচরিতকাহিনী অনুশীলনে মলিন হৃদয় নির্ম্মল হয়— ভগবচ্চরণে রতিমতি হয় এবং অসাধনে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। শ্রীল সনাতন গোস্বামী, প্রভুকে বলিয়াছিলেন :—

"যে তোমার প্রিয় ভক্ত লওয়ায় তোমারে।
অবশেষ পাত্র যেন হও তার ঘরে॥"

এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সবিশেষ কৃপাপাত্র এবং শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর চিহ্নিত দাস পরম প্রেমিক ভক্তচূড়ামণি সিদ্ধ চরণদাস বাবাজী মহাশয় ও তাঁহার পুণ্যচরিতকাহিনী। এই মহাপুরুষের চরিতকাহিনী পরমরহস্যপূর্ণ এবং বহু ভাবপূর্ণ। পরম দয়াল শ্রীশ্রীনিতাই-চাঁদের কৃপায় ইনি অবিচারে নামপ্রেম প্রচার করিয়া কলিহত জীবের মহোপকার এবং অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। তিনি নবভাবে তাঁহার নিজকৃত পদাবলীগীতি দ্বারা বঙ্গে এবং উড়িষ্যা প্রদেশে যে সঙ্কীর্ত্তন-তরঙ্গ উঠাইয়াছিলেন, তাহার ঘাতপ্রতিঘাতে এখন পর্য্যন্ত প্রতি বৈষ্ণবহৃদয়

* তৎকথ্যতাং মহাভাগ যদি বিষ্ণুকথাশ্রয়ম্
অথবাস্য পদাম্ভোজ-মকরন্দলিহাং সতাম্॥—শ্রীমদ্ভাগবত।

স্পন্দিত হইতেছে এবং তাহার প্রভাব আজ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সমভাবে অনুভূত হইতেছে। তাঁহার অনুগত এবং কৃপাপাত্র নিজজনসকল অদ্যাপি তাঁহাদিগের শ্রীগুরুকৃপাবলে অসাধ্য সাধন করিতেছেন এবং অবিচারে জগতে নামসুধা বর্ষণ করিয়া ত্রিতাপদগ্ধ জীবের তাপিত হৃদয় শীতল করিতেছেন। তাঁহাদিগকে দর্শন করিলে হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠে। তাঁহাদিগের সুকণ্ঠের নামকীর্ত্তন শ্রবণ করিলে সর্ব্বাঙ্গ পুলকে পূর্ণ হয়। এই সকল অকিঞ্চন বৈষ্ণবরত্নদিগের সহিত যাঁহারা পরিচিত হইয়াছেন এবং হইতেছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিয়াছেন ও পারিতেছেন যে, ইঁহারা কি বস্তু এবং গুরুভক্তির কি বল ও গুরুকৃপার কি প্রভাব। সিদ্ধ চরণদাস বাবাজী মহাশয়ের এক একটী শিষ্য এক একটী ধ্রুব প্রহ্লাদ। মহাজনগণ লিখিয়া গিয়াছেন, শ্রীগৌরাঙ্গচরণাশ্রিত ভক্তবৃন্দ দেবতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। কারণ গৌরভক্তগণ শ্রীভগবানের নিজ গুপ্তবিত্ত অমূল্য প্রেমধনে ধনী; দেবতাগণ নশ্বর ভোগৈশ্বর্য্যসুখে সুখী। গৌরভক্তগণ প্রেমানন্দে বিভোর থাকেন; দেবতাগণ ঐশ্বর্য্যমদে মুগ্ধ থাকেন। সুতরাং শ্রীভগবানের নিকট দেবগণ অপেক্ষা গৌরভক্তদিগের শ্রেষ্ঠাসন। পরম পূজ্যপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর লিখিয়াছেন, যে মধুর ভক্তিপথে ব্যাস প্রভৃতি মুনীন্দ্রগণও ভ্রান্ত হইয়াছেন, যাহাতে পূর্ব্বে পৃথিবীতলে কাহারও বুদ্ধি প্রবেশ করে নাই, যাহা শুকদেবও অবগত ছিলেন না এবং যাহা কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণভগবান্ নিজভক্তের প্রতিও প্রকাশ করেন নাই, তাহাতে এক্ষণে গৌরভক্তবৃন্দ পরমানন্দে ক্রীড়া করিতেছেন *। সিদ্ধ চরণদাস বাবাজী মহাশয়

* ভ্রান্তং যত্র মুনীশ্বরৈরপি পুরা যস্মিন্ ক্ষমামণ্ডলে
কস্যাপি প্রবিবেশ নৈব ধীষণা যদ্বেদ নো বা শুকঃ।
যন্ন কাপি কৃপাময়েন চ নিজেঽপ্যুদ্‌ঘাটিতং শৌরিণা
তস্মিন্নুজ্জ্বলভক্তিবর্ত্মনি সুখং খেলন্তি গৌরপ্রিয়াঃ। —শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত।

গৌরভক্তের চূড়ামণি ছিলেন। তিনি তাঁহার অনুগত শিষ্যকে নিজ শক্তিদান করিয়া ভক্তিবলে বলীয়ান্ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারাও গৌরভক্ত-চূড়ামণি হইয়াছেন।

পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যখন দ্বিতীয়বার শ্রীবৃন্দাবনধামে বাসের ভাগ্যোদয় হয়, তখন কেশীঘাটে সিদ্ধ চরণদাস বাবাজী মহাশয়ের বয়োজ্যেষ্ঠা বৈমাত্রেয় ভগিনী পরমা বৈষ্ণবী মাধবীদাসীর সহিত পরিচিত হই। তাঁহারই মুখে বাবাজী মহাশয়ের অত্যদ্ভুত বাল্য লীলা-কাহিনী শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রতি আমার মন প্রথম আকৃষ্ট হয়। মধ্যে মধ্যে প্রায়ই আমরা সগোষ্ঠী একত্রে বসিয়া মাধবী দাসীর নিকট বাবাজী মহাশয়ের পুণ্যচরিত-কাহিনী শ্রবণ করিয়া আত্মশোধন করিতাম। এই সময়ে আমার মনে একটী বাসনার উদ্রেক হয়। বাবাজী মহাশয়ের পুণ্যচরিতকাহিনী যদি কেহ ধারাবাহিকরূপে লিপিবদ্ধ করেন, তাহা হইলে তৎপাঠে জগজ্জীবের মহোপকার সাধিত হয়। মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতাম। আমার দ্বারা এ কার্য্য হইতে পারে না, তাহা আমি জানিতাম। কারণ বহুদিন হইতে বাবাজী মহাশয় প্রাকৃত চক্ষুর অন্তরালে বাস করিতেছেন। তাঁহার জীবনচরিতকথা আমি কিছুই জানি না। ইহার জন্য কাহার নিকট যাইব, কোথায় পাইব, এই চিন্তা মনে প্রবল হইল।

ইহার কিছুদিন পরে কার্য্যে অবসর লইয়া গত বৎসর অগ্রহায়ণ মাসে যখন শ্রীনবদ্বীপ ধামে নিজ কুটীরে কিছুদিন বাস করিবার সৌভাগ্য লাভ করি, সেই সময় সৌভাগ্যক্রমে বাবাজী মহাশয়ের পরম কৃপাপাত্রী তাঁহার শ্রীশ্রীরাধারমণ-বাগস্থিত মঠের অধিকারিণী শ্রীধাম নবদ্বীপবাসিনী গুরু-সেবাপরায়ণা গৌরাঙ্গগতপ্রাণা পরমভক্তিমতী শ্রীললিতা দাসীর সহিত আমার পরিচয় হয়। বাবাজী মহাশয়ের উপযুক্ত শিষ্য এবং সবিশেষ কৃপাপাত্র, সঙ্কীর্ত্তননিপুণ, পরম প্রেমিক ভক্তপ্রবর রামদাস বাবাজী মহাশয়ও

তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে সিদ্ধ চরণদাস বাবাজী মহাশয়ের কথা উঠিলে আমার পূর্ব্বমনোভাব তাঁহাদিগের নিকট প্রকাশ করিলাম। তাঁহারা অতিশয় আগ্রহের সহিত আমার প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। বাবাজী মহাশয়ের অনুগত সঙ্গিগণ, যাঁহারা সঙ্গে থাকিয়া স্বচক্ষে তাঁহার লীলাখেলা দেখিয়াছেন, তাঁহারা অনেকেই এখনও বর্ত্তমান। তাঁহাদিগকে পত্র দ্বারা বাবাজী মহাশয়ের পুণ্যচরিতকাহিনী নিজ নিজ ভাষায় বর্ণনা করিতে অনুরোধ করা হইবে, একথা শ্রীললিতাদাসী আমাকে অতিশয় আগ্রহের সহিত জানাইলেন এবং আরও বলিলেন, "সেই সকল লীলাকথা এবং পুণ্যচরিতকাহিনী একত্রিত হইলে বাবাজী মহাশয়ের পুণ্যলীলাচরিতমালা গ্রথিত করিবার সম্পূর্ণ ভার আপনারই উপর রহিল।" আমি বৈষ্ণবাদেশ পরম সমাদরের সহিত শিরে ধারণ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলাম। কৃপাময় শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন, এই আশা মনোমধ্যে উদিত হইলে তাঁহার চরণকমলে কোটি কোটি প্রণাম করিলাম।

ইতিমধ্যে নিজ কার্য্যোপলক্ষে আমাকে আজমীরে (রাজপুতানা) আসিতে হইল (এইস্থান তীর্থরাজ শ্রীশ্রীপুষ্করখণ্ডের অন্তর্বর্ত্তী)। এখানে আসিয়া বিষয়বিষে মগ্ন আছি; পরমার্থবিষয় চিন্তা করিবার অবসর নাই। অশান্তিতে দিন যাপন করিতেছি, এমন সময় শ্রীললিতাদাসীর প্রেরিত সিদ্ধ চরণদাস বাবাজী মহাশয়ের জীবনচরিতসম্বলিত তিনখানি খাতা ক্রমান্বয়ে ডাকযোগে প্রাপ্ত হইলাম। স্থানে স্থানে উহার ভাষাটী আমার মনোমত না হওয়ায় সেই সেই স্থানের ভাষা যথাসাধ্য সংশোধন পূর্ব্বক খাতা তিনখানি ক্রমান্বয়ে ফেরত পাঠাইলাম। বাবাজী মহাশয়ের অনুগত শিষ্যগণ এবং তাঁহার এই পুণ্যচরিতগ্রন্থ প্রণয়নের প্রধান উদ্যোগী পরমগুরুভক্তিপরায়ণা শ্রীললিতা দাসী ও প্রেমিক ভক্তবর রামদাস বাবাজী

মহাশয় আমার সংশোধনকার্য্যে যে পরম প্রীত হইয়াছেন এবং উহা তাঁহাদের মনোমত হইয়াছে, ইহা ললিতা দাসীর পত্রে জানিতে পারিয়া আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করিলাম।

এই গ্রন্থপাঠে ভক্ত এবং অভক্ত, বহিরঙ্গ এবং অন্তরঙ্গ সকলেই বিশেষ উপকৃত হইবেন। অভক্তগণ ভক্ত হইবেন; বহিরঙ্গগণ অন্তরঙ্গ হইবেন। ইহাই আমার ধারণা। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড মাত্র প্রকাশিত হইল। বাবাজী মহাশয়ের পুণ্যচরিত বহুরহস্যপূর্ণ, একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। অপর খণ্ডে এই সকল ভক্তিরহস্য ক্রমশঃ উদ্‌ঘাটিত হইবে। এতদিন এই সকল নিগূঢ় ভক্তিরহস্যকথা তাঁহার অনুগত নিজজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল; এক্ষণে পরম দয়াল শ্রীনিতাইচাঁদের আদেশে সাধারণের গোচরীভূত হইল। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কৃপা করিয়া বাবাজী মহাশয়কে নিজ শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন, এই অলৌকিক নিত্যানন্দ-শক্তিবলেই তিনি পূর্ণভাবে যুগধর্ম্ম নাম ও প্রেম প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

(ভজ) নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
(জপ) হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

এই মধুর নামগান সিদ্ধ চরণদাস বাবাজী মহাশয়ের রচিত। তিনিই ইহার প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার চরণাশ্রিত অনুগত শিষ্য এবং ভক্তগণ এই নামগানে উন্মত্ত হইয়া নৃত্যকীর্ত্তনানন্দে মাতিয়া উঠেন। এ দৃশ্য যিনি একবার দেখিয়াছেন, তিনিই বুঝিয়াছেন, এই নামগানে নিত্যানন্দ-শক্তি পূর্ণভাবে নিহিত এবং এই নামমন্ত্র ভজনশক্তি-প্রদাতা।

বাবাজী মহাশয় বহু পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি পদ লিখিতেন না। মুখে মুখে রচনা করিয়া কীর্ত্তন করিতেন। এ শক্তি সাধারণ পদকর্ত্তাদিগের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় না। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় তিনি এই অসাধারণ শক্তিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত

পদাবলী পাঠ করিলে প্রাচীন মহাজনকৃত পদাবলী বলিয়াই ভ্রম হয়।

আর একটী মাত্র নিবেদন করিয়া এই ভূমিকার উপসংহার করিব। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু সর্ব্বাবতার-সার এবং যুগধর্ম্মপ্রচারক। যুগধর্ম্ম হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন, ইহা সর্ব্বশাস্ত্রে লিখিত আছে। মৃদঙ্গ করতাল সংযোগে যে মধুর হরিনামসঙ্কীর্ত্তন, তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা আমার গৌরসুন্দর। অন্নগত-প্রাণ, অল্পায়ু, দুর্ব্বল কলিহত জীবের একমাত্র অবলম্বন, পরম মঙ্গলময় শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সেই হরিনামসঙ্কীর্ত্তন জীবের দুর্ভাগ্যবশতঃ কাল-প্রভাবে বিলুপ্তপ্রায় হইয়া আসিতেছিল, এই সময়ে সিদ্ধ চরণদাস বাবাজী মহাশয় আবির্ভূত হইয়া নিতাইচাঁদের পূর্ণ কৃপাশক্তি লাভ করতঃ সেই যুগোচিতধর্ম্ম হরিনামসঙ্কীর্ত্তন পুনঃ প্রচারপূর্ব্বক নিজে বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম যাজন এবং উপদেশ দ্বারা জগদ্বাসীকে শিক্ষাপ্রদান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পুণ্য চরিত-সুধা পানে সংসারতাপদগ্ধ নরনারীগণ দেবদুর্লভ প্রেমধনে ধনী হইয়া পরম শান্তিলাভ করুন, ইহাই ভগবচ্চরণে আমার আন্তরিক কামনা। ইতি

প্রসিদ্ধপদকর্ত্তা দ্বিজ বলরাম দাস ঠাকুরবংশীয় কুলাঙ্গার
শ্রীবৈষ্ণব কৃপাপ্রার্থী জীবাধম
শ্রীহরিদাস গোস্বামী

আজমীর (রাজপুতানা)
১৮ই কার্ত্তিক।
গৌরাব্দ ৪৩৩



চরিত-সুধা

প্রথম খণ্ড

—‡*‡—

জন্মস্থান ও পিতার পরিচয়

যশোহর জেলার অন্তর্গত নড়াইল সব্‌ডিভিসনের অধীন চিত্রা-নদীর পশ্চিম তীরে নাতিক্ষুদ্র নাতিবৃহৎ একখানি গ্রাম—নাম মহিষখোলা। পল্লীগ্রাম হইলেও স্থানটি অতি মনোরম। গ্রামটি নদীর তীরে অবস্থিত। পানীয় জলের কষ্ট কাহাকে বলে, তাহা সে গ্রামের কেহ জানে না। গ্রামে অনেকগুলি পুষ্করিণী থাকিলেও সকলে নদীর জলই ব্যবহার করিয়া থাকে। গ্রামটীর প্রাকৃতিক শোভা অবলোকন করিলে মনে হয় যেন লক্ষ্মীদেবী মূর্ত্তিমতী হইয়া তথায় বিরাজ করিতেছেন। এই গ্রামে অনেক প্রকার জাতির বসবাস থাকিলেও দক্ষিণরাঢ়ী কুলীন কায়স্থেরই বসতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তন্মধ্যে ঘোষ মহাশয়েরাই সম্ভ্রান্ত-বংশীয় জমিদার। গ্রামবাসী সকলেই ইঁহাদিগকে 'বাবু' বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে। গ্রামবাসী প্রায়ই ইঁহাদের অনুগত। শরৎ ও বসন্তকালে গ্রামটী অতি রমণীয় শোভা ধারণ করে। নদীর উপকূলবর্ত্তী ভূমিসকল শারদীয় এবং বাসন্তী শস্যে পরিপূর্ণ। এই গ্রামের প্রাকৃতিক শোভা দেখিবামাত্রই চিত্তবৃত্তি যেন কোন অনির্ব্বচনীয় অপ্রাকৃত রাজ্যে চলিয়া

যায়। বোধ হয় প্রকৃতিদেবী যেন নানাবিধ ভূষণে ভূষিতা হইয়া গ্রামখানির শোভা বর্দ্ধন করিতেছেন।

এই গ্রামে **শ্রীযুক্ত মোহনচন্দ্র ঘোষ** মহাশয় বাস করিতেন। তাৎকালিক প্রথানুসারে কুলীনবংশোদ্ভব ব্যক্তিগণ প্রায়ই বহুবিবাহ করিতেন। এইরূপ বিবাহ যে কেবল অর্থলাভ বা ইন্দ্রিয়-চরিতার্থ করিবার মানসেই করা হইত, তাহা নহে; অনেক সময় কুলীন-সন্তানগণ অপরের কুলরক্ষার জন্য দয়াপরবশ হইয়াও বহুবিবাহ করিতে বাধ্য হইতেন। বাবু মোহনচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ও উপরি উক্ত কারণেই এক একটী করিয়া ক্রমে চারিটী বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রথমে জোকাগ্রামনিবাসী পদ্মচরণ রায় মহাশয়ের কন্যার, দ্বিতীয়বার বনগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত রামতনু নাগ চৌধুরী মহাশয়ের কন্যা **শ্রীমতী কনকসুন্দরী দাসীর** এবং তৃতীয়বারে ঘোড়াখালীনিবাসী শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র সরকার মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী মুক্তাসুন্দরী দাসীর পাণিগ্রহণ করেন। তৎপর চতুর্থবারে পুনরায় উজীরপুরে বিবাহ করেন। মোহনচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের প্রথমা পত্নীর কোন সন্তানাদি হয় নাই। দ্বিতীয়া কনকসুন্দরীর গর্ভে, চারিটী পুত্র ও একটী কন্যা এবং তৃতীয়া মুক্তাসুন্দরীর গর্ভে একটী মাত্র কন্যা জন্মে। কন্যাটীর নাম 'মোক্ষদা সুন্দরী'। চতুর্থ পত্নীর এক পুত্র, নাম "কুঞ্জবিহারী"।

মাতার স্বভাব ও দেশের বিবরণ

ঘোষ মহাশয়ের দ্বিতীয়া পত্নী কনকসুন্দরী যেন একটী দেবীপ্রকৃতি। ক্রোধ কাহাকে বলে, তিনি আদৌ জানিতেন না। আমরা শাস্ত্রাদিতে শ্রীবৃন্দাবনে মা যশোমতীর স্বভাবের যেরূপ উদারতার বর্ণনা দেখিতে পাই, দেবী কনকসুন্দরীর চরিত্রে সম্পূর্ণভাবে দৃষ্টিগোচর না হইলেও

তাহার অনেক সাদৃশ্য লক্ষিত হইত। দেবী কনকসুন্দরী সর্ব্বদা অবগুণ্ঠনবতী থাকিতেন এবং অতি মৃদুভাষিণী ছিলেন। দেহান্তকাল পর্য্যন্ত কখনও কেহ তাঁহার মুখে উচ্চকথা শুনিতে পায় নাই। এমন কি, সমবয়স্কা স্ত্রীলোকদিগের নিকটও তিনি মুখ তুলিয়া কথা কহিতেন না। তিনি এতই সরলস্বভাবা ছিলেন যে, রন্ধনকালে ব্যঞ্জনে লবণ দিয়াছেন কি না, তাহা অপরকে জিজ্ঞাসা করিতেন। তিনি যেন এ কলিকালের স্ত্রীলোক ছিলেন না। স্বামীর প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। কখনও কোন অভাব জানাইতে বা অভিযোগ করিতে হইলে ঠিক দেবতার ন্যায় স্বামীর নিকটে যাইয়া তিনি করযোড়ে প্রার্থনা করিতেন। দুঃখী কাঙ্গালীর প্রতি দেবী কনকসুন্দরী মুক্তহস্তা ছিলেন। কোন ভিক্ষুক বাড়ীতে আসিলে অতিশয় ব্যস্ততাসহকারে সম্মুখে যাহা পাইতেন, তাহাই তাহাদিগকে দিয়া কৃতার্থ বোধ করিতেন তাঁহার অসীম গুণের কথা লিখিয়া শেষ করা যায় না। প্রতিবেশী বালকবালিকাগণ তাঁহার প্রাণ ছিল। তাঁহার যত কিছু কথাবার্ত্তা ও পরামর্শ উহাদিগকে লইয়া। উত্তম খাদ্যদ্রব্য পাইলে বালকবালিকাগণকে ডাকিয়া অগ্রে খাওয়াইতেন।

মহিষখোলার ঘোষমহাশয়দের বংশ ক্রমে এতই বিস্তার লাভ করিয়াছিল যে, ঐ গ্রামে সকলের বাসস্থানের সঙ্কুলান না হওয়ায় ঐ বংশাবলী অনেক গ্রামে স্থানান্তরিত হইয়া পড়িয়াছিল। ঘোষবংশীয়গণ সকলেই শাক্ত ছিলেন। শারদীয়া দুর্গাপূজা, রটন্তী, বাসন্তী, দীপান্বিতা-কালীপূজা প্রভৃতি সকল প্রকার শক্তিপূজাই ইঁহাদিগের গৃহে বহু ব্যয় ও আড়ম্বরের সহিত সম্পন্ন হইত। এতদ্ব্যতীত দোল, রাস, জন্মাষ্টমী, রামনবমী, ঝুলন প্রভৃতি বৈষ্ণবীয় পর্ব্বোপলক্ষেও যথেষ্ট অর্থব্যয় হইত। গ্রামে অতিথিশালা ত ছিলই, তদ্ভিন্ন বিশেষ কোন

কিছু কার্য্য উপলক্ষে সর্ব্বসাধারণকে অবিচারে অন্নদান করা হইত। তখনকার লোক লোককে অকাতরে অন্নদান করিতে অত্যন্ত ভাল-বাসিতেন। দুর্গাপূজা ও কালীপূজা উপলক্ষে ব্রাহ্মণগণকে এবং দোল, রাস, ঝুলনাদি বৈষ্ণবীয় পর্ব্বে দীনদরিদ্র ও বৈষ্ণবদিগকে অতিশয় আদর-যত্ন সহকারে পরম পরিতোষভাবে সেবা করান হইত।

জন্মবিবরণ

শ্রীমতী কনকসুন্দরী দেবী অষ্টাদশ বৎসর বয়সে একটী সর্ব্বসুলক্ষণ-যুক্ত পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। পুত্রটীর শুভ অন্নপ্রাশনে ঘোষ মহাশয় যথেষ্ট অর্থব্যয় করিলেন। পুত্রের নাম রাখা হইল "লালচাঁদ"। এই প্রথম পুত্রের চারি বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার আর একটী পুত্র জন্মে। তাহার নাম রাখা হইল "বিপিনবিহারী"। দ্বিতীয় পুত্রের তিন বৎসর বয়ঃক্রমকালে সন ১২৬০ সালের ২৯শে চৈত্র সংক্রান্তি শুক্লা ত্রয়োদশী তিথি শুভ বৃহস্পতিবাসরে উষাকালে ঘোষ মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। ঘোষগোষ্ঠী পরমানন্দের সহিত পুত্রের জাতক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। দেশাচার অনুযায়ী প্রসূতির নবম মাস গর্ভাবস্থায় সূতিকাগৃহাদি নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল।

২৮শে চৈত্র বুধবার বেলা আন্দাজ সাড়ে চার ঘটিকার সময় আকাশে একখানি ক্ষুদ্র মেঘ দেখা দিল। দেখিতে দেখিতে ঐ ক্ষুদ্র মেঘখানি বৃহদাকার ধারণ করিয়া চারিদিক অন্ধকারাচ্ছন্ন করিল। সে সময়ে দিবা কি রাত্রি নির্ণয় করা কষ্টকর হইয়া পড়িল। ভয়ানক বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বহুসংখ্যক বৃক্ষাদি ভূমিসাৎ হইয়া গেল। সূতিকাগৃহের উপরে একটি সুপারি গাছ ছিল, হঠাৎ সেইটির উপর ভয়ঙ্কর শব্দে বজ্রপাত হইয়া তৎক্ষণাৎ বৃক্ষটী ভস্মীভূত

হইয়া গেল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বৃক্ষতলস্থিত সূতিকাগৃহ এবং তৎপার্শ্বস্থ কোনও লোকজন অথবা অন্য কোন বৃক্ষাদির বিন্দুমাত্রও অনিষ্ট হইল না। পরদিবস প্রাতঃকালে গ্রামবাসী বহুসংখ্যক লোক এই বজ্রপাতের কথা শুনিয়া তথায় যাইয়া দেখিল, সেই বৃক্ষতলস্থ সূতিকা-গৃহে মোহনবাবুর একটি পরম সুন্দর পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ইহা দেখিয়া সকলেই অবাক্ হইলেন এবং পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন যে, "এ বালকটি নিশ্চয়ই কোন মহাপুরুষ হইবে; তাহা না হইলে, দেখ, বহুদিন এ দেশে বৃষ্টি হয় নাই, লোক জলাভাবে কত কষ্ট পাইতেছিল। কৃষকগণ কৃষিকর্ম্ম বন্ধ করিয়া হাহাকার করিতেছিল। এই বালক জন্মিবার পূর্ব্বেই জগৎ শীতল করিয়া দিয়াছে আবার দেখ, কি আশ্চর্য্য! সূতিকা-গৃহের উপর বজ্রপাত হইয়া ঐ সুপারিগাছটি ভস্মীভূত হইয়া গেল, কিন্তু সূতিকা-গৃহের কিছুই অনিষ্ট হইল না। ইহা ঈশ্বরের অনুগ্রহ ভিন্ন আর কি হইতে পারে? আমাদের বোধ হয়, ঐ বৃক্ষটিতে কোনও উপদেবতার অধিষ্ঠান ছিল; ইন্দ্রদেব তাহাকে বিনাশ করিয়া শিশুর মঙ্গল বিধান করিলেন। তোমরা সকলে সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ কর, যেন এই বালকটী চিরজীবী হয়।"

ক্রমে ঘোষগৃহে লোকসংঘট্ট হইতে লাগিল। উষাকালে জন্ম হওয়ার জন্য কেহ বা রাত্রে কেহ বা পূর্ব্বদিবস বজ্রপতনকালে শিশুটীর জন্ম হইয়াছে বলিয়া বাদপ্রতিবাদ করিতে লাগিল। শিশুটী ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি মাতৃস্তন্য পান করে না। ধাত্রীমাতা অনেক চেষ্টা করিয়া বালকের মুখে মাতৃস্তন্য অর্পণ করিতেছেন, কিন্তু সকল চেষ্টা— সকল যত্নই বিফল হইতেছে। বালক মাতৃস্তন স্পর্শমাত্র বিকট চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। দুই দিন গত হইল, বালকের মুখে কেহ কিছুই দিতে

পারিতেছে না। সকলেই বিশেষ চিন্তান্বিত। তিন দিনের দিন অতি-কষ্টে একটু গোদুগ্ধ গরম করিয়া শিশুটীর মুখে দেওয়া হইল। এইরূপে ছয় দিন যায়, কত ওঝা বৈদ্যদ্বারা নবপ্রসূত শিশুটীর এই অভিনব ব্যাধি প্রতীকারের চেষ্টা করিলেও সকলই বিফল হইল। তখন সকলেই শিশুর জীবনের আশা পরিত্যাগ করিলেন। এইরূপে এক সপ্তাহ গত হইল। সকলের চিন্তা ও উদ্বেগের সীমা রহিল না। সাত দিনের দিন ঐ গ্রামবাসী হরিভক্তপরায়ণ শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় আসিয়া বলিলেন, "দেখ, আমার বিশ্বাস, এই শিশুটী পরম ভক্ত, শ্রীহরির পূজা করিয়া তাঁহার প্রসাদ উহার মুখে দিলে নিশ্চয়ই বালক স্থিরভাবে মাতৃস্তন্য পান করিবে।" মোহনবাবু এবং অন্যান্য সকলেই এই নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া শ্রীহরিপূজার সকল আয়োজন করিয়া দিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিশেষ ভক্তিসহকারে দয়াময় ভগবান্ শ্রীহরির পূজা করিয়া ঐ প্রসাদ ও চরণামৃত শিশুটীর মুখে দিলেন এবং চরণামৃত মাতৃস্তনে মাখাইয়া দেওয়াইলেন। শিশুটী অতি হৃষ্টচিত্তে সেই প্রসাদ ও চরণামৃত গ্রহণ করিল। তখন ভাগ্যবতী জননী যেমন পুত্রকে কোলে লইয়া স্তন মুখে দিলেন, অমনি সে প্রাণ ভরিয়া পরমানন্দে স্তনদুগ্ধ পান করিয়া তৃপ্তিলাভ করিল এবং আত্মীয় স্বজনগণকেও পরমানন্দিত করিল।

কোষ্ঠীগণনা ও নামকরণ

শ্রীযুক্ত মোহনবাবু গ্রহাচার্য্যকে ডাকাইয়া পুত্রের জাতকপত্র (কোষ্ঠী) লিখাইলেন। গ্রহাচার্য্য প্রথম এবং মধ্যম পুত্রের কোষ্ঠী লিখিয়া তৃপ্ত হয়েন নাই; কারণ উভয়েরই পরমায়ুঃকাল অতি অল্প ছিল। তৃতীয় পুত্রের জাতক গণনায় আচার্য্য ঠাকুরের মনে বড়ই আনন্দ

হইল। তিনি মোহনবাবুকে বলিলেন, "আপনার এই পুত্র অতি বিদ্বান্, দানশীল ও ভক্ত হইবে। এই বালক হইতেই আপনার বংশ উজ্জ্বল হইবে। ইহাকে সাধারণ বালক মনে করিবেন না। লগ্নে বৃহস্পতির অধিষ্ঠান হইয়াছে। এ বালক পণ্ডিত ও বক্তা হইবে সন্দেহ নাই।"

ক্রমে সপ্তম মাসে বালকের অন্নপ্রাশন ও নামকরণ হইল। দেশাচার অনুযায়ী অন্নপ্রাশন সময়ে একখানি থালার উপর কিছু মিষ্টান্ন, নানাবিধ খেলনা, একখানি চণ্ডী এবং একটী স্বর্ণমুদ্রা রাখিয়া বালকের প্রবৃত্তি পরীক্ষা করিবার জন্য তাহার সম্মুখে ধরা হইল। বালক হাসিতে হাসিতে প্রথমে চণ্ডীখানি লইয়া বুকের কাছে বামহস্তে ধারণ করিল। পরে মিষ্টান্ন হাতে করিয়া এক একবার উপস্থিত রমণীগণের হস্তে দিতে লাগিল। রমণীগণ বলিয়া উঠিলেন, "এ বালক পরম ভক্ত ও দাতাশিরোমণি হইবে এবং লোকজনকে অকাতরে অন্নদান করিবে।" বালকের নাম রাখা হইল "রাইচরণ"। ইহার দুই বৎসর পরেই মোহনবাবুর আর একটি পুত্রসন্তান জন্মিল। এইটী তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র। ইহার নাম হইল "রাখালদাস"। কনিষ্ঠ পুত্রের দুই বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার একটি কন্যাসন্তান জন্মে। কন্যাটীর নাম রাখা হইল "বসন্তকুমারী"।

পিতা ও ভ্রাতার পরলোক

মোহনবাবুর তৃতীয় পুত্র রাইচরণের বয়স যখন পাঁচ বৎসর, তখন তাঁহার পিতা আত্মীয়স্বজনগণকে শোকসাগরে ভাসাইয়া পরলোক গমন করেন। পিতৃবিয়োগের সময় জ্যেষ্ঠপুত্রের বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর মাত্র। যথাসময়ে পিতৃদেবের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। বাবু মোহনচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের এক কনিষ্ঠ সহোদর ছিলেন। তাঁহার নাম

ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ। তিনি এবং অন্যান্য জ্ঞাতিবর্গই পিতৃহীন বালকগণের অভিভাবক হইয়া তাহাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ এবং লেখাপড়া শিখাইতে লাগিলেন।

বালক রাইচরণের পিতৃবিয়োগের দুই বৎসর পরে তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা বিপিনবিহারী দশবৎসর বয়ঃক্রমকালে পরলোক গমন করেন। পতিহীনা ও পুত্রশোকার্ত্তা দেবী কনকসুন্দরীর অপার স্নেহরাশি সকলই তৃতীয়পুত্র রাইচরণের উপরে পতিত হইল এইরূপে দুই বৎসর অতীত হইতে না হইতেই রাইচরণের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা লালচাঁদ ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রমকালে এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা রাখালদাস সপ্তম বৎসর বয়ঃক্রমকালে পরলোক গমন করেন। দেবী কনকসুন্দরীর কোমল হৃদয় উপর্য্যুপরি পুত্রশোকে বড়ই ব্যথিত হইল। তখন তাঁহার নয়নপুতলী একমাত্র নবম বর্ষীয় বালক রাইচরণ এবং পঞ্চমবর্ষীয়া বালিকা বসন্তকুমারী এই দুইটিমাত্র সন্তান রহিল। তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও রাইচরণকে চোখের আড়াল করিতে পারিতেন না। রাইচরণ কোথাও গেলে তিনি পাগলিনীর মত ছুটাছুটি করিতেন।

পাঠ্যাবস্থা

কতিপয় ভদ্রলোকের পরামর্শে রাইচরণ নড়াইল হাইস্কুলে পড়িতে লাগিলেন। বালক হইলেও অন্য অভিভাবক না থাকায় এই সময় হইতেই তাঁহাকে সংসারের কার্য্যও দেখিতে হইত। তাঁহার প্রখর বুদ্ধিবৃত্তি দর্শনে সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত এবং মিষ্ট ও সরল ব্যবহারে মুগ্ধ হইতেন। তাঁহার প্রকৃতি অতিশয় চঞ্চল হইলেও ক্লাসে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চস্থান অধিকার করিতেন। বার তের বৎসরের বালক রাইচরণ উদ্ধতের শিরোমণি, কিন্তু সর্ব্বদা পরহিতে রত ছিলেন। একদিন স্কুল

হইতে বাড়ী আসিবার সময় জনৈক ছাত্রের ছাতা নাই দেখিয়া তাহাকে নিজের ছাতাটী দিয়া রৌদ্রে পুড়িতে পুড়িতে বাড়ী আসিলেন।

আর একদিন স্কুল হইতে আসিতেছেন, এমন সময় দেখেন যে, একটী লোক শীতবস্ত্রাভাবে বড়ই কষ্ট পাইতেছে। তখন তিনি অতি আগ্রহের সহিত আপনার মূল্যবান্ শীতবস্ত্রখানি তাহাকে দিয়া নগ্নগাত্রে শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে আসিলেন। প্রথমতঃ মা রাগ করিবেন ভাবিয়া মায়ের কাছে বলিলেন, "মা, আমার গায়ের কাপড়-খানা কে লইয়া গিয়াছে।" মা কনকসুন্দরী অতিশয় সরলা। পুত্রের কথা শ্রবণে কাঁদিয়া অধীর ভাবে বলিতে লাগিলেন, "হায়! হায়! আমার দুখিনীর ধন, অন্ধের নয়ন রাইচরণের সঙ্গে কে এমন শত্রুতা আচরণ করিল? মা জগদম্বে! আমার অন্ধের যষ্টিখানির প্রতি দয়া কর মা! এ জগতে যে উহার আর কেউ নাই মা! ঐটি যে আমার অঞ্চলের নিধি। উহার সম্মুখে আমায় নাও মা! আমার আর বাঁচিবার সাধ নাই।" ক্ষণকাল পরেই শিহরিয়া উঠিয়া আবার বলিতে লাগিলেন, "না, না, মা! আমি যদি এখন যাই, আমার জীবনসর্ব্বস্ব রাইচরণ কাহার মুখ দেখিয়া থাকিবে? জগতে আমারও যেমন রাইচরণ ভিন্ন আর কেউ নাই, উহারও তেমনি আমি ভিন্ন আর কে আছে মা? আমার রাইচরণ একটু বড় হোক, তখন আমায় নিও মা।" এইরূপ যখন যাহা মনে হইত, বাৎসল্যরসে বিগলিত হইয়া তখন তাহাই বলিতেন।

পরে রাইচরণের সঙ্গী বালকগণ যখন হাসিয়া বলিল, "না মা, রাইচরণ মিথ্যা কথা বলিতেছে। কাল স্কুল হইতে আসিবার সময় একজন গরীবলোক শীতে কষ্ট পাইতেছিল দেখিয়া তাহাকে নিজের গায়ের কাপড়খানা দিয়া আপনাকে ঐরূপ বলিতেছে।" কনকসুন্দরী

দেবী অমনি হাসিয়া বলিতে লাগিলেন, "হ্যাঁ বাবা। গরীবকে দিয়েছ? বেশ করেছ। মা জগদম্বা তোমাকে আবার দিবেন।" মাতাপুত্রের ঈদৃশ ব্যবহার দর্শনে সকলেই অবাক্! যেমন দয়াময়ী জননী, তেমনি দানশীল পুত্র।

রাইচরণ একদিন স্কুল হইতে আসিবার সময় দেখেন যে, একটী বৃদ্ধ বাজার হইতে ফিরিবার সময় রাস্তায় জ্বরাক্রান্ত হইয়াছে। চা'ল ডা'ল যাহা বাজার হইতে আনিয়াছে, তাহা লইয়া বাড়ী যাওয়া তাহার পক্ষে সুকঠিন। সে রাস্তার ধারে বসিয়া কাঁদিতেছে। রাইচরণ অবিলম্বে তাহার সেই বোঝাটী স্বয়ং মাথায় করিয়া তাহাকে ধরিলেন। সে অতিশয় ব্যস্তভাবে বলিতে লাগিল, "বাবু, আপনি আমার বোঝা মাথায় করিবেন না। আমি নীচ জাতি (ধোবা)। রাইচরণ বলিলেন. "তুমি যাহাই হও, সে পরিচয়ে আমার প্রয়োজন নাই; এখন তুমি পীড়িত, আমি তোমায় বাড়ীতে দিয়া আসি চল।" এই বলিয়া তাহাকে বাড়ী পৌছাইয়া দিতে যাওয়ার জন্য বাড়ী আসিতে একটু বিলম্ব হইল। এদিকে স্নেহময়ী জননী কাঁদিয়া অস্থির। কতক্ষণ পরে রাইচরণ বাড়ীতে আসিলে মা তাঁহার হাতখানি ধরিয়া প্রতিবেশীর বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়া সকলকে আনন্দাশ্রুবিগলিতলোচনে বলিতে লাগিলেন, - "ওগো, তোরা দেখ্, আমার রাইচরণ বাড়ী আসিয়াছে।" মা কনকসুন্দরী আমার এমনি সরলা যে, ছেলে যদি কখনও কিছু টাকা পয়সা তাঁহার হাতে দিয়াছে, তবে মা ভেবেই অস্থির! "তাই তো, রাইচরণ আমার হাতে এত টাকা দিল, আমি কোথায় রাখি? এত টাকাকড়ি আমার কে খাইবে? রাইচরণ আমার রাজা হইবে, হাতী ঘোড়া পাল্কী চ'ড়ে বেড়াবে।" ইহা মাতৃস্নেহের পরাকাষ্ঠা। মা কনকসুন্দরী দেবীপ্রকৃতি ছিলেন।

রাইচরণ বাল্যকাল হইতেই বড় সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। যেখানে গান হইত, সেখানে তাঁহার গান শুনিতে যাওয়াই চাই। ভিখারী বৈষ্ণবদের গান শুনিতে তাঁহার বড়ই আগ্রহ ছিল। কিন্তু যুবা অবস্থার ভিখারী দেখিলে তিনি বলিতেন, "কেন বাবা, এমন সাধের জনমটা বৃথা কাটাচ্ছ? পরের উপকার কর, মনুষ্যজীবনের কাজ হইবে। অন্ততঃ যদি তুমি চাকরীও কর, তবুও দশজনকে প্রতিপালন করিতে পারিবে। পরমুখাপেক্ষী হইয়া উদরান্নের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইবার কি প্রয়োজন?" ইত্যাদি নানারূপ বাক্যে তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিতেন। রাইচরণ বালক হইলেও স্বভাব এবং বুদ্ধিব্যবহারে বৃদ্ধের ন্যায় সকলকে উপদেশবাক্য বলিতেন। পরের অনিষ্টচেষ্টা কখনও তাহার মনেও স্থান পাইত না। তিনি সর্ব্বপ্রাণিহিতে রত ছিলেন। কোন ধর্ম্ম বা সম্প্রদায়ের প্রতি তাহার বিদ্বেষভাব ছিল না। সঙ্গিগণসঙ্গে গল্পচ্ছলেও কখন কাহার কোনরূপ কুৎসা করা তাহার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। ক্রমে রাইচরণ বাবুর বয়ঃক্রম যখন পঞ্চদশ বৎসর হইল, তখন হইতেই দেবী কনকসুন্দরী পুত্রের শুভবিবাহ দিবার জন্য উৎকণ্ঠিতা হইয়া উঠিলেন। রাইচরণ বাবু যখন ইহা শুনিলেন, তখন সান্ত্বনাবাক্যে জননীকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন,—"মা, বসন্ত বিবাহযোগ্যা হইয়াছে, আগে তাহার বিবাহের উদ্যোগ হউক, পরে দেখা যাইবে।" মা আর কথা কহিতে পারিলেন না। ক্রমে বসন্তকুমারীর বয়স যখন দ্বাদশ বৎসর অতিক্রম হইতে চলিল, তখন তিনি বিশেষ চিন্তিত হইলেন।

যশোহর জেলার অন্তর্গত সিঙ্গানিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত বসু মহাশয়ের সঙ্গে বসন্তকুমারীর শুভ বিবাহ স্থির হইল। সন্তানের বিবাহজনিত সুখ মা কনকসুন্দরীর জীবনে এই প্রথম। তিনি

চারিটি পুত্রের গর্ভধারিণী হইলেও কোনও পুত্রের বিবাহাদি কার্য্যে উৎসবানন্দ অনুভব করা এ পর্য্যন্ত তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। কারণ তাঁহার তিনটি পুত্রই অতি অল্পবয়সে মানবলীলা সংবরণ করে। পুত্রশোকসন্তপ্তা মা কনকসুন্দরী আজ কন্যার বিবাহ-উৎসবে পরমানন্দিতা হইয়া সকলকে সাদর-সম্ভাষণে তুষ্ট করিতেছেন। আনন্দময়ী মা যেন আজ সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা হইয়া বসিলেন। যে আসিতেছে, তাহাকেই বলিতেছেন—"তোমাদেরই ঘর, তোমরা দেখিয়া শুনিয়া খাওয়া দাওয়া কর, আমি ত পাগল, একদিক করিতে আর একদিক ভুলিয়া যাই। রাইচরণ আমার বালক, উহার আর কেহই নাই। তোমরা দেখিয়া শুনিয়া উহার দুইহাত এক করিয়া দাও, আমি দেখিয়া চক্ষু সফল করি। আজ যদি আমার লালচাঁদ (জ্যেষ্ঠপুত্র) থাকিত, তবে উহার কি ভাবনা ছিল?" এই বলিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। প্রতিবেশিনীগণ তখন তাঁহার হাত দুইখানি ধরিয়া কহিলেন, "ছি! আজ তোমার আনন্দের দিন, আজ কি চোখের জল ফেলিতে আছে? উহাতে অমঙ্গল হইবে যে! তোমার রাই-চরণ বেঁচে থাকুক, ঐ এক পুত্র হইতেই তুমি শত পুত্র লাভ করিবে।" এইরূপ নানাবিধ প্রবোধবাক্যে প্রতিবেশিনীগণ দেবী কনকসুন্দরীকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

ভগিনীর শুভ-বিবাহে রাইচরণ বাবু বেশ খরচ করিলেন। তাঁহার খুল্লতাত ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ ও নীলমাধব ঘোষ প্রভৃতি জ্ঞাতি ও গুরুজনবর্গের পরামর্শে অতি সুশৃঙ্খলভাবেই বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। বসন্তকুমারীকে বিদায় দিতে যাইয়া মা কাঁদিয়া অধীরা হইলেন। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "আজ আমার ঘর শূন্য হইয়া গেল। রাইচরণ আমার পাগল ছেলে। একদণ্ডও ঘরে

থাকে না। আমি বসন্তকে লইয়া শান্তিতে ছিলাম। বসন্ত আমার ঘরে যেন গৃহলক্ষ্মী ছিল। আমাকে কোনও কাজ করিতে দিত না। এখন আর আমায় কে দেখিবে? কেই বা রাইচরণের স্কুলের ভাত রাঁধিয়া দিবে?” উপস্থিত প্রতিবেশিনীগণ তখন তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতে লাগিলেন, “অল্পদিনের মধ্যেই রাইচরণের বিবাহ দিয়া ঘরে বৌ আনিয়া দিব। আর চিন্তা কি? মেয়ে ত আর ঘরে রাখিবার বস্তু নয়; পরের ধন পরকে দিতে পারিলেই মঙ্গল।”

রাইচরণ বাবুর নিজ মাতুলবাড়ী বনগ্রাম। তিনি অবকাশমতে সময় সময় বিমাতার পিত্রালয় ঘোড়াখালাও যাইতেন। তাঁহার এক বৈমাত্রেয় ভগিনী ঘোড়াখালীতে তাঁহার মাতুলালয়ে থাকিতেন। তিনি বিধবা। ইহাদের সংসারে বড়ই কষ্ট। এইজন্য রাইচরণ বাবু তাঁহাকে নিজ বাটীতে আনাইলেন। তখন সংসারের সমস্ত ভার তাঁহারই উপর পড়িল। তিনি মা কনকসুন্দরী দেবীর দোসর হইলেন। রাইচরণ বাবুর এই বৈমাত্রেয় ভগিনীটীর নাম মোক্ষদাসুন্দরী।

বিবাহ

দেখিতে দেখিতে কোথা দিয়া দুই বৎসর চলিয়া গেল। একে কুলীন, তাহাতে সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে; কাজেই নানাদেশ হইতে রাইচরণ বাবুর বিবাহের সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। এত অল্প বয়সে বিবাহ করা যুক্তি-সঙ্গত নয়, রাইচরণ বাবুর হৃদয়ে এইরূপ দৃঢ়সঙ্কল্প থাকিলেও দুঃখিনী জননীর কষ্ট নিবারণের জন্য অগত্যা তাঁহাকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইতে হইল।

ভরপাশা গ্রামের শ্রীযুক্ত মঙ্গলচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী স্বর্ণময়ী যেন সাক্ষাৎ স্বর্ণময়ী লক্ষ্মীদেবী। মেয়েটীর রূপ, গুণ ও

সুশীলতা পর্য্যবেক্ষণ করিলে বোধ হইত যেন কোন দেববালা শাপভ্রষ্টা হইয়া মর্ত্তে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই, সর্ব্বসুলক্ষণযুক্তা ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যারত্নের সহিত রাইচরণ বাবুর বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল। উভয় পক্ষ হইতে বিবাহের নানারূপ আয়োজন হইতে লাগিল। আজ মা কনকসুন্দরীর হৃদয়ে আনন্দ আর ধরে না। যাহাকে দেখিতেছেন, তাহাকেই পুত্রবিবাহের নিমন্ত্রণ দিতেছেন। সংসারের ভার দেবী মোক্ষদাসুন্দরীর উপর। তিনি গৃহকার্য্য পরিদর্শনে বিশেষ নিপুণা। তিনি বিবাহের উপযোগী যাবতীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিয়াছেন। ক্রমে বিবাহের দিন নিকটবর্ত্তী হইল। পূর্ব্বদিবস বরযাত্রিসঙ্গে বর মহাসমারোহে বিবাহ করিতে যাত্রা করিলেন। দত্ত মহাশয়ও যথেষ্ট সম্মানের সহিত বিশেষ আগ্রহ সহকারে কন্যাদান কর্ম্ম সম্পন্ন করিলেন। যথাসময়ে বর ও নববধূ মহিষখোলার বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে দেশাচার ও স্ত্রী-আচার অনুসারে উভয়কে গৃহে লইয়া যাওয়া হইল। আনন্দময়ী কনকসুন্দরী পুত্র এবং পুত্রবধূকে কোলে বসাইয়া সুখের সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। তাঁহার নিকট এই সময় স্বর্গসুখও অতিতুচ্ছ বোধ হইতে লাগিল। তিনি অতিশয় আগ্রহ সহকারে একবার পুত্রমুখ দেখেন, একবার পুত্রবধূর মুখ দেখেন, আর বলেন,—"হায়রে! আমি এই স্বর্ণপ্রতিমাখানি কোথায় রাখি? এ যে আমার হৃদয়ের মাণিক—নয়নের আনন্দ! আমার কপালে যে এত সুখ হইবে, আশা ছিল না। মা জগদম্বা করুণা করিয়া এই নিধিটী দিয়াছেন, এখন বাঁচিয়া থাকুক, আমার সকল সাধ পূর্ণ হইয়াছে। এবার রাইচরণ আমার ইহাকে লইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার করুক।"

বাড়ীতে যে কোন উৎসবই হউক, রাইচরণ বাবুর অন্নদান করাই চাই। তিনি অপর দানের বড় একটা পক্ষপাতী ছিলেন না। প্রায়ই

বলিতেন, "একজনকে উদর পূরণ করিয়া নানাবিধ দ্রব্য আহার করাইলে সে যত আনন্দ লাভ করিবে, হাজার টাকা দিলেও সে সেরূপ আনন্দ লাভ করিবে না। বিবাহোপলক্ষে তিন চারি দিন পর্য্যন্ত দেশস্থ সকল লোকদিগকে এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে আগত আত্মীয়-কুটুম্ববর্গকে অতিশয় যত্নসহকারে নানাবিধ উপাদেয় দ্রব্য দ্বারা পরম পরিতোষ সহকারে আহারাদি করাইলেন। দুঃখী কাঙ্গালীগণ আকণ্ঠ ভোজন করিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, "আমরা অনেক স্থানে খাইয়া বেড়াই; কিন্তু এই বাবুর বাড়ী যখনই খাই, এমন যত্ন-আদর আর কোথাও পাই না।" প্রকৃতপক্ষেও রাইচরণ বাবু আজীবন সকল লোকের আদর-যত্ন করিয়া খাওয়াইতে বড়ই ভালবাসিতেন।

যথাসময়ে বিবাহোৎসব শেষ হইয়া গেল। দেবী স্বর্ণময়ী এক্ষণে গৃহ-লক্ষ্মী হইলেন। বলিতে কি, দেবী স্বর্ণময়ী গৃহে আসিবার পর হইতেই ক্রমশঃ সংসারের উন্নতি হইতে লাগিল। তিনি অতিশয় মৃদুভাষিণী ছিলেন। নিজ স্বভাবগুণে আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশিনীগণকে ক্রমে এতই মুগ্ধ করিয়া ফেলিলেন যে, তাঁহারা কথায় কথায় দেবী স্বর্ণময়ীর দৃষ্টান্ত দিতেন। শাশুড়ী পুত্রবধূকে শিক্ষা দিবার সময় দেবী স্বর্ণময়ীর চরিত্র উল্লেখ করিতেন। এইরূপে অতি অল্পকাল মধ্যেই দেবী স্বর্ণময়ী সর্ব্বসাধারণের প্রিয়পাত্রী হইয়া পড়িলেন। সচরাচর ননদিনীর প্রতি ভ্রাতৃবধূর যেরূপ ব্যবহার দেখা যায়, দেবী স্বর্ণময়ীর জীবনে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব ছিল। বিবাদ বিসম্বাদ কাহাকে বলে, তিনি একেবারেই জানিতেন না। আগন্তুক লোক, ননদিনী মোক্ষদাসুন্দরীর সহিত তাহার ব্যবহার দেখিলে মনে করিত, ইনিই স্বর্ণময়ীর শাশুড়ী। মোক্ষদাসুন্দরীও ভ্রাতৃবধূকে পুত্রবধূবৎই স্নেহ ও যত্ন করিতেন। রাইচরণ বাবুর এখন সোণার সংসার। দেবী কনকসুন্দরীর আর আনন্দের সীমা নাই।

মাতৃদেবীর পরলোক

ক্রমে দিনের পর দিন—মাসের পর মাস চলিয়া গেল। আনন্দের দিন—সুখের সময় শীঘ্রই চলিয়া যায়। দেবী কনকসুন্দরী বয়োবৃদ্ধিবশতঃ ক্রমেই যেন জীর্ণশীর্ণকলেবরা হইতে লাগিলেন। তখন তিনি প্রায়ই বলেন, "মা জগদম্বে! আমার মনের সকল সাধ পূর্ণ হইয়াছে। এইবার আমায় চরণে স্থান দাও মা!" একদিন প্রাণাধিক রাইচরণকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাবা! এখন আর তোমার পূর্ব্ববৎ খেলা করিয়া বেড়াইলে চলিবে না। এক একবার সংসারের প্রতিও একটু একটু দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আর বাবা! আমি বোধ হয় বেশীদিন বাঁচিব না। তুমি যেখানেই থাক, অন্তিমকালে যেন আমার কাছছাড়া হইও না। শেষকালে বাবা, আমার মুখে একটু গঙ্গাজল দিও এবং হরিনাম শুনাইও।" রাইচরণ বাবু একটু চিন্তিত হইয়া জননীকে সান্ত্বনা দান করিলেন।

নানা কারণে রাইচরণ বাবুর লেখা পড়ায় অনেক বাধাবিঘ্ন হইতে লাগিল। সংসারচিন্তাই তাহার প্রধান কারণ। সময় সময় তিনি নিজের কথা নিজে বসিয়া ভাবিতেন। কখনও বা সঙ্গিগণকে বলিতেন, "বোধ হয় ভগবান্ আমাকে আর বেশীদিন পড়িতে দিবেন না। মাতা ঠাকুরাণীর শরীর ক্রমশঃই ভগ্ন হইতেছে এবং তিনি দিন দিন অতিশয় কাতরা হইতেছেন। অনেক ভাল কবিরাজ দেখান হইল, কিছুতেই কিছু হইল না।" কিছুদিন পরেই দেবী কনকসুন্দরী পুত্র ও পুত্রবধূর চাঁদমুখ চাহিয়া "হরে রাম নারায়ণ ব্রহ্ম" বলিতে বলিতে মানবলীলা সংবরণ করিলেন। মাতৃশোকে রাইচরণ বাবু এবং দেবী স্বর্ণময়ী উভয়েই অতিশয় অধীর হইয়া পড়িলেন। রাইচরণ বাবু আত্মীয়কুটুম্বগণকে

লইয়া মাতৃদেবীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। কিরূপভাবে শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিতে হইবে, শ্বশুর মহাশয় এবং গ্রামবাসী আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সেই সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তাঁহার উদার চরিত্রগুণে এবং সরল ব্যবহারে গ্রামবাসী আপামর-সাধারণ সকলেই তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিত। আজ রাইচরণ বাবু নিঃসহায় বালক হইয়াও পরম সহায়বান্ পুরুষ। সকলেই তাঁহার বন্ধু—সকলেই তাঁহার পরম হিতৈষী—সকলেই নিজ কার্য্যের ন্যায় তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধকার্য্যে সহায়তা করিতে লাগিলেন। মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে রাইচরণ বাবু দানসাগর, বৃষোৎসর্গ প্রভৃতি কর্ম্মের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। মহাসমারোহের সহিত কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। তিন চার দিন পর্য্যন্ত বহু লোক-জনকে "দীয়তাং ভোজ্যতাম্" ভাবে পরম সমাদরের সহিত ভোজন করান হইল। একেই ত লোকজনকে অন্নদান করিতে রাইচরণ বাবু মুক্তহস্ত, তাহাতে আবার মাতৃ-উদ্দেশ্যে। আজ আর কিছু বাদবিচার নাই। যে যাহা চাহিতেছে, অবিচারে বিতরণ করিতেছেন। সমস্ত কার্য্য অতিশয় সুশৃঙ্খলরূপে সমাধা হইয়া গেল! দুই ভাইভগিনীতে পরামর্শ করিয়া যাহা যখন ভাল বিবেচনা করেন, তাহাই করিতে লাগিলেন। ক্রমে বৎসর পূর্ণ হইলে রাইচরণ বাবু তাঁহার পরলোকগতা মাতৃদেবীর সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিলেন।

পুত্রলাভ

শুভক্ষণে দেবী স্বর্ণময়ী একটী পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। পুত্রটীর অপরূপ রূপ দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ ও বিমোহিত হইল। যথাকালে বিশেষ সমারোহের সহিত রাইচরণ বাবু পুত্রের অন্নপ্রাশন শুভকার্য্য সম্পন্ন করিলেন। এই সময়ে কয়েকটী ভদ্রলোকের বিশেষ আগ্রহে রাইচরণ

বাবু দক্ষিণবাড়ী পতুম্‌দী গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ দত্ত মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। দুই বৎসরকাল জীবিত থাকিয়া তাঁহার এই স্ত্রী পরলোক গমন করেন। ক্রমে পুত্রটী পঞ্চম বৎসর অতিক্রম করিয়া ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করিল। পুত্রটীর বাল্যভাবের ক্রিয়াকলাপ ও বুদ্ধিবৃত্তি দেখিয়া রাইচরণ বাবু প্রায়ই বলিতেন, "এ কখনই বাঁচিবে না।" দিদি এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিতেন, "দেখ্ রাইচরণ, তুই এমন অমঙ্গলের কথা মুখে আনিস্ না।" ছয় বৎসর শেষ হইতে না হইতেই পুত্ররত্নটী মাতাপিতা ও আত্মীয় স্বজনকে কাঁদাইয়া ইহধাম ত্যাগ করিল। পুত্রশোকে মা স্বর্ণময়ী এবং মোক্ষদাসুন্দরী অন্তরে বড়ই ব্যথা পাইলেন। কিন্তু ইহা দৈবাধীন কার্য্য—জন্মমৃত্যু সকলেরই আছে। এই ভাবিয়া মনকে কথঞ্চিৎ শান্ত করিলেন। দেবী স্বর্ণময়ী বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার আর সন্তানাদি হইবার সম্ভাবনা নাই। এইজন্য তিনি পুনর্ব্বার স্বামীর বিবাহ দিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু রাইচরণ বাবু ইহাতে কিছুতেই সম্মত না হওয়ায় তিনি বড়ই দুঃখিতা হইলেন। এই সময় রাইচরণ বাবুর মুখে সর্ব্বদা একটি গান শুনা যাইত। সে গানটী এই—

"আর হরিনাম বল্‌বি কবে ?
ভাবিতে শুনিতে রে মন দিনে দিনে দিন ফুরাবে ॥
পদ্মপত্রের বারি যেমন, তেমতি জীবের জীবন.
ঢলিয়া পড়িবে যখন, অমনি অঙ্গ অবশ হবে ॥
দেহের বাতি এই দুই নয়ন, যাতে কর দিক্ দরশন,
প্রবল হইলে কাল-পবন, (অমনি) জ্বালা বাতি নিবে-যাবে ॥
যদি বল বন্ধুজনে, নাম শুনাবে সেই নিদানে,
শুন্‌তে পাবিনে পাবিনে, অমনি কর্ণ বধির হবে ॥"

তৃতীয় পরিণয়

রাইচরণ বাবুর বয়স এখন প্রায় পঁচিশ বৎসর। মোক্ষদাদিদি মাঝে মাঝে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ঘোড়াখালী তাঁহার মাতুলালয়ে যাতায়াত করিতেন। এই উদ্দেশ্যে রাইচরণ বাবুকেও ভগিনীর সঙ্গে এক একবার ঘোড়াখালী যাতায়াত করিতে হইত। ঐ গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত বদনচন্দ্র সরকার মহাশয় অপুত্রক; তাঁহার তিনটী মাত্র কন্যা। সরকার মহাশয় বড়ই সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার যথেষ্ট বিষয় সম্পত্তি ছিল; কিন্তু তাহার প্রতি একেবারেই আসক্তি ছিল না। তিনি অনাসক্তভাবে সংসার করিতেন। পত্নী শশিমুখী দেবী ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, "কে খাইবে? কোনও রকমে আমার দিন কাটিয়া গেলেই হয়। তিনটী মেয়ের বিবাহ দিলেই আমি নিশ্চিন্ত হই।" ইহার কিছুদিন পরে সরকার মহাশয় রাইচরণ বাবুর খুল্লতাত শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পুত্র বসন্ত-কুমারকে তাঁহার প্রথমা কন্যা অর্পণ করিলেন। সরকার মহাশয়ের নিতান্ত ইচ্ছা যে, রাইচরণ বাবুকে একটী কন্যাদান করিয়া তাঁহাকেই তাঁহার যাবতীয় ভূসম্পত্তির অধিকারী করিয়া যান। সরকার মহাশয় রাইচরণ বাবুকে পুত্রনির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত নিজের মনোভাব তাঁহার নিকট প্রকাশ করিতে সাহসী হন নাই। একদিন কথায় কথায় সরকার মহাশয় মোক্ষদাসুন্দরীর নিকট এই প্রস্তাব করিলে তিনি তাহার কোন উত্তর না দিয়া দেবী স্বর্ণময়ীকে আসিয়া সমস্ত কথা বলিলেন। দেবী স্বর্ণময়ীও ইহা শুনিয়া বড়ই সুখী হইলেন এবং স্বামীর নিকট বিশেষ অনুরোধ করিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক বহু সমারোহের সহিত সরকার মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী ত্রৈলোক্য-

তারিণীর সঙ্গে তাঁহার স্বামীর শুভ পরিণয়কার্য্য সমাধা করিলেন। সরকার মহাশয় রাইচরণ বাবুকে বলিলেন, "বাবা, আমার পুত্রসন্তান নাই, তুমিই আমার পুত্র। আমার সমস্ত সম্পত্তি তোমারই; তুমি দেখিয়া শুনিয়া রক্ষণাবেক্ষণ কর। আমি আজ হইতে নিশ্চিন্ত হইলাম।" রাইচরণ বাবুও শ্বশুরের সম্পত্তিকে নিজ সম্পত্তি মনে করিয়া উহার তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন।

মন্ত্রগ্রহণ ও ঘোড়াখালীবাস

এই সময় রাইচরণ বাবু খুলনা জেলার অন্তর্গত মূলঘর গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করেন। মহিষখোলা হইতে ঘোড়াখালী যাতায়াত বড়ই অসুবিধাজনক দেখিয়া তিনি মহিষখোলার বাড়ী পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঘোড়াখালী আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তথাকার প্রজাগণ রাইচরণ বাবুর সরল ব্যবহারে এতই সন্তুষ্ট হইল যে, বহুকালের বে-দখলি সম্পত্তিতেও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ইহাকে দখল দিতে আরম্ভ করিল। এমন কি, প্রজাদের নিজ নিজ বাড়ীতে কোনও ফসল জন্মিলে বা গাভী প্রসূতা হইলে, অগ্রভাগ ইহাকে না দিয়া তাহারা ভোগ করিত না। গ্রামে অনেক জমি পতিত থাকায় রাইচরণ বাবু বিদেশ হইতে দশ পনের ঘর বুনো (সাঁওতাল-জাতীয় লোক) আনিয়া গ্রামের একপ্রান্তে বসাইলেন। তাহাদের দ্বারাই জঙ্গল কাটাইয়া ভূমি আবাদ করিতে লাগিলেন। ছয় সাত মাসকাল পর্য্যন্ত প্রতিদিন নিজ সরকার হইতে প্রায় আশি নব্বইজন লোকের আহারাদির ব্যবস্থা করিতেন এবং তিন বৎসরকাল জমির কর ছাড়িয়া দিয়া সমস্ত পতিত জমি আবাদ করতঃ জমিদারীর আয় বৃদ্ধি করিলেন।

জমিদারী-কার্য্যে রাইচরণ বাবুর এইরূপ নৈপুণ্য দেখিয়া-শুনিয়া হুগলী জেলার অন্তর্গত শ্রীরামপুর-নিবাসী জমিদার বাবু আশুতোষ গোস্বামী মহাশয় বিশেষ অনুরোধপূর্ব্বক ইঁহাকে মামুদপুর সদর কাছারীর নায়েবীপদ প্রদান করেন। দেবী ত্রৈলোক্যতারিণীর গর্ভে প্রথম একটী কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করে। কন্যাটী পরমাসুন্দরী দেখিয়া তাহাকে সকলে "ফেণী" বলিয়া ডাকিত। ভগবদিচ্ছায় চার পাঁচ মাস কাল পরেই মেয়েটী ইহলোক পরিত্যাগ করিল। তৎপরে দেবী ত্রৈলোক্যতারিণীর গর্ভে রাইচরণ বাবুর একটী পুত্র সন্তান জন্মে। তাহার নাম "ফণিভূষণ।" বিধির বিধি কে অন্যথা করিবে? ফণিভূষণও ছয় সাত মাসকাল পরেই অকালে দেহত্যাগ করিল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, রাইচরণ বাবু বড়ই সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। যখন বাড়ীতে থাকিতেন, তখনও সদানন্দপুরুষ সর্ব্বদা সঙ্গীতরসে মগ্ন; কাছারীতেও তদ্রূপ। নবীন বৈরাগী বা বৈষ্ণবী দেখিলে তাহাদের উপর তিনি বেশ কটাক্ষ করিতেন। তিনি দেশে থাকিলে তাঁহার ভয়ে সে পাড়ায় বৈরাগী বৈষ্ণবী যাইত না। সকলেরই ধারণা ছিল যে, রাইচরণ বাবু ঘোর বৈষ্ণবদ্বেষী। কিন্তু তাঁহার বাড়ীতে বা কাছারীতে প্রায়ই হরিসংকীর্ত্তন হইত। তিনি স্বয়ং হরিনাম সংকীর্ত্তন বড় ভাল বাসিতেন ও করিতেন। বাল্যকাল হইতে তাঁহাকে কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম বা দেবতাকে দ্বেষ করিতে দেখা যায় নাই। তবে এই বৈষ্ণবদ্বেষ কেন এবং কি—ইহাই আমাদের পর্য্যালোচনার বিষয়।

রাইচরণ বাবু কেন, অনেক শিক্ষিত লোকের মধ্যেও দেখা যায় যে, বৈষ্ণব নাম শুনিবামাত্রই তাহারা শিহরিয়া উঠেন। একজন বৈষ্ণব বাড়ীতে আসিয়াছেন শুনিলে, তাঁহাদের গাত্রদাহ হয়, নাসিকা কুঞ্চিত করেন। বলিতে কি, এমনই একটা সময় আসিয়া পড়িয়াছে যে,

বৈষ্ণব বা বৈরাগী শব্দের প্রকৃত অর্থ লোপ পাইয়া এখন উহা রূঢ়ি অর্থেই ব্যবহৃত হইতেছে। অর্থাৎ বৈষ্ণব বলিতে যেন চরিত্রহীন দুরাচার লোককেই বুঝায়। ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। একই সময়ে একজন গৈরিক বসন, কপালে সিন্দূরের ফোঁটা, হাতে ত্রিশূল ধারণ করিয়া ভৈরব বেশে একটি ভৈরবী সঙ্গে করিয়া বেড়াইতেছেন। সময়ে সময়ে তাঁহাকে মদ্যমাংসাদি ব্যবহার করিতে দেখিলেও লোকের নিকট তাঁহার অনাদর নাই এবং তাঁহাকে কেহই কটাক্ষ করেন না; কিন্তু তাঁহার সমবয়স্ক আর একজন একখানি ছিন্ন বহির্বাস, কপালে গোপীমৃত্তিকা বা গঙ্গামৃত্তিকার তিলক, কণ্ঠে তুলসীর মালা ধারণ করিয়া নিষ্কিঞ্চনভাবে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছেন। মাদকদ্রব্যস্পর্শ কাহাকে বলে তিনি জীবনে জানেন না। আজীবন প্রকৃতিসঙ্গ বা আমিষের সংস্রব হইতে দূরে থাকেন, তথাপি তাঁহাকে দেখিলেই শিক্ষিত লোকে অনাদর করেন—অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন এবং তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ বাণে তাঁহার হৃদয় বিদ্ধ করেন। ইহার প্রতি কারণ কি? প্রবল প্রতাপান্বিত মহারাজাধিরাজ-চক্রবর্ত্তী কলিরাজের শাসনে জগৎ ভক্তিহীন, বিষ্ণুবৈষ্ণবদ্বেষী, স্বধর্ম্মানুরাগবিহীন, হিংসাদ্বেষপূর্ণ, বাহ্যাড়ম্বরপরায়ণ দেখিয়া চারিশত কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পরমদয়াল পতিতপাবন শ্রীশ্রীভগবানের প্রাণ কাঁদিয়াছিল। তাই পূর্ণ পূর্ণতম ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিজ সুখৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক জীবকে প্রকৃত এবং বিশুদ্ধ ভজনপথ দেখাইবার জন্য শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নিজ আচরিত পন্থা এবং নিজ অভিমত ও বিশুদ্ধ ভজনপথ, পণ্ডিত, জ্ঞানী মূর্খ, নীচ, শূদ্র, আপামর সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য পরম পণ্ডিত শ্রীসনাতন গোস্বামী, শ্রীরূপ গোস্বামী, লোকনাথ গোস্বামী, গোপাল ভট্ট গোস্বামী, রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী, জীব গোস্বামী, রঘুনাথ দাস

গোস্বামী প্রভৃতি শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর নিত্য পার্ষদগণ এবং তাঁহার অভিন্ন-কলেবর শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু, হরিদাস ঠাকুর, নরহরি সরকার ঠাকুর, গোবিন্দ দাস, রায় রামানন্দ প্রভৃতি নিজ জনকে নিযুক্ত করেন। কেহ কেহ বা আর্য্যভাষায় গ্রন্থাদি দ্বারা, কেহ কেহ বা নামসংকীর্ত্তন দ্বারা, কেহ কেহ বা তপ ও জপবলে, কেহ কেহ বা লীলারসাদিকীর্ত্তনে মহাপ্রভুর প্রকৃত মনোগত ভাব জগতে বিতরণ করিতে লাগিলেন। কলিপাবনাবতার লীলাময় ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ইচ্ছায় এবং কলিহত জীবের নিতান্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ অতি অল্পকাল মধ্যেই তাঁহারা প্রাকৃত চক্ষুর অগোচর হইলেন। অবসর পাইয়া পরাভূত কলিরাজ সসৈন্যে পূর্ব্বোক্ত মহাজনগণের ন্যায় কপট বেশ ধারণ করিয়া দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে তীর্থে তীর্থে ধর্ম্মপ্রচারছলে উপধর্ম্মাদি প্রচার করতঃ স্ব স্ব ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিতে লাগিলেন। কাজে কাজেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকৃত ধর্ম্মাবলম্বিগণ দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। পাপের প্রাদুর্ভাব চিরকালই। অধর্ম্মের অগ্নি অতি প্রবলভাবে প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। বিশেষতঃ অনভিজ্ঞ, মূর্খ, নীচ, স্ত্রীজাতির ভিতরে এই ধর্ম্মধ্বজী ভাবটী এমন ভাবেই প্রবেশ করিতে লাগিল যে, জগতের চোখে সতের পরিবর্ত্তে অসৎ, ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে অধর্ম্ম, এবং সতীত্বের পরিবর্ত্তে ব্যাভিচারিতাই দৃষ্ট হইতে লাগিল। বলিতে কি, শুভ্রবস্ত্রে মসীবিন্দুর ন্যায় কামক্রোধাদিপরিশূন্য, হিংসাদ্বেষরহিত প্রভুর প্রচারিত অতি বিশুদ্ধ ধর্ম্মপন্থায় এই উপধর্ম্মভাবটী এতই উজ্জ্বল হইয়া উঠিল যে, "অনিচ্ছতোঽপি" লোকের দৃষ্টিপথের কণ্টকস্বরূপ হইয়া পড়িল। কাজে কাজেই প্রকৃত ধর্ম্ম বা ধাম্মিকদ্বেষী না হইলেও ইন্দ্রিয়চারী, ধর্ম্মব্যবসায়ী এবং উপধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগের সমান বেশভূষা ও হাবভাবাদি দর্শনে প্রকৃত বিশুদ্ধসত্ত্ব বৈষ্ণবদিগকেও লোকে অবজ্ঞার চোখে দেখিতে লাগিল।

আমাদের রাইচরণ বাবুও ঠিক এই প্রকৃতির লোক ছিলেন। চরিত্রের প্রতি তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তিনি বলিতেন কোনও লোক যদি ধর্ম্মাদি আচরণ নাও করে, কিন্তু চরিত্রবান্ হয়, তথাপি সে লোকপূজ্য, কিন্তু ধর্ম্মকর্ম্মপরায়ণ হইয়াও যে অসচ্চরিত্র হয়, তাহার সঙ্গ অবশ্য পরিহার্য্য।

রাইচরণ বাবু মামুদপুরের কাছারীতে কাজকর্ম্মে ব্যস্ত আছেন, এই সময় সংবাদ গেল যে, তাঁহার শ্বশুর মহাশয় সাংঘাতিক পীড়িত। বাড়ীতে আসিয়া দেখেন, এ যাত্রায় তাঁহার জীবনরক্ষা হওয়া দুষ্কর। কাজে কাজেই কয়েক দিবস তাঁহাকে সেখানেই থাকিতে হইল। সেই পীড়াতেই শ্বশুর মহাশয় ভবলীলা সংবরণ করিলেন। রাইচরণ বাবু তাঁহার শ্রাদ্ধাদি কার্য্য উপলক্ষে যথেষ্ট অর্থব্যয় করিলেন। শ্বশুর মহাশয় বর্ত্তমানে রাইচরণ বাবু সাংসারিক কার্য্যের প্রতি তত মনোযোগ দিতেন না; কিন্তু তাঁহার পরলোকগমনের পর হইতে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে সংসারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি করিতে হইল। এদিকে জমিদারী কার্য্যেও দিন দিন তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ হইতে লাগিল।

দেশহিতৈষিতা

পরোপকার-ব্রতটী যেন রাইচরণ বাবুর সহজাত। পরদুঃখে প্রাণ কাঁদা তাঁহার চিরদিনের স্বভাব। একবার পৌষ মাসে কাছারী হইতে ঘোড়াখালী আসিয়া গ্রামের মধ্যে বেড়াইতে গিয়া দেখেন, জলাভাবে লোকের বড়ই কষ্ট। প্রজার দুঃখে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল—হৃদয় গলিল। তখন তাহাদিগের মধ্যে একজন প্রধান লোককে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ, একটী পুষ্করিণী কাটাইতে হইবে। আমি এ সময় এখানে থাকিতে পারিব না। অতএব তোমার উপর এই কার্য্যের সম্পূর্ণ ভার দিলাম। এই কার্য্যে যত টাকা ব্যয় হইবে, আমি দিব। কিন্তু পুষ্করিণীটী

এমন হওয়া চাই, যাহাতে গ্রামের লোকের জলকষ্ট দূর হয়।" রাইচরণ বাবুর যে কথা, সেই কাজ। বহু অর্থব্যয় করিয়া পুষ্করিণীটি অতি সুন্দর-রূপে খনন করান হইল। লোকের জলাভাব সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইল। সর্ব্বসাধারণের পরম মঙ্গল হইল। রাইচরণ বাবুর আদেশে পুষ্করিণীর চারিধারে কদলীবৃক্ষ এবং সময়োচিত শাকসব্‌জি, তরকারী প্রভৃতি রোপণ করা হইল এবং তাহারা যথাকালে ফলবান্ হইলে গ্রামস্থ প্রজাবর্গ সকলেই ফলভোগ করিতে লাগিল।

গ্রামস্থ অধিকাংশ বালকগণই লেখাপড়া শিখে নাই দেখিয়া রাইচরণ বাবুর মনে বড়ই দুঃখ হইল। তিনি তাহাদিগের পিতা-মাতাকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল, "বাবু! কি করিব? আমাদের গ্রামে বিদ্যালয় নাই; ভিন্ন গ্রামে রাখিয়া পয়সা খরচ করিয়া ছেলেদের লেখাপড়া শিখান আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য।" ইহা শুনিয়া তিনি অত্যন্ত দুঃখিতচিত্তে বলিতে লাগিলেন, "তোমরা আমাকে এতদিন একথা বল নাই কেন?" এই বলিয়া তিনি নিজের বহির্ব্বাটীতে খুব বড় একখানি আটচালা ঘর নির্ম্মাণ করাইয়া একটী অবৈতনিক পাঠশালা স্থাপন করতঃ নিজেই শিক্ষকদিগের বেতন দিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি বালকদিগের জন্য শিক্ষামন্দির স্থাপন করিয়া প্রজাবর্গের আশীর্ব্বাদভাজন হইলেন। কেবল যে তিনি নিজগ্রামে ঐরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা নহে। যে স্থানে চাকরী করিতেন, সে স্থানেও এইরূপ জলাশয়-প্রতিষ্ঠা, বিদ্যালয়স্থাপন প্রভৃতি সৎকার্য্যের দ্বারা দেশের হিতসাধন করিয়াছিলেন।

নিজ বাড়ীতে রাইচরণ বাবু দোল, রাস, ঝুলন, চড়ক প্রভৃতি পর্ব্ব উপলক্ষে গ্রামস্থ ব্রাহ্মণ কায়স্থ এবং অপরাপর যাবতীয় গ্রামবাসীদিগকে অতিশয় সমাদরের সহিত নানাবিধ বস্তু ভোজন করাইতেন। বিদেশস্থ

পরিচিত লোক সেই গ্রাম দিয়া যাইবার সময় সর্ব্বদা তাঁহার বাটীতে আসিতেন। তিনি তাহাদিগকে অতি আগ্রহসহকারে বাড়ীতে রাখিয়া আহারাদি-দ্বারা পরিতৃপ্ত করিতেন। যদি কেহ বলিতেন, "দেখুন রাইচরণ বাবু, এইরূপ যখন তখন এখানে আসিয়া আপনার অন্নধ্বংস করিতে আমাদের বিশেষ লজ্জা বোধ হয়।" তাহার উত্তরে তিনি বলিতেন, "কেন? আমি ত বাজারের চাউল খরিদ করিয়া তাহার ভাত খাই না। আমি আমার নিজ জমির ধানের ভাত খাই। তাহার আবার হিসাব কি? বাড়ীতে জমির ধান সব গোলাযাত করা রহিয়াছে; তোমাদের লজ্জার কারণ কি? ইহা ত আমার পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে।" রাইচরণ বাবুর এইরূপ উদার প্রকৃতি ও সদাশয়তা দেখিয়া সকলেই তাঁহার উপর পরম সন্তুষ্ট হইতেন। নিকটবর্ত্তী কোনও গ্রামে সদনুষ্ঠানের উদ্যোগ হইলেই গ্রামস্থ লোকে রাইচরণ বাবুকে সেখানে সর্ব্বাগ্রে লইয়া গিয়া তাঁহার মতানুরূপ কার্য্য করিয়া সকলেই পরমানন্দ লাভ করিতেন।

পদোন্নতি ও ঔদাস্যসঞ্চার

জমিদার বাবু আশুতোষ গোস্বামী মহাশয় রাইচরণ বাবুকে বিশেষ ভালবাসিতেন। কোন কার্য্যে পরামর্শ করিতে হইলে তাঁহার মামুদপুর কাছারীর নায়েব রাইচরণ বাবুকে না ডাকিলে কার্য্যসিদ্ধি হইত না। জমিদার মহাশয় ইঁহার পরিমার্জ্জিত বুদ্ধিকৌশল, নিরপেক্ষতা ও কার্য্য-দক্ষতা দেখিয়া ইঁহাকে সাঁতর পরগণার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ পদে উন্নীত করিলেন। জমীদারী কার্য্য সুচারুরূপেই চলিতে লাগিল। কিন্তু রাইচরণ বাবুর মন যেন সর্ব্বদা উদাস; আর যেন তাঁহার সংসার ভাল লাগে না। আর যেন প্রভু হইয়া লোকের উপর শাসনদণ্ড ধারণ

করিতে তাঁহার ইচ্ছা হয় না। জমিদারের কার্য্য ষড়যন্ত্রতায় পরিপূর্ণ। হঠাৎ সে কার্য্য পরিত্যাগ করা সুকঠিন। সংসার-বন্ধন ছিন্ন করা রাইচরণ বাবুর পক্ষে তত কঠিন নহে; কিন্তু জমিদার আশু বাবুর হাত ছাড়ানই সুকঠিন। মনে মনে তিনি এক মতলব ঠিক করিয়া নিজ বাড়ীতে আসিয়া বসিলেন।

এই সময় তাঁহার দীক্ষাগুরু শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঘোড়াখালীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র অতিশয় আনন্দের সহিত রাইচরণ বাবু তাঁহার যথোচিত আদর অভ্যর্থনা করিলেন। একদিন গুরুশিষ্যে নির্জ্জনে বসিয়া নানাপ্রকার কথোপকথন করিতে লাগিলেন। শিষ্য বলিলেন, "গুরুদেব, আপনাকে আমার করকোষ্ঠী একটু বিশেষ করিয়া দেখিতে হইবে।" ভট্টাচার্য্য মহাশয় জ্যোতিষ-শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন; অতএব তিনি আনন্দের সহিত শিষ্যের করকোষ্ঠী গণনা করিতে বসিলেন। করকোষ্ঠী দেখিতে দেখিতে গুরুদেব প্রশ্ন করিলেন, "তোমার কোষ্ঠী আছে ত?" শিষ্য উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে আছে।" গুরুদেব বলিলেন, "তবে একবার সেখানা আন দেখি।" শিষ্য তাঁহার দিদি মোক্ষদাসুন্দরীর নিকট হইতে কোষ্ঠীখানা চাহিয়া আনিয়া গুরুদেবের হাতে দিলে তিনি হাতে এবং কোষ্ঠীতে মিলাইয়া দেখিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ দেখিয়া বলিলেন, "বাবা, রাইচরণ! তোমায় ত আর বেশী দিন সংসারভোগ নাই। অতি অল্পদিনের মধ্যেই তুমি গৃহত্যাগ করিবে। সন্তানদিগের মধ্যে একটী মাত্র কন্যা থাকিবে। শেষ জীবনে তোমার বড়ই উন্নত অবস্থা হইবে। অধিক কি বলিব? একদিন তোমার এমন অবস্থা আসিবে যে বহুলোকে তোমার পূজা করিবে।"

রাইচরণ। গুরুদেব! ইহাকেই কি আপনি উন্নত অবস্থা বলেন?

লোকে পূজা করিলে আমার কি হইবে? আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন সকলের ছোট হইতে পারি।

গুরুদেব। বাবা! আমি তাহা বলি নাই। তবে যতদূর দেখিতেছি তাহাতে তোমার শেষ জীবনের উন্নতির কথা আমি ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারিতেছি না। তোমার করকোষ্ঠী ও জাতকোষ্ঠীর ফল দেখিয়া আমি নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। আর তোমাকে অধিক কি বলিব?

রাইচরণ। গুরুদেব, পুরশ্চরণ বিধিটা আমায় লিখিয়া দিতে হইবে।

গুরুদেব। বাবা, আমি তোমার জন্য সকলই করিতে পারি। তুমি যাহা বলিবে, আমি তাহাই করিয়া দিতেছি। কিন্তু দেখ বাবা আমায় যেন ভুলিও না।

রাইচরণ। প্রভো! আপনি কি বলেন? আমি যে অবস্থায়ই থাকি না কেন, একমাত্র আপনার কৃপা ভিন্ন আমার আর কি সম্বল আছে? আপনি আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমার মনোবাসনা পূর্ণ হয়।

এইরূপে বহুক্ষণ নির্জ্জনে গুরুশিষ্যের কথোপকথন হওয়ার পর ভট্টাচার্য্য মহাশয় পুরশ্চরণ বিধি লিখিয়া দিলেন। ইহার কিছুদিন পরে রাইচরণ বাবু একবার বাধ্য হইয়া সাঁতর কাছারীতে গেলেন। এদিকে দেবী ত্রৈলোক্যতারিণী একটী কন্যারত্ন প্রসব করিলেন। রাইচরণ বাবুর তাৎকালিক মানসিক গতি অনুসারে কন্যাটীর নাম রাখা হইল "হরিদাসী।"

চাক্‌রীতে অনিচ্ছা

এদিকে জমিদার আশু বাবুর জমিদারীর মধ্যে পোরাইল কাছারীর অধীন দাদড়ীয়ার বিল লইয়া প্রজাবিদ্রোহ উপস্থিত হইলে অন্য কোন কর্ম্মচারী শাসন করিতে না পারায় আশু বাবু রাইচরণ

বাবুকে ঐ এলাকা দখল করিয়া দিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন রাইচরণ বাবু আশুবাবুকে বলিলেন, "আমাকে এই চাকুরী হইতে নিষ্কৃতি দিন, আমি আর মারামারি কাটাকাটির মধ্যে যাইতে ইচ্ছা করি না।" এই বলিয়া পুনরায় ঘোড়াখালী চলিয়া গেলেন। আশু বাবু বিশেষ আগ্রসহকারে একখানি পত্র লিখিলেন। পত্রখানি এই :—

"আপনাকে আমি আর কিছুই বলিতে চাহি না। আপনি একবার আসিয়া আমার সহিত দেখা করিবেন। কোনওরূপে অন্যথা না হয়, এই আমার বিশেষ অনুরোধ।"

এরূপ সংবাদেও রাইচরণ বাবুর ভ্রূক্ষেপ নাই। আশুবাবু পুনরায় একজন লোকদ্বারা ঐরূপ আর একখানা পত্র পাঠাইলেন। তাহার উত্তরে রাইচরণ বাবু লিখিলেন—

"আমার আর কাজ করিতে ভাল লাগিতেছে না; অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে চাকুরী হইতে নিষ্কৃতি দিন। সময়ান্তরে আপনার চরণ দর্শন করিবার ইচ্ছা রহিল। এসময় আমাকে ক্ষমা করিবেন।"

কিন্তু আশু বাবু তাঁহার এই বিপদের সময় রাইচরণ বাবুকে কিছুতেই ছাড়িতে চাহিলেন না। কারণ রাইচরণ বাবু ভিন্ন তাঁহাকে এ বিপদ হইতে রক্ষা করে, এমন আর কেহই নাই। এই ভাবিয়া তিনি পুনরায় দুইজন লোকের সঙ্গে তাঁহাকে আনিতে একটী ঘোড়া পাঠাইলেন। গ্রামস্থ অনেক ভদ্রলোক তখন রাইচরণ বাবুকে বলিতে লাগিলেন, "দেখুন, এত বড় ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোক, তাহাতে ব্রাহ্মণ, তাঁহার এত আগ্রহ ও যত্ন অগ্রাহ্য করা কোনও মতে যুক্তিসঙ্গত হয় না। আপনার একবার অবশ্য যাওয়া উচিত।" রাইচরণ বাবু

কি করেন, অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেই ঘোড়ায় চড়িয়া ঘোড়াখালী হইতে জমিদার আশু বাবুর সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন। যাইবামাত্র আশু বাবু বিশেষ অনুরোধের সহিত বলিলেন,—"আপনি ভিন্ন আমার ঐ কার্য্য কিছুতেই সম্পন্ন হইবে না। আপনার যত লোক বা অর্থ চাই, আমি দিতে প্রস্তুত আছি। এই প্রজাবিদ্রোহ নিবারণ করিয়া আমায় ঐ সম্পত্তি আপনাকে দখল করিয়া দিতেই হইবে।" রাইচরণ বাবু কি করেন, আশু বাবুর একান্ত অনুরোধে অগত্যা তাঁহাকে এই দুরূহ কার্য্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে হইল। তিনি আশুবাবুকে বুঝাইয়া বলিলেন, "দেখুন, দুই শতখানা কবুলিয়ত লেখাপড়া হইয়া গিয়াছে। এখন পুনরায় অত্যাচার করা যুক্তিসঙ্গত নহে। আমার বিশ্বাস, এ কার্য্যের ফল ভাল হইবে না।" আশু বাবু কিছুতেই শুনিলেন না। কাজে কাজেই রাইচরণ বাবুকে পুনরায় পোয়াহলের কাছারীতে যাইতে হইল। সেখানে যাইয়া তিনি প্রজাদিগকে লইয়া নানারূপ আনন্দ করিতে লাগিলেন। যেখানে একটাকা ব্যয় হইবে, সেখানে দশটাকা ব্যয় করিতে লাগিলেন। কেবল লোকজনকে খাওয়ান ছাড়া তাঁহার কোন কাজ ছিল না। এমন কি, বাড়ী হইতে টাকা লইয়া যাইয়া তাঁহার বাসাখরচ চালাইতে হইত। তাঁহার মনের ভাব, এইরূপ করিলেও যদি আশু বাবু তাঁহাকে বিদায় দেন। কিন্তু তাহাতেও কিছু হইল না। কি করেন, তখন তিনি বাধ্য হইয়া বিদ্রোহী প্রজাদিগের আশুধান্য কাটাইবার জন্য লোক পাঠাইলেন; কিন্তু নিজে কাছারীতে রহিলেন। তাঁহার লোকজন যখন ধান কাটিয়া আনিতেছে, সেই সময় বিদ্রোহীদল প্রায় আট নয় শত লোক সঙ্গে করিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া দাঙ্গা করিবার উদ্যোগ করিল। একজন কর্ম্মচারী আসিয়া রাইচরণ বাবুকে খবর দিল যে

"আপনার মাত্র চারিশত লোক, কিন্তু বিপক্ষদলে প্রায় আট নয় শত লোক একত্রিত হইয়াছে। যাহা হয়, আপনি সত্বর ব্যবস্থা করুন।"

রাইচরণ বাবু প্রথমে বিবাদের স্থানে যাইতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। পরে বিচার করিয়া দেখিলেন যে, একে ত প্রজাদের ক্ষতি করিয়া ধান কাটান হইয়াছে, আবার যদি তাহা লুট হইয়া যায়, তবে জমিদারেরও অনিষ্ট এবং অপমানও হইবে। তিনি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া একটী বন্দুক লইয়া তথায় গিয়া ফাঁকা আওয়াজ করিতে লাগিলেন। বন্দুকের শব্দ শুনিয়া বিপক্ষদল ভয়ে পলায়ন করিল। সেই ধান কাছারীতে আনা হইলে উহা দেখিয়া ইনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "কি গর্হিত কার্য্যই করা হইল! সকল ধানগুলি ভালরূপে পরিপক্বও হয় নাই। কত গরীব লোকের কষ্টের ধন এবং সুখের অন্ন ধ্বংস করিলাম! দাঙ্গা হাঙ্গামা হইলে কত লোকের জীবন নষ্টও হইতে পারিত! আর না, এমন ঘৃণিত কাজ আর করা হইবে না।"

গৃহত্যাগ

বেলা দ্বিপ্রহর; আহারের সময়; গৃহে রন্ধন হইতেছিল। সকল জিনিষ তেমনই রহিল। রাইচরণ বাবু আহার করিলেন না। তাঁহার হৃদয়ে অনুতাপানল ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তাহার উপর অনুরাগের প্রবল বাতাস বহিতেছে; সংসাররূপ শুষ্কতৃণ আর কতক্ষণ থাকিতে পারে? ক্ষণকাল মধ্যে সকলই পুড়িয়া ছাই হইল! তখন আর দেশ-বিদেশ, সময়-অসময়, স্থানাস্থান কিছুই বিচার রহিল না। তিনি যেদিকে তাকাইতেছেন, সকলই যেন শূন্যময়, সংসার যেন একটা বিষম বিষাদের ছায়ামাত্র বোধ হইল। গন্তব্য স্থানের কোন স্থিরতা নাই। কোন দ্রব্যের প্রতি লক্ষ্য নাই। তাঁহার পথ প্রদর্শক

একমাত্র প্রবল ধর্ম্মানুরাগ তাঁহার উদ্‌ভ্রান্ত মনকে যথা ইচ্ছা লইয়া যাইতে লাগিল। তিনি পথে বাহির হইয়াছেন; কিন্তু দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য। অনাহারে সেদিন এইরূপ ভাবে কাটিয়া গেল। পরদিন একস্থানে আসিয়া একটু দুগ্ধ মাত্র পান করিলেন। পথ-বিপথ দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া অবিশ্রান্তভাবে তিন দিবস পথ হাঁটিয়া গড়ই নদীর নয়াপাড়ার ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘাটের মাঝি দ্বারিক পাটনী তাঁহাকে দেখিবামাত্র বলিয়া উঠিল, "বাবু, আপনার মুখের দিকে চাহিয়া আমার মনে হইতেছে, যেন আপনি কাহাকেও না বলিয়া কোথাও যাইতেছেন। আপনি এখানে বিশ্রাম করুন। আমি আপনাকে পার করিতে পারিব না। লোকে শেষে আমাকেই দোষী করিবে। আর এক কথা, বাবু, আপনি এই দেশে আস অবধি আমরা বড়ই সুখে আছি। আমার বিশ্বাস, আপনি [illegible] গেলে আমাদের ভাগ্য আবার পূর্ব্ববৎ দুঃখপূর্ণ হইবে—দেশ [illegible]কার হইবে। ইত্যাদি নানারূপ বলিয়া দ্বারিক মাঝি কাঁদিতে লাগিল। রাইচরণ বাবু অনেক রকম মিষ্টবাক্যে তাহাকে প্রবোধ দিয়া নিজ গাত্রবস্ত্র বহুমূল্য শালখানি তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, "বাবা! আবার আমি সত্বরই ফিরিয়া আসিব। তুই শীঘ্র আমায় পার করিয়া দে।" দ্বারিক মাঝি আর কথা কহিতে পারিল না। মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁহার আদেশ পালন করিল।

তিনি নদী পার হইয়া কোথায় যাইবেন, ভাবিতে লাগিলেন। প্রথমেই তাঁহার মনে হইল, ভবানীপুরে মা কালী দর্শন অগ্রে কর্ত্তব্য। মা যাহা আদেশ করিবেন, তাহাই করিব। মনে মনে এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া চলিতে চলিতে বগুড়া জেলার অন্তর্গত ভবানীপুর কালীবাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। মাকে দর্শন করিয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিলেন।

কালীমাতার সেবকগণকে এই পবিত্র স্থানের আমুল বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করায় তাঁহারা বলিলেন, "এটী নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণ রায় বাহাদুরের উপাসনাস্থান। তিনি এই মায়ের কাছে উপাসনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। এখন স্থানটী ছোট তরফের রাজার তত্ত্বাবধানে আছে। এখানে অতিথিসেবা রহিয়াছে। মা কালী পঞ্চমুণ্ডী আসনে উপবিষ্টা আছেন। সেবার কোনওরূপ বৈপরীত্য ঘটিলে এখনও মা তাহার প্রতিবিধান করিয়া থাকেন। ইহা শুনিয়া তিনি বড়ই আনন্দিত হইলেন এবং ঐ স্থানকে পুরশ্চরণ করিবার উপযুক্ত স্থান বলিয়া নির্ণয় করতঃ কিছুদিন ঐস্থানে রহিলেন।

সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে পুরশ্চরণ

দিনের পর দিন যায়, রাইচরণ বাবুর ব্যবহার এবং ধর্ম্মানুরাগ দেখিয়া সকলেই বিমুগ্ধ হইতে লাগিলেন। ইঁহার আকৃতি প্রকৃতি, বুদ্ধিবৃত্তি এবং কথাবার্ত্তায় কালীবাড়ীর কর্ম্মচারিগণ বুঝিলেন, ইনি বড়ঘরের লোক। মনে মনে এই ধারণা করিয়া সকলে তাঁহাকে বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। ক্রমে সূর্য্যগ্রহণকাল নিকটবর্ত্তী হইলে রাইচরণ বাবু সকলকে বলিলেন,—"আমার একান্ত অভিলাষ যে, আমি মায়ের নিকট মন্ত্র পুরশ্চরণ করি।" ইহা শুনিয়া সকলেই একবাক্যে বলিলেন, "ইহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। তবে পঞ্চমুণ্ডী-সিদ্ধ আসনে বসিতে হইলে অনেক বিপদের আশঙ্কা আছে; কারণ অনেক সাধুসন্ন্যাসী এ স্থানে আসিয়া ঐ আসনে বসিতে গিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছেন।" ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, "আমি ঐ সিদ্ধাসনে বসিতে ইচ্ছা করি না।" মায়ের নিকট যে কোন স্থানে বসিলেই হইবে।" তখন তাঁহারা বলিলেন,

"আপনার যে স্থানে ইচ্ছা হয় বসিবেন, আমরা সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিব।"

সূর্য্যগ্রহণের দিন রাইচরণ বাবু স্নান করিয়া আর্দ্রবস্ত্রে একটী নির্জ্জন স্থানে বসিয়া মন্ত্র পুরশ্চরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ণগ্রাস সূর্য্যগ্রহণের শুভ সময়ে সুচারুরূপেই পুরশ্চরণ কার্য্য চলিতে লাগিল। এই সময়ে হঠাৎ তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার শিবনেত্র, হস্ত করধরা, মুখে কথা নাই; কিন্তু হৃদয় আনন্দময়। সকলেই দেখিতেছেন, তাঁহার অঙ্গসকল কখনও পুলকিত হইতেছে, কখনও বা কম্পিত হইতেছে। সূর্য্যদেব যখন গ্রহমুক্ত হইয়া প্রখর কিরণজাল বিস্তার করিলেন, তখন সে তেজ সকলের অসহ্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। রাইচরণবাবুর দেহ হইতে তখন অতিশয় ঘর্ম্ম বাহির হইতেছিল। তাহা দেখিয়া সকলেই অবাক্! কেহ বলিতেছে, "ইহার শরীরের রক্ত জল হইয়া বাহির হইতেছে; বোধ হয় আর অধিক সময় বাঁচিবে না। কেহ বা বলিতেছে," "ইনি অতি স্থূলকায়, শরীরে মাংস নাই, কেবলই জল। সেই জলগুলি বাহির হইয়া যাইতেছে। বর্ণ একেবারে কালো হইয়া গিয়াছে।" কতক্ষণ পরে জনৈক ব্রাহ্মণ একটী পাত্রে কিছু দুধ লইয়া তাহাতে ন্যাকড়া ভিজাইয়া এক এক ফোঁটা তাঁহার মুখে দিতে লাগিলেন। প্রায় বিশ মিনিটে দুধটুকু সব গলধঃকরণ হইলে, ক্রমে রাইচরণবাবু একটু চৈতন্য লাভ করিলেন। কিন্তু তাঁহার উঠিবার সাধ্য নাই; তিন চারিজনে ধরাধরি করিয়া পার্শ্বস্থ একটী ব্রাহ্মণবাড়ীতে তাঁহাকে লইয়া গেলেন। ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী ও তাঁহার কন্যা সকলে মিলিয়া তাঁহার বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। দুইদিনের পর তিনি একটু সুস্থ হইলে ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বলিলেন, "বাবা, তোমার শরীরের অবস্থা যেরূপ হইয়াছে, তাহাতে দশ পনের দিন আমাদের

নিকট থাকিয়া সুস্থ না হইলে কোথাও যাওয়া উচিত নয়।" তখন তিনি বলিলেন, "বাবা! আমি কি করিব? মায়ের যেরূপ আদেশ হইয়াছে, আমাকে তাহা করিতেই হইবে।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "মা কি আদেশ করিয়াছেন, বাবা! আমি কি শুনিতে পারি?" রাইচরণবাবু বলিলেন, "আপনি আমার পিতৃতুল্য, আপনাকে বলিতে আমার কোনই আপত্তি নাই।" এই বলিয়া বলিতে লাগিলেন ঃ—

"কয়েকদিন পূর্ব্বে একদিবস রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখিলাম, মা আমাকে বলিতেছেন 'দেখ্, তুই আর ঘরে থাকিস্ না। ভবানীপুর যাইয়া আমার নিকট বসিয়া পুরশ্চরণ কর্, তোর মনোবাসনা পূর্ণ হইবে।' নিদ্রা ভঙ্গের পর আমি, কোন্ ভবানীপুর স্থির করিতে না পারিয়া বিশেষ চিন্তিত হইলাম এবং গৃহত্যাগের চেষ্টা করিতে লাগিলাম। ইত্যবসরে আমার গুরুদেব আসিলেন। তাঁহার নিকট পুরশ্চরণের বিধি নিয়ম বুঝিয়া লইলাম। তিনিও আমার হাত দেখিয়া বলিলেন,— "তোমার আর বেশীদিন সংসারভোগ করিতে হইবে না।" আমি তখন কেবল মায়ের কৃপার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। ক্রমে কৃপাময়ী মা করুণা করিয়া আমার সংসারবন্ধন মোচন করাইলেন। বাড়ী হইতে বাহিরে আসিয়াই ভাবিলাম, কোন্ ভবানীপুর যাই? কলিকাতা ভবানীপুর কি বগুড়া ভবানীপুর? ভাবিতে ভাবিতে মন এইদিকেই টানিল। এখানে আসিয়া মায়ের দর্শনে পরম শান্তিলাভ করিলাম। আজ কয়েকদিন পর্য্যন্ত মায়ের বাড়ীতেই মা আমাকে রাখিয়াছেন। গত পরশ্ব সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে পুরশ্চরণ করিতে আরম্ভ করিয়া—এই কথা বলিতে বলিতে রাইচরণ বাবুর কণ্ঠরোধ হইল। ব্রাহ্মণ তখন বলিলেন,—"বল বাবা, সঙ্কোচ করিবার কারণ নাই, আমি শুনিলে

কথনই তোমার ইষ্ট বই অনিষ্ট হইবে না।” তখন তিনি আবার বলিতে লাগিলেন,—“জপসংখ্যা পূর্ণ হইবার কিছুপূর্ব্বে দয়াময়ী মা (বলিতে বলিতে ঠিক বালকের ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিলেন। পুনরায় চিত্ত স্থির করিয়া গদগদকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন) আসিয়া আমার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, “যা, তোর সব সাধ পূর্ণ হইয়াছে, মনোমত গুরু সরযূতীরে পাইবি। তাঁহার নিকট হইতে তোর অভীষ্ট বস্তু লাভ হইবে।” আমি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলাম, “মা, আমি কিরূপে তাঁহাকে চিনিব?” তখন দয়াময়ী মা আবার বলিলেন, “আমি তাহাকেও বলিলাম। সে তোর জন্য সেখানে অপেক্ষা করিতেছে। তাহার আজানু-লম্বিত বাহুদ্বয়, আকর্ণবিস্তৃত নয়ন; গৌরবর্ণ পরমসুন্দর পুরুষ, চতুর্হস্ত পরিমিত দেহ, নাম যোগেন্দ্রনাথ গোস্বামী। পূর্ব্বে খড়দহে বাড়ী ছিল। গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া ‘শঙ্করারণ্য পুরী’ নামধারণ করিয়াছে। সে অতি বিরক্ত সন্ন্যাসী। একটিমাত্র শিষ্য করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, আর শিষ্য করিবে না। কিন্তু আমি তোর জন্য তাহাকে আদেশ করিলাম। তাহাকে সামান্য মানুষ বলিয়া মনে ভাবিস্ না। সে সাক্ষাৎ নিত্যানন্দ-অবতার।” এই বলিয়া মা অন্তর্হিতা হইলেন। আমি এই পর্য্যন্ত জানি। তৎপরে যে কিরূপে এখানে আসিলাম, তাহা মাই জানেন। আপনি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, আমার গুরুস্থানীয়, আমায় আশীর্ব্বাদ করুন, যাহাতে মা ব্রহ্মময়ীর আদেশানুযায়ী কার্য্য করিবার শক্তি পাই। ব্রাহ্মণ অতিশয় আনন্দ সহকারে রাইচরণ বাবুকে প্রেমালিঙ্গন দান করিলেন। এইরূপে সেদিন পরমানন্দে কাটিয়া গেল।

অযোধ্যায় গমন ও সিদ্ধ গুরুলাভ

পরদিবস প্রাতঃকালে উঠিয়াই রাইচরণ বাবু তথা হইতে রওয়ানা হইলেন। মনের গাঢ় অনুরাগে অতিশয় কষ্টকর পথও যেন তাঁহার পক্ষে সুখকর বোধ হইতে লাগিল। পথশ্রান্তি যে কাহাকে বলে, তাহা তিনি কিছুই অনুভব করিলেন না। পরমানন্দে দিবারাত্র পথ চলিতে চলিতে যথাকালে অযোধ্যায় আসিয়া পৌছিলেন। মনে মনে তিনি কত কি আলোচনা করিতেছেন; মনের আশা একবার গড়িতেছেন, একবার ভাঙ্গিতেছেন। কখন ভাবিতেছেন, "তিনি কি এ অধমকে চিনিতে পারিবেন? তিনি কি আমায় কৃপা করিবেন? মা বলিয়াছেন, তিনি একটীর অধিক শিষ্য করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। তিনি কি আমার জন্য নিজ প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিবেন? মা জগদম্বা যাঁহার এত গুণ বর্ণনা করিলেন, তিনি ত সামান্য সাধু নহেন। তিনি কি কৃপা করিয়া আমায় স্পর্শ করিবেন?" মনে মনে এইরূপ নানাপ্রকার জল্পনা কল্পনা করিতে করিতে সরযূতীরে উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, মা জগদম্বার বর্ণিত সেই মহাপুরুষ সরযূস্নান করিয়া একটী কাঠের কমণ্ডলু হাতে লইয়া বনের মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। রাইচরণবাবুকে দেখিবামাত্র তিনি সহাস্যবদনে বলিলেন, "বাবা, আমি তোমার জন্যই অপেক্ষা করিতেছিলাম, এস।" এই কথা বলিবামাত্র রাইচরণবাবু দ্রুতবেগে গিয়া মহাপুরুষের চরণতলে নিপতিত হইলেন। মহাপুরুষও কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহার মস্তকে চরণ অর্পণপূর্ব্বক হস্ত ধারণ করিয়া আশ্রমে লইয়া গেলেন।

আশ্রমটী সরযূনদীর উপকূলবর্ত্তী না হইলেও অধিক দূরবর্ত্তী নহে

অতি নির্জ্জন প্রদেশে অবস্থিত। চারিদিকে কয়েকটী বড় বড় বৃক্ষ। মধ্যস্থলে একখানি কুটীর। কুটীরের সম্মুখে একটি তুলসীমঞ্চ। একপাশে কয়েকটি ছোট ছোট ফুলের গাছ। আশ্রমটি এরূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যে, দেখিবামাত্র মন মুগ্ধ হয় এবং বিষ্ণুক্ষেত্র নৈমিষারণ্য বলিয়া বোধ হয়। মহাপুরুষ আশ্রমে উপস্থিত হইবামাত্র একটি শিশু অপর আর একটি কমণ্ডলু হইতে জল আনিয়া তাঁহার চরণ প্রক্ষালন করিয়া দিলেন। তিনি আর কিছু কথাবার্ত্তা না কহিয়া কুটিরের মধ্যে প্রবেশ করিলে শিষ্যটি কুটিরের সম্মুখে একটি আবরণ করিয়া দিলেন।

ইত্যবসরে রাইচরণ বাবু সেই মহাপুরুষের সেবক মহাত্মাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। তিনিও প্রতি নমস্কার করিয়া ইহাকে লইয়া অনতি-দূরবর্ত্তী একটি বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। সেবক বলিলেন, "আজ কয়েকদিন হইল, প্রভু আপনার কথা উল্লেখ করিয়া আপনার শারীরিক অসুস্থতার কথা বলিয়াছিলেন। এখন আপনি সুস্থ আছেন ত?" রাইচরণবাবু বলিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনাদের কৃপায় শরীর সুস্থ আছে। প্রভু আমার কথা কি বলিয়াছিলেন?" সেবক বলিলেন, "গত সূর্য্যগ্রহণ দিবস প্রভু ধ্যাননিমগ্ন ছিলেন। গ্রহণান্তে বলিয়া উঠিলেন, "কি ভাগ্যবান্! কি ভাগ্যবান্!" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "প্রভু, কাহার ভাগ্যের এত প্রশংসা করিতেছেন?' প্রভু একটু হাসিয়া বলিলেন, "কোনও একটি লোক গ্রহণ পুরশ্চরণ করিতেছিল, তাহার ইষ্টদেবী মা মহামায়া তাহার উপর প্রসন্না হইয়া তাহাকে দর্শন দিয়া অধমের নিকট আসিতে আজ্ঞা দিলেন এবং আমাকেও অনুগ্রহ ও নিগ্রহ উভয়ই করিলেন।" আমি বলিলাম, "আজ্ঞে অনুগ্রহ নিগ্রহ কি? আমি ত কিছুই বুঝিলাম না।" প্রভু বলিলেন, "কি আর বলিব! আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, আর শিষ্য করিব না। মা অনুগ্রহপূর্ব্বক দর্শন দিয়া আমায় কৃতার্থ

করিলেন বটে; কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিবার আদেশ করিলেন; কাজেই আমায় নিগ্রহ করা হইল। আহা মরি! করুণাময়ী মহামায় যাহাকে কৃপা করেন, তাহার জন্য তিনি কতই ব্যাকুলা! মা যোগমায় যাহার প্রতি অনুকুলা, তাহার সৌভাগ্যের সীমা নাই। এই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি দ্বারা জগতের বহুমঙ্গল সাধিত হইবে। ইহাকেই বলে "যোগমায়ার কৃপা-বলে লীলায় প্রবেশ।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "প্রভো! কতদিনে সেই ভাগ্যবান্ ব্যক্তি এখানে আসিবেন?" প্রভু উত্তর করিলেন, "অতি অল্পদিনের মধ্যেই আসিবে।" এই কথা শুনিয়া রাইচরণ বাবু প্রেমানন্দে আত্মহারা হইয়া অশ্রুগদগদ কণ্ঠে বলিলেন, "আহা! প্রভু কি পতিতপাবন! আমা হেন পতিত পামরকে তিনি কেশে ধরিয়া এখানে আনিলেন। ধন্য করুণা! ধন্য পতিতের প্রতি দয়া! দাদা, আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, যেন প্রভুর চরণে আশ্রয় পাইতে পারি।" এইরূপ নানা কথোপকথনে প্রায় দেড় ঘণ্টা কাল অতিবাহিত হইল।

তখন শিষ্যটী অতিশয় ব্যস্তভাবে কুটীরের নিকটে গেলেন। অনতিবিলম্বে কুটীরের মধ্য হইতে প্রভু আগন্তুককে জলদ-গম্ভীর স্বরে স্নান করিয়া আসিতে আদেশ করিলেন। শুনিবামাত্র রাইচরণবাবু আনন্দে বিভোর হইয়া অতি দ্রুতগতি সরযুনদীতে স্নান করিয়া আসিলে প্রভু শিষ্যের প্রতি আদেশ করিলেন, "উহাকে তিলক করিয়া দাও।" বলিবামাত্র শিষ্য পরমানন্দিতচিত্তে তাঁহাকে দ্বাদশ তিলকে বিভূষিত করিয়া দিলেন। তখন মহাপুরুষ বলিলেন, "মালার কি হইবে?" শিষ্য বলিলেন, "আজ্ঞে আপনার প্রদত্ত আপনার গলার তিনকণ্ঠী মালা আমার নিকট রহিয়াছে।" প্রভু একটু বিস্মিতভাবে কহিলেন, "আহা মরি! যোগমায়ার কি যোগাযোগ! নিতাইচাঁদ এই অধম কীটাণু-

কীটকে নিমিত্ত করিয়া ইহাকে কৃপা করিবেন ইচ্ছা করিয়াছেন। আমি কি করিব ? আচ্ছা সেই মালাই ইহার কণ্ঠে পরাইয়া দাও।” আদেশ পাইয়া শিষ্য প্রফুল্লচিত্তে সেই কণ্ঠী আনিয়া রাইচরণ বাবুর গলায় পরাইয়া দিলেন। গুরুদেব প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া নিমীলিত নেত্রে বসিয়া আছেন, তাঁহার দুইটী নয়ন হইতে অবিরতধারে অশ্রুবর্ষণ হইতেছে। উঁহারাও দুইজন কাঁদিয়া অধীর। কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! লীলাময়ের কি লীলা! পশু, পক্ষী, তরু, লতা, স্থাবর, জঙ্গম প্রভৃতিও যেন প্রেমানন্দে বিভোর। রাইচরণ বাবু কাঁদিতে কাঁদিতে অধৈর্য্য হইয়া একেবারে মহাপুরুষের চরণতলে নিপতিত হইলেন। সেই আর্ত্তি, সেই ক্রন্দনের রোল শুনিলে মানুষের হৃদয় ত দূরের কথা, পাষাণ পর্য্যন্তও দ্রব হইয়া যায়।

কিছুক্ষণ পরে মহাপুরুষ রাইচরণ বাবুকে তুলিয়া সম্মুখে উপবেশন করাইয়া প্রেমভরে কর্ণে মন্ত্র প্রদান করিলেন। মন্ত্রাত্মক বর্ণ এক একটী করিয়া যেমন কর্ণে প্রবেশ করিতেছে, আর যেন তাহারা শত শত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পুলকরূপে রোমকূপ ভেদ করতঃ বাহির হইতেছে। ক্ষণে ক্ষণে এরূপ অদ্ভুত কম্প হইতেছে যে, তাঁহাকে ধরিয়া রাখা মহাপুরুষের পক্ষে কষ্টকর হইয়া পড়িতেছে। মন্ত্র প্রদান করিয়া গুরুদেব শিষ্যকে বক্ষে ধারণপূর্ব্বক কাঁদিয়া আকুল হইলেন। অপূর্ব্ব দৃশ্য! গুরুশিষ্য কোলাকুলি করিয়া নয়নজলে বক্ষ ভাসাইলেন। উভয়ের অশ্রুজলে উভয়ে সিক্ত; উভয়ের কম্পে উভয় কম্পিত; উভয়েরই মুখে এক বুলি,—“অহো! আজ ধন্য হইলাম।” কিছুক্ষণ পরে গুরুদেব শিষ্যকে নিজ বক্ষ হইতে ধীরে ধীরে নামাইলেন। শিষ্যের দেহখানি কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ নিশ্চল, নিস্পন্দ। অপর শিষ্যটী উচ্চকণ্ঠে “হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম

রাম রাম হরে হরে॥" এই নাম গাহিতেছেন, আর প্রেমাশ্রুজলে তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে। বহুক্ষণ এইরূপ অবস্থায় থাকিয়া নবাগত শিষ্য কিঞ্চিৎ সংজ্ঞালাভ করিলে গুরুদেব তাঁহাকে উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীগুরুদেবের উপদেশ

গুরুদেব বলিলেন, "বাবা, স্থির হও, প্রাপ্ত বস্তু হৃদয়ে ধারণ কর। একাগ্রমনে নিতাইচাঁদকে ডাক, আনন্দ পাইবে।"

শিষ্য। প্রভো! আমি বৃথারসে মগ্ন হইয়া এতকাল কাটাইয়াছি। কিরূপে নিতাইচাঁদের কৃপা পাইব? যখন কৃপা করিয়া চরণে স্থান দিয়াছেন, তখন বিশেষভাবে পথ প্রদর্শন না করাইলে এ অন্ধের গতি কি হইবে বাবা?

গুরুদেব। নিন্দাশূন্যহৃদয়ে নম্রভাবে মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, স্থাবর, জঙ্গম সকলকে প্রণাম বন্দনা করিবে। জগতে দৃশ্যাদৃশ্য যাবতীয় পদার্থ কৃষ্ণের প্রকাশ জানিবে। নিজেকে তৃণলতা হইতেও নীচ মনে করিয়া সর্ব্বসাধারণ জীবকে উচ্চজ্ঞানে সম্মান করিবে। জীবে দয়া, নামে রুচি এবং বৈষ্ণবসেবাই প্রধান ধর্ম্ম মনে করিয়া আচরণ করিতে হইবে।

শিষ্য। প্রভো! মনে একটু সন্দেহ উপস্থিত হইল, অনুমতি করিলে দাস বলিতে পারে।

গুরুদেব। বাবা! স্বচ্ছন্দে—প্রাণ খুলিয়া বল। যে যে বিষয়ে সন্দেহ থাকে, আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে কুণ্ঠিত হইবার কোনও কারণ নাই।

শিষ্য। আজ্ঞে, আপনি আদেশ করিলেন যে, জগতের সর্ব্ব-সাধারণ বস্তু হইতে আপনাকে হীন মনে করিতে হইবে; আবার বলা হইল, জীবে দয়া। হীন হইয়া উত্তম বস্তুর প্রতি কিরূপে দয়া সম্ভবে, বুঝিতে পারিলাম না।

গুরুদেব। বেশ সুন্দর কথা। তবে শুন। সাধারণতঃ 'দয়া' শব্দে আমরা যাহা বুঝি, সেটী তুমি যাহা বলিয়াছ, "উত্তম না হইলে হয় না।" সে ঠিক্ কথা; তবে মহাপ্রভুর বাক্য সে উদ্দেশ্যে নহে; কারণ—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"
"জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণব-সেবন।
ইহা বই ধর্ম্ম নাই শুন সনাতন॥"

এই দুইটী বাক্যই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখের। কাজে কাজেই একমুখের দুইটী কথা; অর্থান্তর ঘটিলে দোষ পড়ে। এই জীবে দয়া—ধনীর অর্থাদিদান বা রাজার নিগ্রহানুগ্রহের ন্যায় নহে। এ দয়া পরদুঃখে কাতর হইয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা। পিতামাতা বা গুরুদেব পীড়িত বা বিপদ্‌গ্রস্ত হইলে সন্তান অথবা শিষ্য তাঁহাদের আরোগ্য লাভের জন্য ভগবানের নিকট যে প্রার্থনা করিয়া থাকে, তাহাতে কি সন্তান বা শিষ্যের নিজের প্রতি প্রাধান্য বুদ্ধি আসে? তোমাকে যদি কেহ একটী ভাল বস্তু দেয় এবং তুমি সেই বস্তু যদি তোমার গুরুবর্গকে কিঞ্চিৎ বণ্টন করিয়া দাও, তাহাতে কি তাঁহাদের গুরুত্বের হানি হইয়া তোমাতে গুরুত্ব বর্ত্তিবে? নিতাইচাঁদ কৃপা করিয়া যদি তোমাকে নাম, মন্ত্র বা নানাপ্রকার সদুপদেশ প্রদান করেন এবং তুমি যদি সেই সকল অপর কাহাকেও প্রদান কর, তবে তাহাতে কি তোমার দাতৃত্বজ্ঞান জন্মিবে? 'দান' শব্দের অর্থ নিজস্বত্ব ধ্বংসপূর্ব্বক

পরস্বত্ব উৎপত্তি। বল, এই নাম, মন্ত্র বা সদুপদেশদাতা তুমি হইলে কি? দানের দিন হইতে তোমার সেই নামমন্ত্রের স্বত্ব উঁচ্ছেদ হইল কি? আমার মতে ইহাকে 'দান' না বলিয়া 'গ্রহণ' বলাই উচিত। 'দয়া করা' না বলিয়া 'দয়া গ্রহণ করা' বলা প্রয়োজন। কারণ মনে কর, কোনও বিষয়ী ব্যক্তি বিষয়তাপে তাপিত হইয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইলেন। তুমি তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া ভগবান্‌কে জানাইলে বা তাঁহাকে দুটী সদুপদেশ দিলে। এই ভগবান্‌কে ডাকার বা ভগবৎ-আলোচনা করার প্রবর্ত্তক বা গুরু সেই বিষয়ী ব্যক্তি হইল না কি? সেই সময়ে যদি সেই তাপিত ব্যক্তি তোমার নিকট না আসিত, তবে তুমি ঐ সময় ঐরূপ সদালাপ বা ভগবানের নাম করিতে কি? এই দয়ার ক্রিয়া শারীরিক নহে, এটী মানসিক।x মনে কর, এক ব্যক্তি তোমার নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিবার জন্য আসিল। তুমি তাহাকে মন্ত্র প্রদান করিবামাত্র, সে তোমাকে মনপ্রাণ সমর্পণ করিল। তুমিই তাহার উপাস্যস্থানীয় হইয়া পড়িলে। সে সময়ে তোমার তাহাকে কি মনে করা উচিত?

শিষ্য। আজ্ঞে, কি আর মনে করিবে? সে শিষ্য, আর যিনি মন্ত্রদাতা, তিনি গুরু।

গুরুদেব। ভুল হইল, তোমার অন্তরের অবস্থাকে তুমি অনুসন্ধান করিয়া দেখ, তুমি শিষ্যের ধারণানুযায়ী পাত্র কি না। আমার মতে মন্ত্রপ্রদান মাত্র সে তোমার শিক্ষাগুরু হইল। গুরুনিষ্ঠা, গুরুবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস, গুরুতে সর্ব্বেশ্বরবুদ্ধি এবং গুরুসেবা এই সকল শিক্ষা দিবার জন্যই নিতাইচাঁদ শিষ্যরূপ ধারণ করিয়া তোমার নিকট আসিয়াছেন। এইরূপ কেবল শিষ্য বলিয়া নয়; হয়ত একজন তোমাকে সাধু বা মহাত্মা জ্ঞান করিয়া ভক্তি করিতে লাগিল। তখন তোমার স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য

যে, "আমি কোনও সাধুমহাত্মা দেখিলে আগেই তাঁহার দোষ অনুসন্ধান করিয়া থাকি, আর এ ব্যক্তি আমা হেন ঘোর অবিশ্বাসী বঞ্চক পাষণ্ডের প্রতিও সাধুবুদ্ধি করিতেছে। অতএব এই ব্যক্তিই ত প্রকৃত অদোষদরশী। এইত প্রকৃত সাধু, এইত আমার শিক্ষাগুরু। এইরূপে পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গাদিরও গুণ অনুসন্ধান করিয়া তাহাদের নিকট হইতে নিজের হীনতা প্রতিপন্ন করিতে হইবে। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন, 'তথাপি গুরুর ধর্ম্ম গৌরববর্জ্জিত।' এই বিচারশক্তি থাকার জন্যই মনুষ্য সর্ব্ব প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই জ্ঞান না থাকিলেই মনুষ্য পশুর মধ্যে গণ্য।"

শিষ্য। প্রভো, কৃতার্থ হইলাম। আর একটী সন্দেহ আছে। 'বৈষ্ণবসেবা' বলিলেন, এইটী আমি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না। কারণ বৈষ্ণবসেবায় অর্থাদির প্রয়োজন। কাজেই গৃহত্যাগীকে বৈষ্ণব-সেবা করিতে হইলে আবার ভিক্ষা করিতে হইবে।

গুরুদেব। বাবা, যে যে অবস্থার লোক, তাহাকে সেই অবস্থাতেই বৈষ্ণবসেবা করিতে হইবে। একটী ভিখারী বৈষ্ণব ভিক্ষালব্ধ বস্তু ভগবান্‌কে ভোগ দিয়া গ্রহণ করিবেন, এমন সময় অপর একজন ক্ষুধার্ত্ত বৈষ্ণব তথায় উপস্থিত হইলেন। তখন লব্ধ বস্তুর অর্দ্ধাংশ ক্ষুধার্ত্তকে দিয়া অপর অর্দ্ধাংশ গ্রহণ করা উচিত। পুনরায় কেহ আসিলে তদর্দ্ধ (এক চতুর্থাংশ) তাঁহাকে দিয়া অবশিষ্ট অংশ নিজে পাইবার বিধান আছে। আশ্রমত্যাগীর পক্ষে অনায়াসলব্ধ বিত্তদ্বারা বৈষ্ণবসেবা করণীয়। অভাবে সুমিষ্ট বাক্য, সুশীতল জল, তৃণাদি আসন পর্য্যন্ত ব্যবস্থা রহিয়াছে।

"তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থী চ সুনৃতা।
এতান্যপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন॥"

আর সেবা শব্দের অর্থ কেবল খাইতে দেওয়া নহে; পীড়িতের শুশ্রূষা, তৃষ্ণার্ত্তকে জলদান, অন্ধকে পথপ্রদর্শন, মৃতব্যক্তির সৎকার, তাপিতের তাপনিবারণ, অজ্ঞানীকে জ্ঞানদান প্রভৃতি সদনুষ্ঠানও সেবার অন্তর্ভুক্ত।

শিষ্য। আমার সকল সন্দেহ দূর হইল। অপর কর্ত্তব্য আদেশ করুন।

গুরুদেব। শাস্ত্র, শ্রীমূর্ত্তি, নাম, মন্ত্র, গুরু এবং বৈষ্ণব ইহাদিগকে একবস্তু জানিতে হইবে। কৃষ্ণে অর্পিত বস্তু মহাপ্রসাদ জ্ঞান করিয়া গ্রহণ করিবে। মহাপ্রসাদ স্পর্শদোষে নষ্ট হইতে পারে না। কায়মনোবাক্যে প্রাণিমাত্রে উদ্বেগ দিবে না। অবিচারে নিরপেক্ষভাবে নিজ ভক্তি যাজন করা প্রয়োজন। লোকাপেক্ষা করিলে প্রকৃত ধর্ম্ম যাজন হয় না। যথালাভে সন্তুষ্ট হইবে। মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া লোক ভুলাইবার চেষ্টা করিবে না। নামসংকীর্ত্তনই একমাত্র অবলম্বনীয় বস্তু। কলিকালে উচ্চ সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে কৃষ্ণ-আরাধনাই শাস্ত্রানুমোদিত পন্থা।

এইরূপ নানা কথোপকথন হইতে লাগিল। মহাপুরুষের সেবক ভিক্ষা করিয়া কিছু চাউল, আটা ইত্যাদি যাহা পাইয়াছিলেন, ইত্যবসরে তাহা রন্ধন করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। মহাপুরুষ মধ্যাহ্ন-স্নানে বাহির হইলেন। রাইচরণবাবুও পূর্ব্বোক্ত সেবকের আদেশক্রমে সেবার কিঞ্চিৎ আনুকূল্য করিতে লাগিলেন। বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় ভোগরাগ প্রস্তুত হইলে, মহাপুরুষ আসিয়া ইষ্টদেবকে ভোগ নিবেদন করিলেন। ক্ষণকাল পরে নির্দ্দিষ্ট সময়ে মহাপুরুষ একটী গাছতলায় একখানি কুশাসনের উপর উপবেশনপূর্ব্বক প্রসাদ পাইয়া পুনর্ব্বার কুটীরে প্রবেশ করিলেন। তৎপরে শিষ্যদুইটী পরমানন্দে অবশিষ্ট প্রসাদ পাইয়া স্নানাদি উপস্কার করতঃ গুরুদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন।

অপরাহ্নে মহাপুরুষ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিবার আদেশ করিলে, পূর্ব্বোক্ত সেবক যথারীতি শ্রীগ্রন্থ পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠারম্ভ হইল, আর মহাপুরুষের চোখের জলের কলও যেন উন্মুক্ত হইল। হরিনামের মালাটী লইয়া তিনি বসিয়া আছেন, আর দুইটী চোখে অবিরত ধারে অশ্রুধারা বহিয়া বক্ষস্থল ভাসিয়া যাইতেছে। মহাপুরুষের দুইটী গণ্ডদেশ হইতে বক্ষস্থল পর্য্যন্ত দুইটী জলধারার চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যাকাল উপস্থিত দেখিয়া সেবকটী গ্রন্থপাঠ বন্ধ করিলেন। তখন আরতি-কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। আরতি-কীর্ত্তন অন্তে নামসংকীর্ত্তন হইতে লাগিল।

মহাপুরুষের সম্বলের মধ্যে ছোট একজোড়া করতাল, একটী বটলুই জাতীয় ঘটী, দুই খানি কম্বল, দুইটী কাঠের কমণ্ডলু, ডোর কৌপীন ও বর্হিবাস, একখানি মনঃশিক্ষা, নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা এবং একখানি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

কীর্ত্তনানন্দে প্রায় রাত্রি এক প্রহর অতীত হইল। কীর্ত্তন সমাপ্ত করিয়া তিনি মালা লইয়া জপে বসিলেন।

নবশিষ্যের নব ভাবোদয়।

সাধারণতঃ তপোবনে ভজনানন্দী সাধুদিগের নিদ্রার সমাবেশ অতি অল্প। সকলেই ধ্যান, জপ প্রভৃতি স্ব স্ব আরাধনায় ব্যস্ত। নবাগত শিষ্যের পক্ষে আজ সকলই নূতন—সকলই মধুর—সকলই প্রেমময় বোধ হইতে লাগিল। প্রতি বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী—যাহার প্রতি দৃষ্টি নিপতিত হইতেছে, সেই তাঁহার মনপ্রাণ হরণ করিতেছে। প্রেমানন্দে অধীর হইয়া এক একবার তিনি "জয় নিত্যানন্দ রাম, জয় গৌর গুণধাম" বলিয়া নৃত্য করিতেছেন। ক্ষণে ক্ষণে আবার আশ্রমের পবিত্র

রজে গড়াগড়ি দিয়া যেন বহুকালের বিষয়-বিষধর-দংশনজ্বালা জুড়াইয়া পরম শান্তি-সাগরে সন্তরণ করিতেছেন। প্রেমানন্দে আত্মহারা হইয়া তিনি সর্ব্বভূতে ঈশ্বর দর্শন করিতেছেন। প্রেমময় শ্রীগুরুদেব নবাগত শিষ্যকে এতই অধিক পরিমাণে প্রেম-মদিরা পান করাইয়া দিয়াছেন যে, শিষ্য একেবারে উন্মত্ত হইয়াছেন! তাঁহার দিবারাত্রি জ্ঞান নাই। স্থাবর জঙ্গম যাহাকেই দেখিতেছেন, প্রেমে বিভোর হইয়া আলিঙ্গন করিতেছেন। কি মধুময় দৃশ্য! কি মধুর প্রেমময় ভাব! প্রেমময় নিতাইচাঁদের কি মধুর লীলা! আজ স্থির, ধীর, গম্ভীর রাইচরণ বাবুকে প্রেমে পাগল করিয়াছে। কখনও হাসি, কখনও কান্না, কখনও নৃত্য, কখনও প্রেমভরে অচৈতন্য অবস্থায় ভূমিতলে পড়িতেছেন, আবার উঠিতেছেন। এইভাবে সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে মহাপুরুষ সরযূ হইতে স্নান করিয়া আশ্রমে আগমন মাত্র শিষ্য দপ্রক্ষালন করিয়া দিলে তিনি কুটীয়ের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। শিষ্য মুখে আবরণ দিয়া স্নানাদি করিতে গেলেন। ইতিমধ্যে নব শিষ্য নাদি করিয়া আশ্রমে আসিয়া দেখেন যে, গুরুদেব কুটীরের মধ্যে ধ্যান-নিমগ্ন। তখন তাঁহার নিকট কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিবার অবকাশ পাইয়া তিনি নিঃশব্দে একটা বৃক্ষমূলে বসিয়া গুরুদত্ত মন্ত্র জপ রিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে পুরাতন শিষ্যটী আশ্রমে আসিলে তিনি াহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদা! আমার তিলক করিবার কি হইবে?" বক বলিলেন, "কেন আপনি নিজে করিতে পারিবেন না কি?"

নব শিষ্য বলিলেন, "আজ্ঞে আমি করিতে পারিব বটে; কিন্তু কি দিয়া রিব, আমি ত কিছুই জানি না।" তখন তিনি ইহাকে তাঁহার নিজের লক মাটী এবং দর্পণাদি দিলেন। ইনিও নিজহস্তে দ্বাদশ তিলক করিয়া নিজমুখ দেখিতে দেখিতে চোখের জলে বক্ষ ভাসাইতে লাগিলেন।

ক্রমে মহাপুরুষের দ্বার উন্মুক্ত হইল। শিষ্যদ্বয় তখন দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন।, শ্রীগুরুদেব পাঠ করিতে আদেশ করায় প্রথম শিষ্য প্রথমে নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা পরে প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা ও মনঃশিক্ষা পাঠ করিতে লাগিলেন গুরুশিষ্য উভয়েই প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া পড়িলেন। উভয়েরই গদ গদ কণ্ঠ, নয়নে অবিরল জলধারা। সময়ে সময়ে পাঠ বন্ধ হইয়া যাইতেছে। নবাগত শিষ্য একটু দূরে বসিয়া পাঠ শুনিতেছেন, আর ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছেন। তাঁহারও নয়নজলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে

শ্রীশ্রীগুরুদেবের নিকট আদেশপ্রাপ্তি

পাঠ শেষ হইলে গুরুদেব আদেশ করিলেন, "দেখ বাবা, আর এখানে তোমার বেশীদিন থাকিবার প্রয়োজন নাই। প্রাপ্ত বস্তু হৃদয়ে ধারণ করিয়া তুমি দেশে দেশে, নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে নামসংকীর্ত্তন করিয়া বেড়াও।"

নবশিষ্য। প্রভো! আমার মনে বড়ই সাধ যে, আপনার শ্রীচরণ প্রান্তে থাকিয়া চরণসেবা করি।

গুরুদেব। বাবা! সেবা অর্থ সুখ দেওয়া। আমার কাছে থাকিয়া আমার সেবা করিলে আমি যত সুখী হইব, জগতে নামপ্রচার করিয়া নিতাইচাঁদের আদেশ প্রতিপালন করিলে আমি তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে সুখলাভ করিব। যদি এ অধমের প্রতি তোমার গুরুবুদ্ধি হইয়া থাকে তবে গুরু-আজ্ঞা পালন করাই ত তোমার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিষয়ে আর কোনও আপত্তি না করিয়া নিতাইচাঁদের আদেশ প্রতিপালন করতঃ আমায় কৃতার্থ কর।

শিষ্য। প্রভো! আমি ত সর্ব্ববিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। কিরূপ ভাবে আমাকে চলিতে হইবে আদেশ করুন এবং উপদেশ দিন।

গুরুদেব। কল্য যেরূপ উপদেশ দিয়াছি, সেইরূপ আচরণ করিবে। কাহারও নিকট হইতে কোনও প্রকার বন্ধানী বা বৃত্তি গ্রহণ করিবে না। বিষয়ীর অন্নদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে না। অযাচিত ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনে জীবনধারণ করিবে। ভগবান্‌কে নিবেদন না করিয়া কোনও বস্তু গ্রহণ করিবে না। সর্ব্বদা সৎসঙ্গে বাস করিবে।

শিষ্য। বাবা! সদসৎসঙ্গ কিরূপে বুঝিব?

গুরুদেব। জগতের যাবতীয় পদার্থকে সৎজ্ঞান করিয়া কেবল আপনাকে অসৎ মনে করিতে হইবে। তবে সঙ্গ করিতে হইলে স্বজাতীয় সাধুর সঙ্গ করাই উচিত। অর্থাৎ যিনি নিজগুরূপদিষ্ট পন্থানুযায়ী বিশুদ্ধ সদাচারী হইবেন, তিনি গৃহস্থই হউন, আর উদাসীনই হউন, তাঁহারই সঙ্গ করা বিধেয়। অপর সকলকে সাধু বুদ্ধি করিয়া দণ্ডবৎ প্রণতি ও ভক্তি করিবে। যতদিন উক্তরূপ সঙ্গ না পাওয়া যায়, ততদিন সদ্‌গ্রন্থপাঠ, নাম এবং শ্রীমূর্ত্তির সঙ্গ করিবে।

শিষ্য। কি কি গ্রন্থ আমাদের বিশেষভাবে আলোচ্য ও অবলম্বনীয়?

গুরুদেব। আদিপুরুষ গোবিন্দ, আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রেরণা করিয়া বেদসৃষ্টি করেন। ক্রমে উহা উপনিষদ্‌, ষড়্‌দর্শন, অষ্টাদশ পুরাণ, তন্ত্র, সংহিতা, উপপুরাণাদিরূপে বিস্তার প্রাপ্ত হইল। আবার ব্রহ্মা দেখিলেন, শাস্ত্রবিধি অত্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছে। কলিহত জীবের পক্ষে তাহা পালন করা এবং তাহার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করা অতিশয় কঠিন হইবে। তজ্জন্য তিনি কৃপা করিয়া পুনরায় যাবতীয় শাস্ত্রতত্ত্ব চতুঃশ্লোকে প্রকাশ করিয়া দেবর্ষি নারদকে এই চতুঃশ্লোকী শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন

করাইলেন। দেবর্ষি নারদ কৃপা করিয়া পুনরায় সেই সর্ব্বশাস্ত্রসার চতুঃশ্লোক সরলভাষায় শতশ্লোকে বিবৃত করিয়া ব্যাসদেবকে উপদেশ করিলেন। ব্যাসদেব নারদোক্ত সেই শতশ্লোক হইতে অষ্টাদশ সহস্র-শ্লোকাত্মক শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেম।' পূজ্যপাদ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী সেই পরম উপাদেয় গ্রন্থরাজ শ্রীমদ্ভাগবত মন্থন করিয়া শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন। অতএব সাধনক্ষেত্রে সর্ব্বশাস্ত্রের সার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থই একমাত্র আশ্রয় ও সম্বল; কিন্তু সর্ব্বসাধারণকে বৈষ্ণবীয় উপাসনাতত্ত্ব সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিবার জন্যই শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা ও প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা এই শ্রীগ্রন্থদ্বয়ের আবির্ভাব হইয়াছে। আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল, ক্ষীণজীবী, অন্নগতপ্রাণ, অল্পায়ু এবং বিষয়বাসনামুগ্ধ কলির জীবের বিপুল শাস্ত্রগ্রন্থ পড়িবার বা শুনিবার সময় কোথায় বাবা! অতএব সর্ব্বশাস্ত্রের সার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা ও প্রেম-ভক্তিচন্দ্রিকা এবং শ্রীপ্রেমানন্দ দাস ঠাকুরের মনঃশিক্ষা পাঠ করিবে।

শিষ্য। প্রভো! পাঠ করিতে করিতে গ্রন্থের কোন স্থানের প্রকৃত অর্থ এবং উপদেশের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিলে তখন কি উপায় করিব? দেখিতে পাই, নানা জনে শাস্ত্রের নানা প্রকার অর্থ করেন। কোন্‌টী প্রকৃত অর্থ কি করিয়া বুঝিব?

গুরুদেব। শ্রীগ্রন্থ পাঠ করিবার পূর্ব্বে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য শ্রীমন্মহা-প্রভুর শ্রীচরণ এবং পূজ্যপাদ গ্রন্থকর্ত্তাকে ভক্তিপূর্ব্বক স্মরণ করিয়া শ্রীগ্রন্থ পাঠ করিতে আরম্ভ করিবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং তোমার হৃদয়ে উদিত হইয়া শাস্ত্রার্থ বুঝাইয়া সকল সংশয় দূর করিয়া দিবেন।

এইরূপ উপদেশ দিয়া মহাপুরুষ মধ্যাহ্নকৃত্য করিতে গেলেন। অপর

শিষ্যটী ভিক্ষায় যাইবেন, এই সময় রাইচরণ বাবু তাঁহাকে বলিলেন, "দাদা! অনুমতি হয় ত আমিও আপনার সঙ্গে যাই, আমার বড়ই ইচ্ছা হইতেছে।" তিনি সস্নেহে বলিলেন, "না ভাই, তুমি আশ্রমে থাক, বড়ই রৌদ্র, তোমার কষ্ট হইবে।" নবশিষ্যের হৃদয় তখন নবানুরাগে পরিপূর্ণ। তিনি কিছুতেই বাধা মানিলেন না। উভয়ে একসঙ্গে নাম করিতে করিতে ভিক্ষায় বাহির হইলেন এবং প্রয়োজনমত ভিক্ষা সংগ্রহ হইবামাত্র তাঁহারা আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। আসিবার সময় দুই একজন ভিক্ষা দিতে আসিলে, তাঁহারা বলিলেন, "বাবা! আজ আমাদের প্রয়োজনমত ভিক্ষাসংগ্রহ হইয়া গিয়াছে; অন্যদিন দিবেন।"

আশ্রমে আসিয়া উভয়েই ভোগের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় ঠাকুরের ভোগ প্রস্তুত হইল। গুরুদেব ঠাকুরের ভোগ দিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিলে, উভয় শিষ্য তাঁহার অধরামৃত গ্রহণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইলেন। পরে স্নানাদি উপস্কার করিয়া পূর্ব্ববৎ মহাপুরুষের আদেশে যথারীতি গ্রন্থপাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। সায়ংকাল পর্য্যন্ত পাঠ হইল। তৎপরে আরতিকীর্ত্তন ও নামসংকীর্ত্তনে রাত্রি অনুমান এক প্রহরের অধিক গত হইলে মহাপুরুষ মালাজপ করিতে বসিলেন। রাইচরণ বাবু মালা জপের কথা জিজ্ঞাসা করায় গুরুদেব বলিলেন, "তুমি শ্রীনবদ্বীপ ধামে যাও; সময়মত শ্রীমন্মহাপ্রভু তোমাকে জপের মালা মিলাইয়া দিবেন। বাজার হইতে মালা কিনিবার কোন দরকার নাই। কেহ যাচিয়া যখন তোমাকে মালা দিবেন, তখন জপ করিও। উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিও; ইহাতে জপ হইতেও অধিক ফললাভ হইবে।

জপতো হরিনামানি যৎ ফলং ভুবি বিশ্রুতং।
উচ্চৈঃ সংকীর্ত্তনাদেব তস্মাচ্ছতগুণং ভবেৎ॥ ভৃগুসংহিতা।

এ বিষয়ে বহু বহু শাস্ত্র-প্রমাণ রহিয়াছে। আচরণ করিলেই প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারিবে। এইরূপ কথোপকথনে পরমানন্দে সে রাত্রি কাটিয়া গেল।

শ্রীশ্রীগুরুদেবের আজ্ঞায় তীর্থপর্য্যটন

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া শ্রীগুরুদেব তাঁহার নবশিষ্যকে আদেশ করিলেন, "বাবা, সরযূস্নান করিয়া অযোধ্যায় যে সকল শ্রীবিগ্রহাদি আছেন, সে সমস্ত দর্শন করিয়া একদিন কোন ঠাকুরবাড়ীতে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করতঃ কাশী, গয়া, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থ পর্য্যটন-পূর্ব্বক শ্রীধাম নবদ্বীপে যাইবে। কিছুদিন তথায় থাকিয়া নীলাচলে গমন করিবে। সম্প্রতি আর আমার সঙ্গে দেখা হইবে না। নিতাইচাঁদ এই কার্য্যে তোমার সহায় হইবেন। প্রভুর ইচ্ছা হইলে পুনর্ব্বার আমার সঙ্গে দেখা হইবে।"

নবশিষ্য কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে প্রণাম করিলে তিনি যথোচিত আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক শক্তি সঞ্চার করিয়া দিলেন। তখন শিষ্য প্রেমভরে উন্মত্তের ন্যায় টলিতে টলিতে জ্যেষ্ঠ গুরুভাইকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। তিনিও প্রসন্নচিত্তে প্রেমালিঙ্গনপূর্ব্বক "গুরু-আজ্ঞা সর্ব্বথা পালনীয়া" এই বলিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

শ্রীগুরুদেবের আদেশে রাইচরণ বাবু অযোধ্যায় ঠাকুর দর্শন করিতে গমন করিলেন। হঠাৎ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া একজন বলিল, "এ সাধু, হিঁয়া প্রসাদ পায়কে যাওগে।" রাইচরণ বাবু অতিবিস্মিত-ভাবে বলিয়া উঠিলেন' "কৃপাময় গুরুদেবের কৃপার বলিহারি যাই। তিনি আমাকে ঠাকুরবাড়ীতে প্রসাদ পাইতে আদেশ করিয়া

সঙ্গে সঙ্গে ইহার হৃদয়ে এই সম্বন্ধে প্রেরণা করিয়াছেন। ধন্য করুণা !”

সেদিন সেই ঠাকুরবাড়ীতেই প্রসাদ পাইয়া শ্রীগুরুদেবের আদেশ অনুসারে তীর্থভ্রমণে বাহির হইলেন। কিন্তু সর্ব্বদাই যেন উন্মত্তের ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তীর্থদর্শন করিতে হয় করিতেছেন, কেহ কিছু আগ্রহ করিয়া খাইতে দিল ত খাইলেন, কিন্তু কি দেখিলেন বা কি খাইলেন, জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে পারিবেন কি না সন্দেহ। নয়ন দুইটি সর্ব্বদা প্রেমে ঢুলু ঢুলু, অনুরাগভরে রক্তবর্ণ, সুন্দর সদানন্দ মুখখানি দেখিলে বোধ হয়, তিনি যেন এরাজ্যে নাই, কথাবার্ত্তা সকলই অসংলগ্ন। মনের ভাব প্রকাশ নাই, দেহানুসন্ধানও নাই। অনবরত পথ চলিতেছেন, কিন্তু বাহ্যজ্ঞানরহিত। এইভাবে নানাতীর্থ ভ্রমণপূর্ব্বক শ্রীবৃন্দাবন ধামে আসিয়া পৌছিলেন। এই প্রেমধামে আসিয়া তাঁহার চিত্তের কথঞ্চিৎ স্থিরতা হইল। শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া তিনি সর্ব্বপ্রথমেই একখানি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, একখানি মনঃশিক্ষা ও একখানি ভক্তিতত্ত্বসার সংগ্রহ করিয়া প্রতিদিন অন্তত কিছুক্ষণ এই সকল শ্রীগ্রন্থপাঠের ব্যবস্থা করিলেন। এইভাবে কিছুদিন গত হইলে হঠাৎ একদিন শ্রীধাম নবদ্বীপের নিমিত্ত তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি আর শ্রীধাম বৃন্দাবনে থাকিতে পারিলেন না; শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্র তাঁহাকে আকর্ষণ করিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি শ্রীধাম নবদ্বীপ উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। প্রেমানন্দে তাঁহার দিগ্বিদিক্ জ্ঞান নাই। এক একটী দিন তাঁহার পক্ষে যেন এক একটী যুগ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ভগবৎ-আকর্ষণের কি অদ্ভুত শক্তি! অনুরাগের আধিক্যে সুদূর পথও নিকট হয়, এই কারণেই যেন অতি শীঘ্রই রাইচরণ বাবু শ্রীধামে আসিয়া পৌছিলেন।

শ্রীধাম নবদ্বীপে রাজেন বাবু

শ্রীশ্রীগুরুদেব রাইচরণ বাবুর হৃদয়ে যে কি ভাব জাগাইলেন, অন্তরে যে কি সুধা ঢালিলেন, তাহা তিনিই জানেন। রাইচরণ বাবু শ্রীধাম নবদ্বীপে উপস্থিত হইয়া শ্রীবাস অঙ্গনের ঘাটে গঙ্গাস্নান করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্থলী পুণ্যতোয়া সুরধুনী দর্শনে তাঁহার মনে আজ ভাব-সমুদ্রের শত শত তরঙ্গ উঠিতেছে। তিনি প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া গঙ্গাতীরে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে শ্রীজগদানন্দ দাস নামক একমূর্ত্তি বাবাজী আগ্রহসহকারে তাঁহাকে শ্রীবাস অঙ্গনের পাড়ায় মণিপুর রোডের উপরিস্থিত নিজবাটিতে লইয়া গেলেন এবং একখানি ছোটঘরে তাঁহার থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

রাইচরণ বাবু গুরুদেবের কৃপাবলে এক্ষণে অতিশয় স্থিরপ্রকৃতি ও গম্ভীর। তিনি কাহারও সহিত কথাবার্ত্তা কহেন না। তিনবার গঙ্গাস্নান করেন এবং বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় স্বহস্তে হবিষ্যান্ন রন্ধন করিয়া ঠাকুরের ভোগ দিয়া প্রসাদ পান। প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া দিবারাত্রি নামকীর্ত্তন করেন। শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্যলীলাস্থলী শ্রীধাম নবদ্বীপের নিত্য নব নব শোভাসন্দর্শনে ভাবাবেশে কাঁদিয়া আকুল হন। এইভাবে তাঁহার দিন যাইতে লাগিল।

জগদানন্দ দাস বাবাজী মহাশয়, ইঁহাকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, তোমার নাম কি ?" উত্তরে রাইচরণ বাবু করযোড়ে বলিলেন, "আজ্ঞে আপনাদের দাসানুদাস রাইচরণ দাস।" উদারচেতা বাবাজী মহাশয় একটু অন্যমনস্ক থাকায় 'রাইচরণ' শুনিতে 'রাজেন' শুনিলেন। সেই অবধি তিনি রাইচরণ বাবুকে 'রাজেন বাবু' বলিয়াই ডাকিতে

লাগিলেন। রাইচরণ বাবুও ইহাতে কোনও আপত্তি করিলেন না। কিন্তু মনে মনে ভাবিলেন, "আহা মরি মরি! মা যোগমায়ার কি অপূর্ব্ব যোগাযোগ! সূর্য্যগ্রহণোপলক্ষে দেহের অবস্থা কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন জন্য পূর্ব্বপরিচিত লোকেও এক্ষণে আমাকে চিনিতেছে না; তদুপরি দৈবক্রমে এইরূপ নামপরিবর্ত্তন যেন আমার পক্ষে আরও অনুকূল বলিয়া বোধ হইতেছে। মা যোগমায়ার কৃপাবলে এবং শ্রীশ্রীগুরুদেবের অনুগ্রহে যখন যাহা হয়, তাহা মঙ্গলের জন্যই হইয়া থাকে। এই হইতে তিনি শ্রীধাম নবদ্বীপে 'রাজেন বাবু' বলিয়াই পরিচিত হইলেন। আমরাও এখন হইতে ইঁহাকে **'রাজেন বাবু'** বলিয়াই পরিচয় দিব।

রাইচরণ বাবু এখন রাজেন বাবু হইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তিনি প্রায়ই গৃহ হইতে বাহির হন না। প্রসাদ গ্রহণানন্তর একবার গঙ্গাতীরে যাইয়া হাত মুখ ধুইয়া পুনরায় গৃহে প্রবেশ করেন। তাঁহার বাসগৃহখানি অতি সামান্য। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিও অতি অল্প। শ্রীগ্রন্থরূপী ভগবান্ তাঁহার গৃহে বিরাজ করিতেছেন। যেমন শ্রীগ্রন্থ সম্মুখে করিয়া তিনি গদগদ কণ্ঠে পাঠারম্ভ করিতেছেন, অমনি অনুরাগভরা রক্তবর্ণ নয়নদ্বয় হইতে প্রেমাশ্রুধারা বিগলিত হইতেছে। শ্রীগ্রন্থের এক একটি পয়ার পাঠ করিতেছেন, আর নয়নধারায় বক্ষস্থল ভাসিয়া যাইতেছে। আহা মরি! সর্ব্বশরীরে যেন প্রেমের তরঙ্গরাজি বাহিয়া যাইতেছে! পথের উপরেই তাঁহার ঘর। পথ দিয়া কত লোক যাইতেছে। অনেকে দাঁড়াইয়া পাঠ শুনিতেছে আর তাহাদের প্রাণ যেন গলিয়া যাইতেছে। কেহ কেহ উঁকি মারিয়া দেখিতেছে। "ভিন্নরুচির্হি লোকঃ।" কেহ বলিতেছে, "আহা মরি, ইহার দেহখানি যেন প্রেমে গড়া! কণ্ঠস্বর কি মধুর!! কি সুন্দর রূপ!!! বোধ হয়, কোন বড়লোকের ছেলে, বাপ ভাইয়ের সঙ্গে রাগারাগি করিয়া

আসিয়াছে।” কেহ বলিতেছে, “বোধ হয় ইহার স্ত্রী মারা গিয়াছে। তাই এত বৈরাগ্য।” এইরূপে তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থা সকলে নিজ নিজ ভাবে সমালোচনা করিতে লাগিলেন। তিনি কিন্তু প্রেমানন্দে বিভোর। কখনও প্রাণ খুলিয়া হো হো করিয়া হাসিতেছেন, আবার কখনও বা বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছেন। কে কি বলিতেছে, কোন কথায় তাঁহার কর্ণপাত নাই; কোন দিকে তাঁহার লক্ষ্য নাই। এই ভাবে তিনি দিন কাটাইতে লাগিলেন। তাঁহার বিচিত্র স্বভাব! মুখপানে চাহিলেই বোধ হইত যেন সর্ব্বদা কি ভাবিতেছেন; কি যেন প্রাণের জিনিষ হারাইয়া খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। চক্ষু দুইটী প্রেমে ঢুলু ঢুলু—ঈষৎ রক্তবর্ণ। এক একবার কি যেন বলিতে চাহিতেছেন; কিন্তু ব্যথার ব্যথী না পাইয়া অন্তরের ভাব অন্তরেই চাপিয়া রাখিতেছেন। এইরূপ অকথনব্যাধিগ্রস্ত হইয়া নবদ্বীপবাস করিতে লাগিলেন।

নবদ্বীপ বাবুর সহিত মিলন

এইরূপে কিছুদিন কাটিয়া গেল। এই সময়ে রাজেন বাবুর বাসার নিকটবর্ত্তী শ্রীনৃসিংহদেবের আখড়ায় একটী যুবা পুরুষ, দেশস্থ কয়েকজন লোক সঙ্গে সস্ত্রীক শ্রীধাম নবদ্বীপ দর্শনে আসিলেন। এই নবাগত যুবকের নাম **শ্রীনবদ্বীপ দাস**। তিনি শ্রীধাম আসিবার দুই তিন দিন পরে একটী বৈষ্ণবী নবদ্বীপ বাবুকে একটী সুসমাচার দিলেন। তিনি বলিলেন, “বাবা, ঐ বাড়ীতে একটী বাবু আসিয়াছেন, তিনি কাহারও সহিত কথা কহেন না বা কাহারও বাড়ীতে যান না, সর্ব্বদা একখানি গ্রন্থপাঠ করেন, আর দিবানিশি অঝোর নয়নে ঝুরেন। তুমি যদি তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা কর ত চল।” নবদ্বীপ দাস ভক্তিমান্ নবীন যুবক ও অনুরাগী ভক্ত। তিনি ইহা শুনিয়া উৎসাহের সহিত বলিলেন,

"মা, অনুগ্রহপূর্ব্বক একবার তাঁহাকে দেখাইয়া আমাকে চিরদিনের জন্য কিনিয়া রাখুন। সেই মহাপুরুষকে দর্শন করিবার জন্য আমার মন বড়ই ব্যাকুল হইতেছে শীঘ্র চলুন।' মাতাজী তৎক্ষণাৎ আনন্দিতচিত্তে তাঁহাকে ঐ বাড়ীটী দেখাইয়া দিলেন।

নবদ্বীপ দাস সেখানে যাইবামাত্রই আনন্দে বিহ্বল হইলেন। নবানুরাগের জ্বলন্ত চিত্র সেই মহাপুরুষকে দেখিবামাত্র চিরপরিচিত বন্ধুর ন্যায় দুইজনে প্রেমানন্দে আত্মহারা হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। উভয়ের হৃদয়ে আনন্দ আর ধরে না। উভয়ের নয়নদ্বয়ে প্রেমাশ্রুর উৎস ছুটিল। গাঢ় প্রেমালিঙ্গনে উভয়েই বদ্ধ হইলেন। প্রেমানন্দে উন্মত্ত হইয়া উভয়েই ভূমিতলে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। এক একবার ভূমিতে পড়িতেছেন, আবার "জয় নিতাই" বলিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেছেন। পরম গম্ভীর রাজেন বাবু আজ চপল-চূড়ামণি। গৃহমধ্যে তিনি আজ যে কিরূপ প্রেমবিহ্বলভাবে পরমানন্দে মগ্ন, কিরূপ দেহানুসন্ধানশূন্য, তাহা নবদ্বীপ বাবু ভিন্ন অন্য কেহই জানিতে পারিতেছেন না। কতক্ষণ পরে হাতে তালি দিয়া উভয়ে কীর্ত্তন করিতে করিতে আলুথালুবেশে পথে বাহির হইলেন—

"ভজ গ�ৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে।
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সেই আমার প্রাণ রে॥

এই ধুয়া ধরিয়া প্রেমানন্দে নাচিতে নাচিতে উভয়ে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু দর্শনে ছুটিলেন। বেলা দুইপ্রহর অতীত হইলে তাঁহারা পরিক্রমা করিয়া পরিশ্রান্তভাবে ধূলিধূসরিত অঙ্গে বাসায় ফিরিলেন। স্নানান্তে রাজেন বাবু স্বহস্তে রন্ধন করিয়া ঠাকুরের ভোগ দিয়া প্রসাদ পাইলেন ও নবদ্বীপ বাবুকে প্রসাদ দিলেন। তারপর আবার দুইজনেই শ্রীচন্দ্র লইয়া পাঠে বসিলেন। পাঠারম্ভমাত্রেই উভয়ের হৃদয়ে প্রেমের তরঙ্গ ছুটিল।

উভয়ের অঙ্গে অশ্রুকম্পপুলকের উদ্গম হইল। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এক একটী পয়ার পাঠকালীন উভয়ে উভয়ের মুখপানে চাহিয়া প্রেমানন্দে কাঁদিয়া আকুল হইতে লাগিলেন। কখন বা হাসিতে হাসিতে ইনি উঁহার গায়ে ঢলিয়া পড়িতে লাগিলেন। গৃহে হাসি কান্নার প্রবাহ ছুটিল। উভয়ের এক প্রাণ; ভিন্ন ভিন্ন দেহ মাত্র। কি অপূর্ব্ব মিলন! কি শুভ দর্শন! একদিনের পরিচয়েই উভয়ে উভয়ের চিরজীবনের মত বন্ধু হইলেন।

এইরূপ পরমানন্দে সেদিন কাটিয়া গেল। প্রেমিকের আচরণ বা কার্য্যকলাপ সাধারণ বিচারের মাপ কাঠিতে পরিমাণ করা সুকঠিন। কয়েকদিন যায়, একদিন প্রাতঃকালে হঠাৎ নবদ্বীপবাবু বহুমূল্য এক-জোড়া জুতা, খুব ভাল সোণার বোতাম সহ একটী জামা ও ভাল একখানি কালাপেড়ে ধুতি হাতে করিয়া রাজেন বাবুর নিকট আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"দাদা! আজ আপনাকে একবার বাবু সাজে সাজাইতে আমার বড়ই অভিলাষ জন্মিয়াছে। আপনাকে এই জিনিষগুলি অঙ্গীকার করিতেই হইবে।" জানি না কি ভাবিয়া অমন কঠোর বৈরাগী হাসিমুখে প্রীতির উপহার হাতে লইলেন। না জানি কাহার ভোগলালসা মিটাইবার মানসে ছলছল নেত্রদুইটী মুদ্রিত করিয়া উপহারগুলি কাহাকে সমর্পণ করতঃ নিজে পরিলেন। নবদ্বীপ বাবুকেও ঐরূপ ভাবে সাজাইয়া উভয়ে দর্শনে বাহির হইলেন। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! কাল যাহাদিগকে লোকে ধূলিধূসরিত ভাবে রাস্তায় গড়াগড়ি দিতে দেখিয়াছে, আজ তাহারা ঘোর বাবু, কিন্তু সাজিলে কি হইবে, ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় অনুরাগের প্রাণ আবরণ রাখে না—প্রেমের বন্যা বাঁধ মানে না। শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন করিবামাত্রই উভয়ে উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন। হাতে তালি দিয়া নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে

এক একবার বিভোর ভাবে রজে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। চোখের জলে জামা-জোড়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল। সকলে দেখিয়া অবাক্! কিছুক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করতঃ উভয়ে বাসায় ফিরিয়া পূর্ব্ববৎ নিত্যকৃত্য করিতে লাগিলেন।*

একদিন রাত্রিতে নবদ্বীপ বাবু গৃহে আসিয়া স্ত্রীকে বলিলেন, "তুমি সঙ্গীদিগের সহিত দেশে চলিয়া যাও, আমি আর বাড়ী যাইব না।" তাঁহার মুখে অকস্মাৎ এই কথা শুনিয়া তিনি অবাক্ হইয়া বলিলেন, হাতে এত বড় চাক্‌রী, এত বড় সম্মান; কাহাকেও কিছু বলা নাই, কহা নাই, এ কি কথা বলেন? সকলে মিলিয়া নবদ্বীপ বাবুকে বিশেষ অনুরোধ করায় তিনি সম্পূর্ণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও অগত্যা রাজেন বাবুর নিকট এক সপ্তাহের বিদায় লইয়া দেশে চলিলেন। কিন্তু তাঁহার মন-প্রাণ সকলই রাজেন বাবুর নিকট পড়িয়া রহিল। বিদায়কালীন করুণ দৃশ্য কেহ দেখিল না। নবদ্বীপ বাবু এই বিষম কার্য্যটী গোপনে সমাধা করিলেন।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু-দর্শন ও কীর্ত্তন-শ্রবণ

নবদ্বীপ বাবুকে বিদায় দিয়া রাজেন বাবু আবার পূর্ব্ববৎ গম্ভীর হইলেন। তাঁহার মুখকান্তি ম্লান,—অন্তরে বিষম দুঃখ! কি একটী মূল্যবান্ বস্তু যেন তাঁহার হস্ত হইতে কেহ কাড়িয়া লইয়াছে। একদিন গেল, দুইদিন গেল, তিনদিনের দিন তিনি জামাজুতা পরিয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুদর্শনে চলিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাড়ীতে কীর্ত্তন গান

---

* এই বিবরণটী সবিশেষ অবগত না হওয়ায় প্রথম সংস্করণে অপ্রকাশিত ছিল।

হইতেছে। রাজেন বাবু একবার গান শুনিতে বসেন, আবার উঠিয়া যেখানে জুতা রাখিয়াছেন, সেই স্থানে আসেন। এইরূপে দুইবার আসিয়া তিনবারের বার আর তাঁহার ধৈর্য্য থাকিল না। সম্মুখে একটী যুবককে দেখিয়া বলিলেন, "ভাই, এই জুতাজোড়াটী তুমি পায়ে দিয়া আমার সকল ঝঞ্ঝাট দূর কর।" যুবকটী এই কথা শুনিয়া বিস্মিতভাবে বলিল, "সে কি মহাশয়! আমি আপনার জুতা লইব কেন?" পুনঃপুনঃ অনুরোধ করায় যুবক অগত্যা জুতা জোড়াটী পায়ে দিলেন। তখন রাজেন বাবু অতিশয় আগ্রহসহকারে নিজের গাত্র হইতে সোনার বোতাম সহ জামাটী খুলিয়া তাহাকে পরাইয়া দিয়া "উঃ! এতক্ষণে শান্তি পাইলাম! হা প্রভু, বিষয়-বিষ কি এতই তীব্র? এতই যন্ত্রণাপ্রদ? এতক্ষণ আমাকে এই জুতাজামারূপ বিষয়বিষে কি বিষম উদ্বেগ দিতেছিল! দয়াময় প্রভো! তুমি আমার সকল উদ্বেগ ঘুচাইলে। ধন্য তোমার করুণা!" এই কথা বলিয়া প্রফুল্লচিত্তে নিশ্চিন্ত ভাবে আবার গান শুনিতে বসিলেন। এবার অনেকক্ষণ নিরুদ্বেগে কীর্ত্তনানন্দ উপভোগ করিলেন। গান ভঙ্গ হইলে তিনি খালি গায়ে ও খালি পায়ে বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। আজ তাঁহার মনে বড় আনন্দ! প্রফুল্লমনে স্নানাদি সমাপন করিয়া ঠাকুরের ভোগ দিয়া প্রসাদ পাইলেন। তাহার পর যথারীতি গ্রন্থ পাঠ করিতে বসিলেন।

এদিকে নবদ্বীপবাবু তাঁহার চাকুরীতে ইস্তফা দিয়া পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞামত সাত দিনের দিন নবদ্বীপে আসিয়া রাজেন বাবুর সহিত মিলিলেন। রাজেন বাবু তাঁহার 'হারানিধি' পাইয়া আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিলেন। উভয়ের মনে আবার পূর্ব্ববৎ আনন্দের স্রোত বহিতে লাগিল— উভয়েই প্রেমানন্দে মগ্ন হইলেন।

ইহার দুই একদিন পরে আরও দুইটী অনুরাগী যুবক আসিয়া তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন। একটী গৌরবর্ণ, তাঁহার নাম **কৃষ্ণগোবিন্দ**। অপরটী কৃষ্ণকায়, নাম **রাসমোহন**।*

রাজেন বাবু বড়ই সখ্যভাবপ্রিয়। মধুময় ভ্রাতৃভাবটি যেন তাঁহার সহজাত। যেখানে সেখানে, যে সে ভাবে, যার তার সঙ্গে, মিলন হইবামাত্রই তাহাকে 'দাদা' বা 'ভাই' সম্বোধন করা ইঁহার স্বভাবসিদ্ধ ভাব। রাজেনবাবুকে গুরুবুদ্ধিতে দর্শন করিতে গিয়াও কেহ তাঁহার সহিত দাদা ভিন্ন অন্য সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিতেন না। কি নবদ্বীপ বাবু, কি নবাগত অনুরাগী যুবকদ্বয়, সকলেরই তিনি 'দাদা' হইয়া উঠিলেন। তাঁহাকে দাদা বলিয়া তাঁহারা যত সুখ পাইতেন, আর কোন সম্ভাষণেই তত সুখ পাইতেন না। রাজেন বাবুও তাঁহাদিগকে 'ভাই' বলিতে অজ্ঞান হইতেন। ভ্রাতৃভাব তাঁহার অন্তরের ধন ছিল। এই ধনে ধনী হইয়া তিনি বিশ্বজয়ী হইয়াছিলেন।

একদিন প্রাতঃকালে সকলে মিলিয়া একটি নূতন গান গাহিতে গাহিতে ঠাকুরদর্শনে বাহির হইলেন। গানটি রাজেন বাবুর স্বরচিত। মুখে মুখে পদ রচনা করিবার তাঁহার অপূর্ব্ব ক্ষমতা ছিল। যেমন মনে আসিল, অমনি রচনার সঙ্গে সঙ্গে পদ মুখে মুখে গীত হইতে লাগিল। কাগজ কলমের সহিত কোন সম্পর্কই তিনি রাখিতেন না। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর কৃপাবলে তিনি চিরদিনই এইরূপ শক্তিশালী ছিলেন। তাঁহার স্বরচিত গানটি এই :—

নিতাই গৌরাঙ্গ, নিতাই গৌরাঙ্গ,
নিতাই গৌরাঙ্গ গদাধর।

* ইঁহারই ভেকের নাম রাধাচরণ দাস ইনি শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডে দেহ রক্ষা করেন।

জয় শচীনন্দন, জগজ্জীবতারণ,
(কলি) কলুষনাশন অবতার ॥
জয় হাড়াইনন্দন, পদ্মাবতীজীবন,
(কর) প্রেমপরশরতন পরচার ।
জয় শ্রীসীতানাথ, শ্রীঅচ্যুততাত,
(নিতাই) গৌর আনি কর প্রেমে হুহুঙ্কার ॥
জয় মাধবাচার্য্যানন্দন, রত্নাবতীজীবন,
(জীবে) দাস্যসেবা দিয়ে কর অঙ্গীকার ।
জয় শ্রীবাসাদি ভক্তগণ, করু নাম সঙ্কীর্ত্তন,
পূর্ব্বরাগ গাও স্বরূপ দামোদর ॥
গৌরীদাস আদি করি, খণ্ডবাসী নরহরি,
হরিদাস চরণতরী দেও এইবার ।
জীবের লাগিয়ে, সন্ন্যাস করিয়ে,
রাধাভাব কৈলে গোরা অঙ্গীকার ॥
জীবের লাগিয়ে, নীলাচলে বসিয়ে,
(রাধা) প্রেম করল গোরা পরচার ।
স্থাবর জঙ্গম আদি, হরি বলে নিরবধি,
(গোরা) কৈলে লীলা একি চমৎকার ॥
বালক বৃদ্ধ পুরুষ নারী, ভজ নিতাই গৌরহরি,
(ভব) পারে যেতে চরণতরী কর সার ।
দীনহীন দাসে বলে, রেখো নিতাই চরণতলে,
ভজনবিহীন জনে কর পার ॥

এই অমূল্য পদরত্নটি কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহারা নদীয়ার পথে চলিয়াছেন। চারিদিক লোকে লোকারণ্য। সকলেই ভাবে বিভোর!

রাজেন বাবুর বাহ্যজ্ঞান নাই। মনে এক একটি নূতন পদ বা আঁখরের স্ফূর্ত্তি হইতেছে, আর যেন আনন্দসিন্ধু উথলিয়া উঠিয়া আপামর সাধারণ জনগণকে ভাসাইয়া দিতেছে। নদীয়ায় আজ বহুদিন পরে, অপূর্ব্ব প্রেমানন্দের বন্যা ছুটিয়াছে। যদিও মৃদঙ্গাদি কোনও যন্ত্রের সাহায্য নাই, তথাপি ব্রহ্মাণ্ডভেদী নামব্রহ্ম যেন মূর্ত্তিমান্‌রূপে প্রতীয়মান হইয়াছেন। নামের মধুর রোলে দশদিক্ মুখরিত। পথের উভয় পার্শ্বে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় কীর্ত্তন শুনিতেছে, আর বিস্মিতভাবে পরস্পর বলাবলি করিতেছে, 'আহা! এ ভক্তটি কে? ইঁহার গতিবিধি, ভাবভঙ্গি সকলই যেন অপূর্ব্ব প্রেমে মাখা। যদিও ইনি উজ্জ্বল গৌরবর্ণ নন, কিন্তু ইঁহার মুখখানি অতি সুন্দর এবং মাধুর্য্যময়। যে একবার ইঁহার মুখপানে চাহিতেছে, সেই যেন মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া চিরদিনের মত ইঁহার চরণে মনপ্রাণ ঢালিয়া দিতেছে। ধন্য ইঁহার জন্ম! ধন্য ইঁহার প্রেমভক্তি! ইনি বাস্তবিকই মহাপুরুষ।"

শ্রীশ্রীনীলাচল যাত্রা

নবদ্বীপে এইরূপ কীর্ত্তনানন্দে কিছুদিন কাটাইয়া রাজেন বাবু তাঁহার মরমী সঙ্গিগণ সঙ্গে একদিন কীর্ত্তন করিতে করিতে গঙ্গাতীর দিয়া দক্ষিণাভিমুখে চলিলেন। কোথায় যাইতেছেন, কে জানে! নবদ্বীপ দাস প্রভৃতি তিনজনই দাদার মুখাপেক্ষী। প্রেমোন্মত্ত দাদা আগে আগে চরণে চরণ ফেলিয়া তালে তালে নাচিতে নাচিতে গমন করিতেছেন। তাঁহারাও মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছেন। এইভাবে ক্রমে গুপ্তিপাড়া অতিক্রম করিয়া সাতগাছিয়া গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অবিরাম কীর্ত্তন চলিতেছে।

নামের সুধামধুর ধ্বনি গগন ভেদ করিয়া উঠিতেছে। গ্রামবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা মন্ত্রমুগ্ধবৎ দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া এই অদ্ভুত বৈষ্ণবমূর্ত্তিচতুষ্টয়ের দিকে ছুটিল। ইঁহাদিগের সদানন্দ প্রেমময় মূর্ত্তি দর্শন করিয়া গ্রামবাসী নরনারী সকলেই বিমোহিত হইয়া একদৃষ্টে ইঁহাদের মুখপানে চাহিয়া আছে। এই সময়ে শান্তিপুরের প্রভুদের দৌহিত্রসন্তান শ্রীপাদ কুঞ্জলাল গোস্বামী মহাশয় আসিয়া ইঁহাদের সঙ্গে মিলিলেন। আর একটি কীর্ত্তনের দলও আসিয়া ঐ সঙ্গে জুটিল। আনন্দের আর সীমা নাই। কীর্ত্তনানন্দে সকলেই উন্মত্ত। এ সময়ে শিষ্যগণ সঙ্গে লইয়া শ্রীপাদ বিপিনবিহারী গোস্বামী সেখানে আসিয়া অতিশয় আগ্রহ সহকারে ইঁহাদিগকে তাঁহাদের শ্রীশ্রীমদনগোপাল জিউর মন্দিরে লইয়া গেলেন। সেখানে বহুক্ষণ কীর্ত্তনান্তে গঙ্গাস্নান ও নিত্যকর্ম্ম সমাপন করিয়া তাঁহারা শ্রীশ্রীমদনগোপালের মহাপ্রসাদ পাইলেন। এইরূপে সেইস্থানে কয়েকদিন কীর্ত্তনানন্দে গ্রামবাসী নরনারীর চিত্ত মুগ্ধ করিয়া রাজেন বাবু তাঁহার সঙ্গিগণ সঙ্গে শ্রীপাট কালনা দর্শনে চলিলেন। শ্রীপাট কালনার শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের শ্রীমূর্ত্তিদ্বয় সর্ব্বচিত্তাকর্ষক এবং সর্ব্বজন-মনোহারী। রাজেন বাবু শ্রীমূর্ত্তিদ্বয় দর্শনমাত্রেই প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। নয়নে যেন প্রেমনদী প্রবাহিত হইতে লাগিল। তাঁহার সঙ্গিগণও প্রেমোন্মত্ত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া সকলেই পরমানন্দিত হইলেন। রাজেন বাবু কিছুক্ষণ পরে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া গদগদ কণ্ঠে নিজ পদাবলী কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। ঐ সমস্ত পদাবলী শুনিয়া উপস্থিত গ্রামবাসী ভক্তগণ কেহই বুঝিতে পারিলেন না যে, এগুলি কোন প্রাচীন মহাজনের বিরচিত কিংবা ইঁহার স্বরচিত কীর্ত্তন শুনিয়া সকলেই প্রেমে বিভোর। রাজেন বাবু ও তাঁহার প্রেমিক

সঙ্গিগণ নিতাইগৌরাঙ্গের চাঁদ-বদন পানে চাহিয়া প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে আত্মহারাভাবে উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ ঐ গ্রামবাসী একটী চারি পাঁচ বৎসরের বালক কীর্ত্তনের মধ্যে আসিয়া নাচিতে নাচিতে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল। কতক্ষণ পরে সেই প্রেমাবিষ্ট বালক রাজেন বাবু ও তাঁহার সঙ্গিগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল, "তোমরা আর কালবিলম্ব না করিয়া নীলাচলাভিমুখে যাত্রা কর।" বালকের কথা শুনিয়া সকলেই অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ক্রমে নামব্রহ্ম * প্রভৃতি দর্শন করিয়া তৎপরদিবস চারিজনে পদব্রজে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে নীলাচল যাত্রা করিলেন। সঙ্গে সম্বল—চারিজনের হাতে চারি জোড়া করতাল, প্রত্যেকের একখানি দোপাট্টা চাদর, পরিধানে একখানি কাপড় মাত্র। স্নানের সময় চাদর পরিয়া কাপড় শুকাইয়া লন। ইঁহাদের মধ্যে কাহারও কাপড় ছিঁড়িয়া গেলে অপর একজনের কাপড়ের অর্দ্ধাংশ তাঁহাকে দিয়া পরমানন্দে পথ চলিতে লাগিলেন। যেখানে সন্ধ্যা হয়, সেইখানেই রাত্রিবাস; কে জানে গ্রাম, কে জানে বন। যখনই দাদার বিশ্রামের ইচ্ছা হইবে, তখনই সকলের বিশ্রাম। আহারাদির ব্যবস্থাও ঐরূপ।

এইরূপে কিছুদিন পরে তাঁহারা শ্রীশ্রীসাক্ষীগোপালে গিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজেনবাবু কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন; শ্রীশ্রীসাক্ষীগোপালের পূর্ব্বকাহিনী এবং ছোট বিপ্র ও বড় বিপ্রের মধুময় চরিত স্বরচিত পদে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। শুনিয়া সকলেই অবাক্ হইয়া বলিতে লাগিল, "এমন কীর্ত্তন ত কখনও শুনি নাই।" শ্রীমন্দির লোকে লোকারণ্য। সকলেই বলাবলি করিতেছে, "ইঁহারা কে? কোথা হইতেই বা আসিলেন? ইঁহাদের মধ্যে ঐ দীর্ঘাকার বাবাজীটীকে দেখিয়া বাস্তবিক

* সিদ্ধ ভগবান্ দাস বাবাজী মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত সেবা।

মহাপুরুষ বলিয়াই বোধ হয়। আহা! উঁহার কেমন আজানুলম্বিত বাহু, সুবলিত দেহ, সুন্দর সহাস্য বদন! দেখিলেই মনে হয়, ইনি যেন এ রাজ্যের লোক নহেন। আমাদের বোধ হয়, ঐ বড় বাবাজীটীরই এই সব চেলা।" রাজেনবাবুর এই হইতেই 'বড় বাবাজী' নাম প্রচার হইল। আমরাও অতঃপর ইঁহাকে **"বড় বাবাজী"** বলিয়াই অভিহিত করিব।

কীর্ত্তনের অবসানে ক্রমে মহাপ্রসাদ উপস্থিত হইতে লাগিল। কে কত খায়? মহামহোৎসব ব্যাপার! বড় বাবাজী মহাশয় লোককে পরমানন্দে প্রসাদ বিতরণ করিতেছেন। উপস্থিত সকলে প্রসাদ পাইবার পর যাহা কিছু অবশিষ্ট রহিল, তাহাই তাঁহারা চারিজনে বাঁটিয়া পরমানন্দে পাইলেন। শ্রীশ্রীসাক্ষীগোপালের শ্রীমন্দিরে আনন্দের উৎস ছুটিল। পুনরায় সকলে কীর্ত্তনানন্দে মগ্ন হইলেন।

সিদ্ধমন্ত্র-প্রাপ্তি

ক্রমে রাত্রি অধিক হইল। ঠাকুরের শয়নের পর সকলেই শ্রীমন্দিরের বহির্দ্দেশে আসিয়া শয়ন করিলেন। গভীর রজনী—চতুর্দ্দিক্ নিস্তব্ধ। হঠাৎ বড় বাবাজী মহাশয় উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলে নবদ্বীপ দাদা ও অপর সঙ্গিদ্বয় বহু সান্ত্বনা বাক্যে উঁহাকে কিঞ্চিৎ স্থির করতঃ বিবরণ জিজ্ঞাসা করায় ইনি গদগদকণ্ঠে বলিলেন,—"ভাই! কি আর বলিব! আমি নিদ্রিত কি জাগরিত কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিলাম না, হঠাৎ দেখি—আজানুলম্বিতভুজ, আকর্ণবিস্তৃত-নয়ন, অতি দীর্ঘাকার, কাশ্মীর-গৌরবর্ণ ও কাঞ্চনকান্তি দুইটী মহাপুরুষ আসিয়া আমার শিয়রে বসিলেন এবং কাশ্মীর-গৌরবর্ণ পুরুষটী বলিতে লাগিলেন, "তুমি মনোযোগপূর্ব্বক আমার কয়েকটী কথা শ্রবণ কর। আমি তোমাকে এই মন্ত্রটী দিতেছি। তুমি এ মন্ত্র অতি যত্নে আরাধনা করিবে এবং শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যে চাহিবে,

তাহাকেই অবিচারে প্রদান করিবে।" এই বলিয়া দ্বাবিংশ গৌরমন্ত্র কর্ণে প্রদান করিয়া যেমন অন্তর্হিত হইলেন, অমনি আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। হায় রে! এমন অমূল্য রত্ন পাইয়া আমার ভাগ্যদোষে আমি কিছুই যত্ন করিতে পারিলাম না! এমন কি সে মনোহর মূর্ত্তি দুইটী নয়ন ভরিয়া কিছুক্ষণ দর্শনও করিতে পারিলাম না" এই বলিয়া ঠিক বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন। এইরূপে সে রাত্রি পরমানন্দে কাটিয়া গেল। প্রভাতকালে বড় বাবাজী মহাশয়ের চোখের জলে মুখ বুক ভাসিয়া যাইতেছে। মুখে কেবল "হা নিতাই, জয় নিতাই।" সঙ্গিগণ সকলেই অস্থির হইলেন। তাঁহার কখন নৃত্য, কখনও ভূমিতে গড়াগড়ি, কখনও উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার, কখনও মৃদু মৃদু স্বরে কাতর-কণ্ঠে করুণ রোদন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া সঙ্গিগণ অতিশয় বিচলিত হইয়া নানাবিধ সান্ত্বনাবাক্যে তাঁহাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। বড় বাবাজী মহাশয় প্রেমোন্মত্তভাবে সঙ্গিগণের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে কীর্ত্তনানন্দে মত্ত হইয়া সকলে শ্রীক্ষেত্রাভিমুখে রওনা হইলেন। "হা নিতাই, জয় নিতাই" বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ইঁহারা পথে ছুটিয়াছেন। ইঁহাদিগকে যে দেখিতেছে, সেই ইঁহাদের মুখপানে চাহিয়া আনন্দে আত্মহারা হইতেছে। যতই ইঁহারা নীলাচলের নিকটবর্ত্তী হইতেছেন, ততই মনের আনন্দ বাড়িতেছে। প্রেমানন্দে ছুটিতে ছুটিতে যথাসময়ে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। নীলাচলবাসী এই প্রেমোন্মত্ত বৈষ্ণব মূর্ত্তি-চতুষ্টয়কে দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন। 'ইঁহারা কে, কোথা হইতেই বা আসিতেছেন, কোথায়ই বা যাইতেছেন?' সকলের মুখেই কেবল এই কথা। ইঁহারা কিন্তু কোন দিকে না চাহিয়া প্রেমানন্দে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের দিকে ছুটিয়াছেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ইঁহারা সিংহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। অরুণস্তম্ভের নিকট আসিয়া বড় বাবাজী মহাশয় প্রেমভরে শ্রীনীলাচলনাথের উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। ইঁহার সঙ্গিগণও ইঁহার অনুকরণ করিলেন। ক্রমে মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের অপূর্ব্ব শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া প্রেমানন্দে উন্মত্ত হইয়া সকলে একসঙ্গে কীর্ত্তনরঙ্গে মাতিলেন। শ্রীমন্দিরে আনন্দের তরঙ্গ উঠিল। সকলেই প্রেমানন্দে অধীর হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। কোথা হইতে অতি সুন্দর এবং পরম উপাদেয় পদাবলীর উদ্গম হইতে লাগিল, কে তাহার নির্দ্ধারণ করিবে? বোধ হয় মুখস্থ করিয়াও কেহ ঐ সকল পদাবলী অত দ্রুতবেগে আবৃত্তি করিতে পারে কিনা সন্দেহ। বড় বাবাজী মহাশয়ের আজানুলম্বিত ভুজযুগ-শোভিত সেই বিশাল দেহখানি সাত্ত্বিক ভূষণে বিভূষিত। এরূপ ভাবাবেশ, এরূপ মধুর কীর্ত্তনধ্বনি, প্রেমভরে এরূপ উদ্দণ্ড নৃত্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর আর কেহ কখন প্রত্যক্ষ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পাণ্ডা ও পূজারীগণ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সেখানে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, যুবা কেহই আর সেই প্রাণমাতান নৃত্য দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিতেছে না। যিনি একবার এই সকল কীর্ত্তন-রণ-বীরদিগকে দর্শন করিতেছেন, তিনিই চুম্বকাকৃষ্ট লৌহবৎ সেখান হইতে আর স্থানান্তরে যাইতে পারিতেছেন না। আজ জগমোহন অপরূপ রূপ ধারণ করিয়া যেন সাক্ষাৎ জগন্মোহনই হইলেন। আনন্দে উন্মত্ত হইয়া কেহ কাহার উপর পড়িতেছে। কেহ কাঁদিয়া আকুল, কেহ বা হাসিয়া

কেহ প্রেমানন্দে বড় বাবাজী মহাশয়ের চরণ ধরিয়া রোদন

করিতেছে। কেহ বা কীর্ত্তনরঙ্গে গড়াগড়ি দিতেছে। শ্রীমন্দিরে আজ অপূর্ব্ব দৃশ্য। এই অদ্ভুত ব্যাপার ভাষায় বর্ণনা করিয়া বুঝান যায় না। যাঁহারা এই মধুময় দৃশ্য প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছেন, তাঁহারাই ইহার মর্ম্ম বুঝিবেন।

ক্রমে বেলা তৃতীয় প্রহর হইলে, মাধব পশুপালক নামক শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের শিঙ্গারী পাণ্ডা প্রসাদী মালা আনিয়া বাবাজী মহাশয়ের গলায় দিলেন। এমন সময়ে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মধ্যাহ্ন ধূপ * উঠিল—ভিতরের কপাট বন্ধ হইল—কীর্ত্তনেরও বিরাম হইল। তখন সকলেই সেই সুদীর্ঘাকার কীর্ত্তনশ্রান্ত মহাপুরুষটীর সেবাশুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। একটী গৌরবর্ণ বৃদ্ধ বাবাজী আসিয়া তাঁহার নিকটে বসিলেন। অনেক ভক্তগণ নানাবিধ পিঠাপানা মহাপ্রসাদ আনিয়া দিতে লাগিল। প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা কে করে? সকলেই প্রেমোন্মত্ত। তখন সেই বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "বলরাম, তুমিই এই সব প্রসাদের ব্যবস্থা কর।" এই আদেশ পাইয়া বলরাম পট্টনায়ক নামক জনৈক ভক্ত সেই সমস্ত মহাপ্রসাদ একত্র করিয়া নবাগত বৈষ্ণবচতুষ্টয়কে এবং উপস্থিত ভক্তগণকে যথাযোগ্য স্থানে বসাইয়া অতি যত্নপূর্ব্বক পরিবেশন করিতে লাগিলেন। সকলেই সেই জগমোহনের পাথরের উপর মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিতেছেন। সর্ব্বপ্রথমে বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয় একগ্রাস মহাপ্রসাদ হস্তে লইয়া যেমন বড় বাবাজী মহাশয়ের মুখে দিলেন, অমনি চতুর্দ্দিক হইতে "হরিবোল হরিবোল" ধ্বনি উঠিল। সকলেই এক এক গ্রাস মহাপ্রসাদ তাঁহার মুখে দিতে আরম্ভ করিলেন। সকলেই প্রেমানন্দে মাতোয়ারা। সে আনন্দ দেখে কে? কেহ বা খাইতে খাইতে কাহারও মুখে দিতেছে, কেহ বা কাহারও মুখ হইতে কাড়িয়া খাইতেছে। গৃহস্থ

* ভোগ

লোক গৃহের কথা ভুলিয়া গিয়াছে। রাজকর্ম্মচারিগণ প্রেমানন্দে রাজকার্য্য ভুলিয়া গিয়াছেন। সকলেই যেন আত্মহারা বাহ্যজ্ঞানশূন্য। উপস্থিত ভক্তবৃন্দের মধ্যে বলরাম বাবু, কুঞ্জবিহারী রায়, গোপালপ্রসাদ দত্ত, অর্জ্জুন সাঁতরা, গণেশ মহান্তি, গোপালচন্দ্র পট্টনায়ক, ভুবনচন্দ্র সাউ, গোপীমোহন সাউ প্রভৃতি আট দশজনই বড় বাবাজী মহাশয়ের পুরীবাসের সময়ে বিশেষ অন্তরঙ্গ হইয়াছিলেন। ইঁহাদিগের মত ভাগ্যবান্ আর কে আছে?

গম্ভীরায় গমন

পূর্ব্বকথিত বৃদ্ধ বাবাজীটীর নাম শ্রীরামকৃষ্ণ দাস। বড় বাবাজী মহাশয় বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা! এখান হইতে গম্ভীরা কতদূর হইবে?" উপস্থিত সকলেই সমস্বরে উত্তর করিলেন, "এই ত অতি নিকটেই, চলুন না।"

বড় বাবাজী। আপনাদের বোধ হয় কষ্ট হইবে।

বৃদ্ধ বাবাজী। যে মুহূর্ত্ত হইতে আপনাদের দর্শন লাভ করিয়াছি, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই আমাদের সর্ব্ববিধ শারীরিক ও মানসিক কষ্ট দূর হইয়া গিয়াছে। আমাদের এখন আনন্দের দিন আসিয়াছে। বড় বাবাজী মহাশয় লজ্জাবনতবদনে ঈষৎ হাসিয়া কীর্ত্তন ধরিলেন :—

"কোথা হে গৌরাঙ্গচাঁদ দেখা দাও মোরে।
গৌড় হইতে আসিয়াছি দেখিতে তোমারে॥
বহুদিন দেখি নাই ও চাঁদবদন।
দেখা দিয়া প্রাণ রাখ হে শচীনন্দন॥
নিত্যানন্দ সঙ্গে লইয়া বিহরিছ যথা।
কে হেন বান্ধব আছে ল'য়ে যায় তথা॥
এই ত গম্ভীরা হেথা থাক সর্ব্বক্ষণ।
স্বরূপ রামানন্দ লইয়া রস আস্বাদন॥"

এইরূপ নিজকৃত বহু বহু পদাবলী গান করিতে করিতে অনেক লোক-সমভিব্যাহারে গম্ভীরায় প্রবেশ করিলেন। গম্ভীরার অধিকারী শ্রীহরিভজন দাস বাবাজী আসিয়া তাঁহাকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ব্যবহৃত কাঁথা দেখাইলে উহা দর্শন ও স্পর্শন মাত্রই বড় বাবাজী মহাশয় প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া সাশ্রুনয়নে ভাবগদগদকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "হা প্রভু গৌরাঙ্গদেব, এ দাসকে কৃপা কর। তোমার দাসানুদাসগণের দাস করিয়া এ অধমকে শ্রীচরণে স্থান দিতে ভুলিও না।" এই বলিতে বলিতে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে নিপতিত হইলেন। সঙ্গিগণের শুশ্রূষায় ক্ষণকাল পরে চৈতন্য লাভ করিয়া ক্রমে শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়ী এবং সিদ্ধবকুল মঠ প্রভৃতি স্থানসকল দর্শন করিলেন। ইঁহারা কোথায় যে যাইবেন বা কোথায় যে থাকিবেন, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ দাস বাবাজী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের থাকিবার স্থান কি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে?" উত্তরে বড় বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "সেজন্য আপনাদের ভাবিবার কোন প্রয়োজন নাই। কৃপাময় প্রভু কৃপা করিয়া যেখানে রাখিবেন, সেইখানেই আমাদের থাকা হইবে।"

বলরাম বাবু বলিলেন, "সম্প্রতি আমাদের ঠাকুরবাড়ী যাইতে আপনাদের কোনও আপত্তি আছে কি?"

বড় বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "ভাই, যদি তোমাদের কোনও কষ্ট না হয়, তবে আমাদের কোনও আপত্তি নাই।" এই সময় পূর্ব্বোক্ত গণেশ পট্টনায়ক বলিলেন, "আজ্ঞে, আমার দোলমণ্ডপসাহীর বাটীর বাহিরের ঘরে থাকিলে হয় না কি? বোধ হয় ইহাতে আপনাদের বিশেষ সুবিধাই হইবে। কারণ সে স্থানটী শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের অতি নিকটবর্ত্তী; সুতরাং ভক্তবৃন্দের যাতায়াতের পক্ষেও

সুবিধাজনক হইবে।” বড় বাবাজী মহাশয় বিষম সমস্যায় পড়িলেন। বলরামের কথা রাখেন, কি গণেশের কথা রাখেন। অগত্যা বৃদ্ধ রামকৃষ্ণ দাস বাবাজী মহাশয়কে মধ্যস্থ মানিতে হইল। অবশেষে গণেশ পট্টনায়কের বাড়ীতেই থাকা স্থির হইল। বলরাম বাবু বলিলেন, “অন্ততঃ আজিকার দিনটা আমাদের ঠাকুরবাড়ীতে মহাপ্রসাদ পাইবার ব্যবস্থা হউক।” সকলের তাহাই মত হইল। বাবাজী মহাশয় বলিলেন, “আমাদের জন্য তোমাদের বহু কষ্ট পাইতে হইবে।” বলরাম বাবু হাসিতে হাসিতে কহিলেন, “আমাদের কষ্ট হইলে আর বলিব কেন? আমাদের আজ পরম সৌভাগ্য। চলুন, বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, এক্ষণে বিশ্রাম করা প্রয়োজন। কল্য আবার দর্শনাদি হইবে।”

সকলেই হৃষ্টচিত্তে নাম করিতে করিতে বলরাম বাবুর বাড়ীতে চলিলেন। তাঁহার বাটীর সংলগ্ন তাঁহার ভ্রাতার ঠাকুরবাড়ীতে রাত্রে প্রসাদ পাইবার ব্যবস্থা হইল। সন্ধ্যাকালে সেখানে আরতি কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। “গৌড়দেশ হইতে চারিজন বাবাজী আসিয়াছেন, তাঁহারা অপূর্ব্ব কীর্ত্তন করেন” এই কথা সমগ্র শ্রীক্ষেত্রে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে। বহু লোক ইঁহাদিগকে দেখিতে আসিতেছে। যিনি একবার দেখিতেছেন, তিনিই আকৃষ্ট হইতেছেন। আরতি কীর্ত্তনের পর মহাপ্রসাদ গ্রহণ পূর্ব্বক বড় বাবাজী মহাশয় সগণে গণেশ পট্টনায়কের বাড়ীতে গিয়া বিশ্রাম করিলেন। প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া নরেন্দ্র সরোবরে স্নানাদি প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক নামকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দর্শনে চলিলেন। ইঁহাদের নামকীর্ত্তন ভিন্ন আর কোন কার্য্য নাই—বলরাম বাবু আসিয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আজ আমাদের ঠাকুরবাড়ীতে প্রসাদের ব্যবস্থা করা যাউক।” বড় বাবাজী মহাশয়

বলিলেন, "আমাদের জন্য কোনরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন নাই। কৃপাময় প্রভু উপস্থিতমত যাহা করিবেন, তাহাই হইবে।" এই বলিয়া প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে করিতে সদলে জগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। পূর্ব্ববৎ জগমোহনে কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। পাণ্ডাগণ প্রসাদী মালা, চরণতুলসী ও চন্দন আনিয়া সকলকে দিলেন। ক্রমে কীর্ত্তনটী বেশ জমাট বাঁধিল। লোকসংঘট্টও খুব হইল। সকলেই প্রেমানন্দে বিভোর। সকলেই মণ্ডলীবন্ধনে বড় বাবাজী মহাশয়কে মধ্যে করিয়া নৃত্য করিতেছেন। আহা মরি! কি অপরূপ শোভা! কি অনির্ব্বচনীয় আকর্ষণী শক্তি!! বহুক্ষণ কীর্ত্তনের পর কীর্ত্তনশ্রান্ত ভক্তগণের শ্রম জানিয়াই যেন কীর্ত্তন-সমাপ্তি করিলেন। তৎপরে মহাপ্রসাদ আসিয়া উপস্থিত হইলে বলরামবাবু যথাযোগ্যভাবে সকলকে বসাইয়া মহাপ্রসাদ বিতরণ করিতে লাগিলেন। মহাপ্রসাদ বিতরণের ভারটা বলরাম বাবুর নিজস্ব হইয়া পড়িল।

সমুদ্রস্নান ও চটকপর্ব্বত দর্শন

মহাপ্রসাদ গ্রহণানন্তর সকলেরই বিশেষ আগ্রহ হইল, কীর্ত্তন করিতে করিতে সমুদ্রস্নানে যাইবেন। মনের ভাব তৎক্ষণাৎ কার্য্যে পরিণত হইল। সকলে মিলিয়া প্রেমানন্দে কীর্ত্তন করিতে করিতে সমুদ্রের দিকে ছুটিলেন। কিছুদূর যাইতে যাইতে পথে একটি অত্যুচ্চ বালুকাপর্ব্বত দেখিয়া বড় বাবাজী মহাশয় প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পরে ভক্তগণের বহু সন্তর্পণে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলেন। কিন্তু প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া সেই পর্ব্বতের উপরিস্থিত একটী বটবৃক্ষতলে বসিয়া অতিশয় মৃদুস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে অন্তরঙ্গ সঙ্গীদিগকে বলিতে লাগিলেন, "দূর হইতে এই বটবৃক্ষতলে স্বরূপ দামোদরের সঙ্গে আমার

প্রাণগৌরাঙ্গকে দেখিলাম। কিন্তু নিকটে আসিয়া আর দেখিতে পাইলাম না। এই বনে প্রাণগৌরাঙ্গ আমার, শ্রীবৃন্দাবন দর্শন করিতেন। এই বটবৃক্ষকে তিনি বংশীবট মনে করিতেন এবং এই চটক পর্ব্বতকে তিনি গিরি গোবর্দ্ধনভ্রমে প্রেমানন্দে পূর্ব্বলীলা স্মরণপূর্ব্বক স্বরূপের গলা ধরিয়া নানারূপ বিলাপ করিতেন।" এই বলিয়া তিনি প্রেম-বিহ্বলভাবে কোনও ভক্তকে শ্রীচরিতামৃতের "চটক পর্ব্বত দর্শনে মহাপ্রভুর প্রলাপ বর্ণন" স্থানটী পাঠ করিতে বলিলেন। প্রেমিক ভক্তটী তৎক্ষণাৎ "গোবর্দ্ধন হইতে ইঁহা মোরে কে আনিল" ইত্যাদি অংশ আবৃত্তি করিয়া তাঁহার মনস্তুষ্টি করিলেন। কিছুক্ষণ পরে বড় বাবাজী মহাশয় নৃত্য করিতে করিতে সমুদ্রতীরাভিমুখে চলিলেন। সমুদ্রের তরঙ্গ দেখিয়া প্রেমোন্মত্তভাবে ভক্তগণকে বলিতে লাগিলেন, "পূর্ব্বে এই সমুদ্র তীর্থরাজ ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণস্পর্শে মহামহাতীর্থরাজ হইয়াছেন। এই সমুদ্রতীরে প্রভুর পদরজ পড়িয়াছে বলিয়া তীর্থরাজ তরঙ্গচ্ছলে প্রেমানন্দে তীরে গড়াগড়ি দিতেছেন। এই তীর্থরাজ যাঁহাকে কৃপা করিবেন, শ্রীগৌরাঙ্গধন তাঁহার অনায়াসে মিলিবে।" এই বলিয়া তিনি সমুদ্রতীরে বালুকার উপর প্রেমানন্দে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। সমুদ্রদর্শনে আজ তাঁহার হৃদয়ের প্রেমসমুদ্র উথলিয়া উঠিয়াছে। প্রেমাবেশে তিনি আজ আত্মহারা হইয়াছেন। কতক্ষণ পরে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া তিনি সদলবলে সমুদ্রস্নান করিলেন। তাঁহার সমুদ্রস্নান সম্বন্ধে জনৈক ভক্ত লিখিয়াছেন :—

"পুলকাশ্রুভরে দেয় তীড়ে গড়াগড়ি।
আনন্দে করয়ে স্নান বলি গৌরহরি॥
তরঙ্গের মাঝে সব যায় সাঁতারিয়া।
কেহ বা কাহার পায়ে ধরয়ে ডুবিয়া॥

কেহ কারে কাঁধে করি নাচে উভরায়।
কেহ বা কাহারে ধরি দূরে লঞা যায়॥
এ হেন আনন্দে সবে করয়ে সিনান।
সবেই বিভোর নাহি ভেদাভেদ জ্ঞান॥
এই মত কতক্ষণ আনন্দে মাতিয়া।
তীরে উঠিলেন জলকেলি সমাপিয়া॥
শ্রীঅঙ্গ মুছিয়া শুষ্ক বস্ত্র পরিধান।
সবে মেলি তীর্থরাজে করিলা প্রণাম॥"

সমুদ্রস্নান সমাপনান্তে সকলে মিলিয়া শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধি-মন্দির দর্শন করিতে চলিলেন। পূজ্যপাদ শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধি-মন্দির দর্শনে বড় বাবাজী মহাশয় উচ্চৈঃস্বরে নামসংকীর্ত্তন করিতে করিতে প্রেমানন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বহস্তে হরিদাস ঠাকুরের বালুকা সমাধিমন্দির প্রস্তুত করিয়াছিলেন। স্বয়ং ভিক্ষা করিয়া মহাসমারোহে তাঁহার বিরহোৎসব সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এইরূপ ভাবে বিভাবিত হইয়া প্রেমাবেশে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান রহিত হইল। সঙ্গিগণ তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম সংকীর্ত্তন দ্বারা অতিকষ্টে তাঁহার চৈতন্যসম্পাদন করিলেন। তখন তাঁহারা সকলে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের বাহির বেঢ়া পরিক্রমা করিয়া বাসায় আসিয়া বিশ্রাম করিলেন। ✗

নারায়ণছাতায় মহাপ্রসাদগ্রহণ

এইরূপ নব নব ভাবে বিভাবিত হইয়া ইঁহারা শ্রীধামে বিচরণ করিতে লাগিলেন। একদিন সিংহদ্বারে ইঁহাদের কীর্ত্তন হইতেছে, এমন সময় গৌরচরণ চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক ব্রাহ্মণযুবক আসিয়া

ই‍ঁহাদের কীর্ত্তনে যোগদান করিলেন। এইরূপ নবনব অনুরাগী ভক্ত-বৃন্দদ্বারা ক্রমে ই‍ঁহাদিগের দল পুষ্ট হইতে লাগিল। একদিন নারায়ণ-ছাতায় মহোৎসব হইতেছিল। বড় বাবাজী মহাশয় সদলবলে বড়দাণ্ড* দিয়া নাম করিতে করিতে যাইতেছেন, এমন সময় ভগবান্ দাস মহান্ত বাবাজী মহাশয় ই‍ঁহাদিগকে মহাপ্রসাদ পাইবার জন্য ডাকিলেন। ই‍ঁহারা অতিশয় হৃষ্টচিত্তে মহান্ত বাবাজী মহাশয়কে প্রণাম করিয়া রাস্তায় দাঁড়াইলেন। ই‍ঁহাদের বেশভূষা ও ব্যবহার দেখিলে কেহ কাঙ্গালী ভিন্ন অপর কিছু বলিয়া বুঝিতে পারিত না। কাঙ্গালের স্থান চিরদিনই পথের ধারে। সুতরাং রাস্তার উপর ভিন্ন অন্য কোন স্থানে ই‍ঁহাদিগের ভাগ্যে বসিবার স্থান জুটিল না। কিছুক্ষণ পরে মহান্ত বাবাজী একখানি ছেঁড়া পাতা আনিয়া বড় বাবাজী মহাশয়কে দিলেন। একে রাস্তায় ধুলা, তাহাতে আবার ছেঁড়া পাতা। কি করিয়া প্রসাদ পাইবেন! নিরুপায় দেখিয়া বড় বাবাজী মহাশয়ের প্রিয়-সঙ্গী নবদ্বীপ দাস নিজ বহির্ব্বাসখানি খুলিয়া তাহার উপর সেই ছেঁড়া পাতাখানা বিছাইয়া দিলেন। মহান্ত বাবাজী ই‍ঁহাদিগকে মহাপ্রসাদ দিতে আসিয়া অযথা তিরস্কার করিতে লাগিলেন,—"বেটারা পেটের জ্বালায় কাঙ্গাল সাজিয়া বৈষ্ণবের ধর্ম্ম একেবারে নষ্ট করিল।" ইত্যাদি শ্লেষবাক্যসকল প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। বড় বাবাজী মহাশয়ের অপর তিনজন সঙ্গীর ভাগ্যে আর পাতা জুটিল না। তিনি হাসিতে হাসিতে মহান্ত মহাশয়কে কহিলেন, "বাবা, আমরা ত বৈষ্ণব নই; বৈষ্ণব হইতে পারিব সে আশাও করি না। যেন আপনাদিগের মত বৈষ্ণবের দাসানুদাস হইতে পারি, এই আশীর্ব্বাদ করুন। এই তিন মূর্ত্তিকে যদি মহাপ্রসাদ দিতে ইচ্ছা করেন, তবে অনুগ্রহ করিয়া আমার

* বড় রাস্তা।

এই পাতাতেই সকলকে দিন। আমি সকলকে বাঁটিয়া দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইব।” যদিও মহান্ত বাবাজী প্রথমতঃ একটু বিরক্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু বড় বাবাজী মহাশয়ের মধুময় বাক্যে তাঁহার হৃদয় একেবারে গলিয়া গেল। তখন তিনি সলজ্জভাবে মহাপ্রসাদ আনিয়া বড় বাবাজী মহাশয়ের পাতায় অনেক করিয়া দিলেন। তিনিও সমস্ত মহাপ্রসাদ একত্র মাখিয়া প্রেমানন্দে সকলকে এক এক গোলা করিয়া বাঁটিয়া দিলেন। ইঁহারা সকলেই যথালাভে সন্তুষ্ট; কাজে কাজেই যাহা পাইলেন, তাহাতেই পরমানন্দিত হইলেন।

জগন্নাথবল্লভে স্থিতি

বড় বাবাজী মহাশয় নীলাচলে সগণে পরমানন্দে বিহার করিতেছেন, কীর্ত্তনতরঙ্গে শ্রীক্ষেত্র ডুবুডুবু হইল। ইঁহারা একদিন নরেন্দ্র সরোবরে স্নানাদি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীজগন্নাথ দেবের শ্রীমন্দিরে যাইতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, জগন্নাথবল্লভ মঠ হইতে রূপার ছাতা, চামর, আশা সোটা প্রভৃতি বাহির হইতেছে। দেখিতে দেখিতে তাহার পশ্চাতে একটী সন্ন্যাসী রৌপ্য-পাদুকা পায়ে দিয়া বাহির হইলেন। পার্শ্বস্থ কোন ব্যক্তিকে এই সন্ন্যাসীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, “এই মহাপুরুষের নাম ভূতনাথ স্বামী। সম্প্রতি জগন্নাথবল্লভের কার্য্যাদি উঁহারই তত্ত্বাবধানে চলিতেছে।” বড় বাবাজী মহাশয় সসম্ভ্রমে সঙ্গিগণসহ সন্ন্যাসী ঠাকুরকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুরও হাত তুলিয়া “নারায়ণ” বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। ইঁহারা একটু পাশ কাটিয়া পরমানন্দে কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শনে চলিলেন। কিছুদূর যাইতে না যাইতেই স্বামীজী একটী লোকদ্বারা ইঁহাদিগকে ডাকাইলেন। যদিও ইঁহারা

শ্রীমন্দিরে দেবদর্শনে যাইতেছেন—ফিরিবার ইচ্ছা নাই, তথাপি পাছে লোকে তাঁহাদিগকে অভিমানী মনে করিয়া বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের প্রতি কটাক্ষ করে, তাই অনিচ্ছাসত্বেও ফিরিলেন এবং পূর্ব্ববৎ স্বামীজীকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। এবার কিন্তু স্বামীজীর ভাব অন্যরূপ দেখিলেন। হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ না করিয়া তিনি "নমো নারায়ণায়" বলিয়া ইঁহাদিগকে প্রতি নমস্কার করিয়া বলিলেন, "মহাত্মন্! আপ্ কাঁহা রহতে হো?"

বড় বাবাজী। বাবা, আমাদের বাসের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই, তবে কয়েক দিন হইতে আমরা গণেশ মাহাস্তির বৈঠকখানায় আছি।

স্বামীজী। আরে আপ্‌তো মহাত্মা হ্যায়, আপ্‌কে দর্শন কর্‌কে হামারি চিত্ত প্রসন্ন হুয়া হ্যায়। হামারে দিল্‌মে ঐসে মালুম হোতা হ্যায়, কি জগন্নাথ মিশ্রকে পুত্র যো কৃষ্ণচৈতন্য থে, আপ্ উন্‌কে অন্তরঙ্গ সঙ্গী, কিন্তু ভাবমে আপ্ উন্‌কো সব জাল কর্‌লিয়া। আপ্‌তো জাল চৈতন্য হ্যায়। হাম্ সন্ন্যাসী হ্যায়, আপ্ বৈষ্ণব হোঁ। গৃহস্থকা ঘরমে রহেনা আপ্‌কো আচ্ছা নাহি হ্যায়, যাও হামারি জগন্নাথবল্লভমে এক কুঠরী লেকে আনন্দমে কীর্ত্তন করো।

বড় বাবাজী। মহাত্মন্, আপনার আদেশ শিরোধার্য্য।

এই বলিয়া পুনরায় সংকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীমন্দিরে গমন করিলেন। ইহার পর দুইদিন কাটিয়া গেল। তিনদিনের দিন ইঁহারা গণেশকে বলিয়া স্বামীজীর আদেশমত জগন্নাথবল্লভে একটী কুঠরীতে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ভূতনাথ স্বামীর বড় আনন্দ। তিনি ইঁহাদের উপর বড়ই প্রসন্ন। ইহাদের 'উদরঝোলা করপাত্র'। সেইদিন হইতে ইঁহারা যেখানে সেখানে মহাপ্রসাদ পাইয়া জগন্নাথবল্লভে আসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণানন্দদাসের সহ মিলন

একদিন একটী জটাজূটধারী বাঙ্গালী সাধুর সহিত বড় বাবাজী মহাশয়ের দেখা হইলে, সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত ?"

বড় বাবাজী। আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত।

সাধু। গৌড়ীয় শব্দের অর্থ কি ?

বড় বাবাজী। গৌড়দেশবাসী। কিন্তু আমি উহাকে 'গৌড়ীয়' না বলিয়া 'গৌরীয়' বলি। কারণ এই সম্প্রদায়টি গৌরসম্বন্ধীয় সম্প্রদায়। এটী আমার নিজের মনের কথা।

সাধু। গৌর কে ?

বড় বাবাজী। গৌর পূর্ণ, পূর্ণতম সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন। কলিতে প্রচ্ছন্ন অবতার।

সাধু। ইঁহার জন্মাদি আছে কি ?

বড় বাবাজী। আছে বৈকি মহাশয় ! শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীশ্রীশচী-দেবীর গর্ভে বৈদিকশ্রেণী পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে শ্রীগৌরাঙ্গদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার পিতার নাম শ্রীশ্রীজগন্নাথ মিশ্র ঠাকুর।

সাধু। মহাশয়, আপনি যদি অসন্তুষ্ট না হন, তবে আমি কয়েকটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

বড় বাবাজী। মহাশয়, নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারেন, আমরা নিত্যানন্দদাস ; আমাদের কাহারও উপর অসন্তুষ্ট হইবার অধিকার নাই ; স্বচ্ছন্দে বলুন।

সাধু। মহাশয়, যিনি পূর্ণপূর্ণতম ভগবান্, তাঁহার কি আবার জন্মাদি সম্ভবে ?

বড় বাবাজী। ভগবান্ জীব উদ্ধারের জন্য নানারূপ ধারণ করিয়া ধর্ম্মের সংস্থাপন ও অধর্ম্মের বিনাশ করিয়া থাকেন। তিনি লীলাময়; যখন তাঁহার লীলা করিবার ইচ্ছা হয়, তখন তিনি স্বয়ং মানবরূপে অবতীর্ণ হইয়া লীলাপ্রকাশ করিয়া থাকেন। যথা শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, শ্রীগৌরচন্দ্র ইত্যাদি।

সাধু। এ সকল কথা কেবল মুখের কথায় ত কেহ বিশ্বাস করিবে না। যদি কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেখাইতে পারেন, তবে লোকে বিশ্বাস করিতে পারে।

বড় বাবাজী। মহাশয়, এ বিষয়ে বহু বহু শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে, সে সকল আপনাকে পরে দেখাইব। কিন্তু আমি প্রথমে আপনাকে একটী প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাইতেছি। আমার নিতাইগৌরের ভুবনমোহন সর্ব্বচিত্তাকর্ষক অপরূপ রূপ দেখিয়া যদি তাঁহাদিগকে প্রাকৃত মানুষ বলিয়া আপনার জ্ঞান হয়, তবে শাস্ত্র দেখিবেন। আমার মতে শাস্ত্র-যুক্তি পরোক্ষ প্রমাণ। যাঁহার শ্রীমূর্ত্তি দেখিবামাত্রই অতিবড় পাষণ্ডীরও মনপ্রাণ তাঁহার চরণে আকৃষ্ট হয় এবং যাঁহার অদ্ভুত লীলাকথা—অসীম গুণের কথা শ্রবণে হৃদয় একেবারে বিমুগ্ধ হইয়া যায়, আমি তাঁহাকেই রসময়বিগ্রহ পূর্ণপূর্ণতম ভগবান্ বলি।

সাধু। আচ্ছা, যদি কোনও লম্পট পুরুষ কোন সুন্দরী যুবতী দর্শনে আকৃষ্ট হয়, তবে তাহাকে কি আপনি ঈশ্বর বলিতে চান?

বড় বাবাজী। না, তা কখনই নয়। কারণ সেই সুন্দরী যুবতী নিজ ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থের সাধিকা বলিয়া লম্পট যুবক তাহাকে ভালবাসে এবং তাহাতে আকৃষ্ট হয়। হঠাৎ যদি কোন কারণে তাহার সেই সুন্দর মূর্ত্তিখানি কদাকার হইয়া যায়, তবে কি সেই যুবক তাহাকে ভালবাসিতে পারে?

সাধু। এ কথা ঠিক; কারণ সে কেবল রূপলোলুপ কামুক পুরুষ বই ত নয়! রূপযৌবনের অভাব হইলেই তৎপ্রতি আকর্ষণের অভাব হইবে, ইহা ত নিশ্চিত।

বড় বাবাজী। তবে আপনিই বুঝিয়া দেখুন, কামে এবং প্রেমে কত প্রভেদ। কাম রূপলালসাসম্ভূত; রূপের অভাবে কামের অস্তিত্ব থাকে না। প্রেম কাম হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্তু। উহা নির্ম্মল, নির্হেতুক ভালবাসা, রূপগুণের ধার ধারে না। এমন কি, প্রেমের পাত্রের অভাব হইলেও উহার হ্রাস হয় না; বরঞ্চ বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। বিরহেই প্রেমের জ্বলন্ত বিকাশ দৃষ্ট হয়। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু যে পূর্ণ পূর্ণতম সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন, এ বিষয়ে ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। তন্মধ্যে দু'চারিটী আপনাকে বলিতেছি।

বাসুদেব সার্ব্বভোম বলিয়াছেন—

কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥

কলিপ্রভাবে নিজ ভক্তিযোগ বিনষ্টপ্রায় দেখিয়া তাহাকে প্রকাশ করিবার জন্য কৃষ্ণচৈতন্য নাম ধারণপূর্ব্বক যিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন, আমার মনোমত্তমধুকর তাঁহার পাদপদ্মে লীন হউক।

সহস্রনামস্তোত্রে বলিয়াছেন—

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ॥

হে প্রভো! তুমি সুবর্ণবর্ণ অর্থাৎ কৃষ্ণরূপবর্ণনাকারী, গৌরাঙ্গ, সুন্দরকান্তি, চন্দনবলয়াদিভূষিত, সন্ন্যাসী, ভগবন্নিষ্ঠ, সুশীল এবং নিবৃত্তি ও শান্তিপরায়ণ

বিশ্বসারতন্ত্রে উত্তর খণ্ডে একাদশ পটলে :—

গঙ্গায়া দক্ষিণে ভাগে নবদ্বীপে মনোরমে,
কলিপাপবিনাশায় শচীগর্ভে সনাতনি।
জনিষ্যতি প্রিয়ে, মিশ্রপুরন্দরগৃহে স্বয়ম্,
ফাল্গুনে পৌর্ণমাস্যাঞ্চ নিশায়াং গৌরবিগ্রহঃ॥

হে প্রিয়ে, কলিকলুষবিনাশের নিমিত্ত গঙ্গার দক্ষিণ তীরবর্ত্তী অতি মনোরম নবদ্বীপ গ্রামে ফাল্গুনী পূর্ণিমানিশিতে মিশ্র পুরন্দরগৃহে শচীদেবীর গর্ভে স্বয়ং ভগবান্ গৌররূপে অবতীর্ণ হইবেন।

অনন্তসংহিতায় :—

বৃন্দাবনে সদা কৃষ্ণমানন্দসদনে মুদা।
বামে চ রাধিকা দেবী স্থিত্বা রময়তে প্রিয়ে॥
নবদ্বীপে চ স কৃষ্ণ আদায় হৃদয়ে স্বয়ং।
গজেন্দ্রগমনাং রাধাং সদা রময়তে মুদা॥
ললিতাদ্যাশ্চ যাঃ সখ্যঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ শিবে।
সেবন্তে নিজরূপেণ বৃন্দারণ্যে চ তৌ সদা॥
নবদ্বীপে তু তাঃ সখ্যো ভক্তরূপধরাঃ প্রিয়ে।
একাঙ্গং শ্রীগৌরহরিং সেবন্তে সততং মুদা॥
স এব রাধিকাকৃষ্ণঃ স এব গৌরবিগ্রহঃ।
যচ্চ বৃন্দাবনং দেবি নবদ্বীপঞ্চ তৎ শুভম্॥
বৃন্দাবনে নবদ্বীপে ভেদবুদ্ধিশ্চ যো নরঃ।
তথৈব রাধিকাকৃষ্ণে শ্রীগৌরাঙ্গে পরাত্মনি॥
মচ্ছূলপাতনির্ভিন্নদেহঃ সোঽপি নরাধমঃ।
পচ্যতে নরকে ঘোরে যাবদাহূতসংপ্লবম্॥

দেবাদিদেব মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন :—হে প্রিয়ে, পরমানন্দময়

শ্রীবৃন্দাবনধামে মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধিকা দেবী বামে থাকিয়া যে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে উপভোগ করিয়া থাকেন, সেই কৃষ্ণচন্দ্র নবদ্বীপে গজেন্দ্র-গামিনী রাধিকাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া পরমানন্দ উপভোগ করিবেন। যে ললিতাদি সখীগণ শ্রীবৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণকে সেবা করিয়া থাকেন, তাঁহারাই ভক্তরূপ ধারণ করিয়া নবদ্বীপে রাধাকৃষ্ণ মিলিততনু গৌরাঙ্গদেবকে সেবা করিবেন। যেই রাধাকৃষ্ণ, সেইই গৌরাঙ্গ; যেই বৃন্দাবন, সেইই নবদ্বীপ; যেই সখী মঞ্জরীগণ, সেইই গৌরভক্তগণ॥ ইহাতে যে মনে ভেদবুদ্ধি করিবে, সে নরাধম আমার শূলাঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়া মহাপ্রলয়কাল পর্য্যন্ত ঘোর নরকে বাস করিবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে নন্দ মহারাজের প্রতি গর্গমুনি-বাক্য :—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহস্য গৃহ্নতোহনুযুগং তনুম্।
শুক্লোরক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥

গর্গমুনি কহিলেন,—হে নন্দ মহারাজ, তোমার এই পুত্র প্রতিযুগে শরীর ধারণ করিয়া থাকে। কখনও শুক্লবর্ণ, কখনও রা রক্তবর্ণ। সংপ্রতি কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে। ভবিষ্য কলিযুগে আবার পীতবর্ণ ধারণ করিবে।

কপিল তন্ত্রে :—

জম্বুদ্বীপে কলৌ ঘোরে মায়াপুরে দ্বিজালয়ে।
জনিত্বা পার্ষদৈঃ সার্দ্ধং কীর্ত্তনং প্রকটিষ্যতি॥

ঘোর কলিকালে ভগবান্ জম্বুদ্বীপান্তর্গত মায়াপুর নামক স্থানে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া সপার্ষদে নাম সংকীর্ত্তন প্রকট করিবেন।

কুলার্ণবতন্ত্রে হরপার্ব্বতী-সংবাদে :—

ততঃ কালে চ সংপ্রাপ্তে কলৌ কোহপি মহানিধিঃ।
হরিনামপ্রকাশায় গঙ্গাতীরে জনিষ্যতি॥

ঘোর কলিপ্রভাবে ধর্ম্মের ক্ষীণতা এবং অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া ধর্ম্মসংস্থাপন মানসে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অগোচর সাক্ষাৎ ভগবান্ কালোচিত হরিনাম প্রকাশের জন্য গঙ্গাতীরে জন্মগ্রহণ করিবেন।

অনন্তসংহিতায় :—

গৌরী শ্রীরাধিকা দেবী হরিঃ কৃষ্ণঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
একত্বাচ্চ তয়োঃ সাক্ষাদিতি গৌরহরিং বিদুঃ॥

'গৌরী' শব্দে শ্রীরাধিকাকে বুঝায় এবং 'হরি' শব্দে শ্রীকৃষ্ণকে বুঝায়। অতএব 'গৌরহরি' বলিলে রাধাকৃষ্ণ-মিলিততনু ব্যতীত আর কিছুই বুঝায় না।

সাধনোল্লাসতন্ত্রে :—

শচীসুতচ্ছলাৎ কৃষ্ণঃ কলাববতরিষ্যতি,
যা কালী সৈব তারা স্যাৎ যা তারা ত্রিপুরা হি সা।
ত্রিপুরা যা মহাদেবী সৈব রাধা ন সংশয়ঃ,
যা রাধা সৈব কৃষ্ণঃ স্যাৎ যঃ কৃষ্ণঃ স শচীসুতঃ॥

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কলিকালে শচীসুতরূপে অবতীর্ণ হইবেন। যিনি কালী তিনিই তারা। আবার যিনি তারা, তিনিই ত্রিপুরা। এইরূপ মহাদেবী ত্রিপুরাই শ্রীরাধিকা। যিনি রাধিকা, তিনিই কৃষ্ণ। যিনি কৃষ্ণ, তিনিই গৌরাঙ্গদেব। ইহাতে কিছুমাত্র ভেদ নাই।

কৃষ্ণযামলে :—

গৌরাঙ্গো নাদগম্ভীরঃ স্বনামামৃতলালসঃ।
দয়ালুঃ কীর্ত্তনগ্রাহী ভবিষ্যতি শচীসুতঃ॥

পূর্ণ পূর্ণতম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কলিযুগে তপ্ত-কাঞ্চনকান্তি, জলদগম্ভীর মধুরভাষী, নিজনামামৃতাস্বাদনলোলুপ, পরমদয়াল, সংকীর্ত্তন-পরায় শচীসুতরূপে অবতীর্ণ হইবেন।

ব্রহ্মযামলে :—

কলৌ পূর্ণানন্দস্ত্রিভুবনবিজয়ী গৌরসুতনু-
র্নবদ্বীপে জাতঃ সুরধুনিসমীপে নরহরিঃ।
দদৎ পাপিভ্যঃ সংস্তুতমতির্হরের্নাম সুকৃতং
তরিত্বা পাপাব্ধিং ভুবি বিজয়তে শ্রীগৌরচন্দ্রাভিধঃ ॥

কলিকালে সচ্চিদানন্দময়, ত্রিভুবনবিজয়ী, কাঞ্চনকান্তি, শ্রীগৌরচন্দ্র-নামক নরনারায়ণ সুরধুনীতীরবর্ত্তী নবদ্বীপধামে অবতীর্ণ হইয়া মহাপাপীদিগকে হরিনামরূপ সুকৃতদানে পাপসাগর হইতে উদ্ধারপূর্ব্বক জগতে জয়যুক্ত হইবেন।

বন্দে গৌরাবতারং কলিমলমথনং শ্রীনবদ্বীপবাসং
কণ্ঠে মালাং দধানং শ্রুতিযুগবিলসৎ স্বর্ণসংসক্তগণ্ডং।
কেয়ূরাঙ্গদদিব্যরত্নঘটিতং বাহুদ্বয়ে বিভ্রতং
ভক্তেভ্যো দদতং মলাপহরণং নামাপি সর্ব্বং হরেঃ॥

যাহার আজানুলম্বিত বাহুযুগল অঙ্গদবলয়াদিভূষিত, কণ্ঠে সুগন্ধ মালা বিরাজিত, শ্রুতিযুগে সুবর্ণকুণ্ডলভূষিত, ঈষদ্রক্তিম গণ্ডস্থল, ভক্তগণের বহুজন্মার্জ্জিত দুষ্কৃতিহারী মঙ্গলময় হরিনাম বিতরণকারী, কালকলুষহারী, নবদ্বীপবিহারী সেই শ্রীগৌরহরিকে বন্দনা করি।

বায়ুপুরাণে ভগবদুক্তি :—

কলৌ সংকীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ।
স্বর্নদীতীরমাস্থায় নবদ্বীপে জনাশ্রয়ে।
তত্র দ্বিজকুলশ্রেষ্ঠে শুদ্ধসত্ত্বে দ্বিজালয়ে।

আমি কলিযুগে যুগোচিত নাম সংকীর্ত্তন প্রচারের নিমিত্ত, বহুজন-সমাকীর্ণ, গঙ্গাতীরবর্ত্তী নবদ্বীপধামে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণকুলে শচীদেবীর পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইব।

জৈমিনিভারতে—

কলৌ কৃষ্ণাবতারোঽপি গূঢ়ঃ সন্ন্যাসরূপধৃক্

কৃষ্ণাবতার হইলেও ইনিই কলিযুগে প্রচ্ছন্নভাবে অবতীর্ণ হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন।

সৌরপুরাণে—

সুপূজিতঃ সদা গৌরঃ কৃষ্ণো বা বেদবিদ্ দ্বিজঃ।

এই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই বৈদিক ব্রাহ্মণ হইয়া গৌরাঙ্গরূপে জগতে পূজিত হইবেন।

ছান্দোগ্য-উপনিষদে—

অথ ব্রহ্মপুরং নাম পুণ্ডরীকং যদুচ্যতে।
তদেবাষ্টদলং পদ্মসন্নিভং পুরমদ্ভুতম্॥
তন্মধ্যে দহরং সাক্ষাৎ মায়াপুর ইতীর্য্যতে।
তত্র বেশ্ম ভগবতশ্চৈতন্যস্য পরাত্মনঃ॥

এই উপনিষদে যাহাকে ব্রহ্মমণ্ডল বলিয়া কথিত হইতেছে, উহাই অষ্টদলপদ্ম সদৃশ পরম ধাম। তন্মধ্যে মায়াপুর নামক স্থানই পরমাত্মা ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবস্থান।

চৈতন্য-উপনিষদে—

রহস্যং তে বদিষ্যামি "জাহ্নবীতীরে নবদ্বীপে গোলোকাখ্যে ধাম্নি গোবিন্দো দ্বিভুজো গৌরঃ সর্ব্বাত্মা মহাপুরুষঃ মহাত্মা মহাযোগী ত্রিগুণাতীতঃ সত্ত্বরূপো ভক্তিং লোকে কাশ্যতীতি।"

মহাদেব বলিলেন,—হে দেবি, আমি তোমাকে পরমগুহ্য কথা বলিতেছি। গোলোকধামে যিনি সচ্চিদানন্দ গোবিন্দ, তিনিই গঙ্গাতীর নবদ্বীপধামে দ্বিভুজ, সর্ব্বান্তর্যামী, মহাত্মা, মহাযোগী, ত্রিগুণাতীত, সত্ত্বস্বরূপ মহাপুরুষ গৌরাঙ্গরূপে জগতে প্রেমভক্তি বিতরণ করিবেন।

ঊর্দ্ধাম্নায় সংহিতায় :—

সঙ্কো কৃষ্ণো বিভুঃ পশ্চাদ্দেবক্যাং বসুদেবতঃ।

কলৌ পুরন্দরাৎ শচ্যাং গৌররূপো বিভুঃ স্মৃতঃ॥

দ্বাপরযুগে যিনি বসুদেব হইতে দেবকীর গর্ভে ভগবান্ কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তিনিই কলির প্রথম সন্ধ্যায় মিশ্রপুরন্দর হইতে শচীদেবীর গর্ভে ভগবান্ গৌরাঙ্গরূপে প্রকট হইবেন।

ব্রহ্মপুরাণে :—

কলেঃ প্রথমসন্ধ্যায়াং লক্ষ্মীকান্তো ভবিষ্যতি।

দারুব্রহ্মসমীপস্থঃ সন্ন্যাসী গৌরবিগ্রহঃ॥"

লক্ষ্মীকান্ত ভগবান্ কলির প্রথম সন্ধ্যায় গৌরবর্ণ সন্ন্যাসীরূপ ধারণ করিয়া দারুব্রহ্মসমীপস্থ হইবেন।

পদ্মপুরাণে :—

কলেঃ প্রথমসন্ধ্যায়াং গৌরাঙ্গোঽহং মহীতলে।

ভাগীরথ্যাস্তটে ভূয়ো ভবিষ্যতি সনাতনঃ॥

এই সনাতন শ্রীকৃষ্ণ কলির প্রথম সন্ধ্যায় শ্রীগৌরাঙ্গরূপে ভাগীরথীতীরে পুনর্ব্বার অবতীর্ণ হইবেন।

গরুড়পুরাণে :—

শুদ্ধো গৌরঃ সুদীর্ঘাঙ্গো গঙ্গাতীরসমুদ্ভবঃ।

দয়ালুঃ কীর্ত্তনগ্রাহী ভবিষ্যামি কলৌ যুগে॥

আমি কলিযুগে শুদ্ধ গৌরবর্ণ অর্থাৎ তপ্তকাঞ্চন-কান্তি, চতুর্হস্তপরিমিত-দেহ হইয়া গঙ্গাতীরস্থ নবদ্বীপে আবির্ভূত হইব।

জৈমিনিভারতে :—

ভক্তিযোগপ্রকাশায় লোকস্যানুগ্রহায় চ।

সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিত্য কৃষ্ণচৈতন্যরূপধৃক্॥

আমি কলিযুগের লোকসকলকে অনুগ্রহ করিয়া ভক্তিযোগ প্রকাশের নিমিত্ত সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামধারী হইব।

শিবপুরাণে :—

দিবিজা ভুবি জায়ধ্বং জায়ধ্বং ভক্তরূপিণঃ।
কলৌ সংকীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ॥

হে দেবগণ, তোমরা এই কলিকালে ভক্তরূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ কর। আমিও সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তন জন্য শচীনন্দনরূপে অবতীর্ণ হইব।

শ্রীমদ্ভাগবতে :—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

অন্তরে কৃষ্ণবর্ণ, অঙ্গকান্তি অকৃষ্ণ অর্থাৎ সুবর্ণবর্ণ অথবা সুবর্ণবর্ণ অর্থাৎ কৃষ্ণনামগ্রাহী এবং তাঁহার সাঙ্গ, উপাঙ্গ ও পারিষদগণকে সুমেধাগণ সংকীর্ত্তন-যজ্ঞের দ্বারা উপাসনা করিবেন।

নৃসিংহপুরাণে :—

সত্যে দৈত্যকুলাদিনাশনসময়ে স্ফূর্জ্জন্নরকেশরী
ত্রেতায়াং দশকন্ধরং পরিভবন্ রামাভিনামাকৃতিঃ।
গোপালং পরিপালয়ন্ ব্রজপুরে ভারং হরন্ দ্বাপরে
গৌরাঙ্গঃ প্রিয়কীর্ত্তনঃ কলিযুগে চৈতন্যনামা হরিঃ॥

শ্রীহরি সত্যযুগে দৈত্যকুলাধিপতি হিরণ্যকশিপুকে নাশ করিবার জন্য নরসিংহরূপে প্রকট হইয়াছিলেন। ত্রেতাযুগে দশস্কন্ধ রাবণকে পরাভব করিবার জন্য রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। দ্বাপরযুগে পৃথিবীর ভারহরণ করিবার জন্য গোপাল নাম ধারণ করিয়া ব্রজপুরে গোপালন করিয়াছিলেন। তিনিই কলিযুগে পাষণ্ডদলন ও হরিনাম

প্রচার করিবার জন্য গৌরাঙ্গরূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম ধারণ করিয়াছেন।

এইরূপ বহু বহু শাস্ত্র-প্রমাণদ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পূর্ণ পূর্ণতমত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে। আমি আপনাকে আর কয়টি বলিব?

এইরূপভাবে তিনদিন যাবৎ সাধুর সহিত নানারূপ বিচারের প সাধুর মনে শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিল। গৌরভক্তের সঙ্গ-প্রভাবে তাঁহার নবজীবন লাভ হইল। তখন সাধু, বড় বাবাজী মহাশয়ের চরণে নিপতিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "গুরো! আমি এতকাল বৃথা সময় নষ্ট করিয়াছি; আমি ঘোর নাস্তিক এবং পাষণ্ড। আপনাকে দর্শন করিয়া আমি পবিত্র হইলাম। এক্ষণে আপনি আমাকে কৃপা করুন। আর যেন আমার বৃথা সময় নষ্ট না হয়; আমি যেন পরম দয়াল নিতাইগৌরের দাসানুদাস হইতে পারি। ইহা ভিন্ন আমার আর কোন আশা নাই।"

বড় বাবাজী মহাশয় প্রেমার্দ্রহৃদয়ে সাধুকে প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতকৃতার্থ করিলেন এবং মধুর বচনে কহিলেন,—"ভাই, ধন্য কলিকাল কলিহত জীবের পরম সৌভাগ্য। কলিপাবনাবতার পরম দয়াল শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর তোমাকে অবশ্যই কৃপা করিবেন। ভয় কি? নিতাইচাঁদ যে আমার অদোষদরশী। তিনি যে অবিচারে প্রেমধন দান করেন। তাঁহার পদাশ্রয় গ্রহণ কর; তোমার সকল দুঃখ দূর হইবে। মনে পরম শান্তি লাভ করিবে।" বড় বাবাজী মহাশয়ে এই করুণাপূর্ণ, আশাপ্রদ, মধুর কথা কয়টি শুনিয়া সাধুর প্রাণে অনুতাপানল ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তিনি উন্মত্তের ন্যায় "হ নিতাই, জয় নিতাই" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার ধৈর্য্যের বাঁধ একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিতেছেন না। অতিকষ্টে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাটাইলেন। মধ্যে

মধ্যে "হা নিতাই, জয় নিতাই" বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছেন। রাত্রি প্রভাত হইলে তিনি মস্তক মুণ্ডনপূর্ব্বক স্নান করিয়া বড় বাবাজী মহাশয়ের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। মন্ত্রগ্রহণের নিমিত্ত অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিলে বড় বাবাজী মহাশয় তাঁহার ঐকান্তিক আর্ত্তি দেখিয়া নিতাইচাঁদের আদেশ মনে করত তাঁহার কর্ণে মন্ত্র প্রদান করিলেন। এই সাধুটীর নাম কৃষ্ণপ্রেমানন্দ দাস। ইনিই বড়বাবাজী মহাশয়ের আদেশে পূজ্যপাদ প্রেমানন্দ ভারতী মহাশয়ের সঙ্গে আমেরিকায় গমন করিবার সময় পথে দেহত্যাগ করেন।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পাদপদ্মচিহ্ন স্থানান্তরিতকরণ

ক্রমে বড় বাবাজী মহাশয়ের উপর শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি পড়িতে লাগিল। তখনকার স্থানীয় মুন্সেফ্ বাবু কিশোরীমোহন সেন, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু জগৎচন্দ্র রায় প্রভৃতি অনেক ভদ্রলোক ইঁহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইলেন। এমন কি, তাঁহারা ইঁহাকে একদিন না দেখিলে অস্থির হইতেন। সর্ব্বদা তাঁহারা ইঁহার সঙ্গ করিতে ভালবাসিতেন।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের জগমোহনে গরুড়স্তম্ভের পশ্চাতে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পাদপদ্মচিহ্ন ছিল। কোন পর্ব্বোপলক্ষে জনতা হইলে ঐ ভববিরিঞ্চিবাঞ্ছিত পদ্মমধনের উপর দিয়া লোক চলাচল করিত। বড় বাবাজী মহাশয় পুরীর রাজাকে বলিয়া ঐ পাদপদ্ম-চিহ্নিত প্রস্তরখানি উঠাইয়া শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের উত্তর দরজায় ছোট একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া সেই মন্দিরে উহা স্থাপন করিলেন।

একটী দশ এগার বৎসরের ব্রাহ্মণবালককে তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আনিয়া নরেন্দ্র সরোবরের নিকটবর্ত্তী কোনও একটি পঞ্চাইতি রামানন্দী

মঠে মহান্ত করিয়া দেন। ভগবদিচ্ছায় উক্ত মহান্ত বালকটী বড় বাবাজী মহাশয়ের দর্শন পাওয়া অবধি তাঁহার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার আনন্দময় সঙ্গসুখাভিলাষী হইয়া দিবারাত্র শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল যে, "হে মহাপ্রভু, আমার বিষয়বন্ধন ঘুচাইয়া দাও। আমি নিরুপাধি হইয়া বড় বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে থাকি।" এই বালকটীর নাম শীতল দাস। তাহার দৈন্য ও আর্ত্তি দেখিলে বা শুনিলে পাষাণ-হৃদয়ও দ্রব হয়। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব এই ভক্ত বালকের প্রতি প্রসন্ন হইয়া উহার বিষয়বন্ধন ঘুচাইবার ইচ্ছা করিলেন।

হঠাৎ একদিন কয়েক মূর্ত্তি রামানন্দী বাবাজী আসিয়া শীতলদাস ও তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে মঠ হইতে বিতাড়িত করিলে মামলা উপস্থিত হইল। বালক কিন্তু শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীচরণে ক্রমাগত জানাইতেছে, যাহাতে তাহার পক্ষে হার হয় এবং তাহার বিষয়ভোগ একেবারে নিবৃত্তি হইয়া যায়। বড় বাবাজী মহাশয়ের প্রিয়সহচর মুন্সেফ্ কিশোরী বাবুর কাছারীতে এই মোকদ্দমার বিচার চলিতেছে। তিনি মনে মনে ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন যে, এই মোকদ্দমায় বালকেরই জিত হইবে। কারণ সাক্ষী প্রমাণ বালকের পক্ষেই বিশেষ অনুকূল। সাক্ষ্যগ্রহণ এবং বিচারাদি সকলই শেষ হইয়া গিয়াছে। কেবল রায় লেখা বাকি। মুন্সেফ্ বাবু পরমভক্ত। তিনি যখন কোন মোকদ্দমার রায় লিখিতে বসেন, তখন দশ পনের মিনিট চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের চরণ ধ্যান করেন এবং তাঁহাকে বিশেষভাবে জানাইয়া তাঁহার আজ্ঞামত রায় লিখেন। এক্ষেত্রেও তিনি তাহাই করিলেন। রায় লেখা হইয়া গেল। কিন্তু তিনি পড়িয়া দেখেন, উহা তাঁহার মনের ভাবের বিপরীত হইয়াছে। বালক মোকদ্দমায় হারিল। ইহাতে মুন্সেফ্ বাবু বড়ই লজ্জিত হইলেন।

কাছারি হইতে আসিয়া তিনি ম্লানমুখে বড় বাবাজী মহাশয়ের নিকট আসিলেন। তাঁহার মুখ দেখিয়াই বোধ হইল, তিনি যেন আজ বড়ই সন্তপ্ত। বড় বাবাজী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিশোরী, তোমার মুখখানি আজ ম্লান কেন? মনে কি কোন তাপ পাইয়াছ?" কিশোরী বাবু বলিলেন, "আজ্ঞে না, বিশেষ কোন তাপের কথা নয়, কিন্তু আমার আজ একটী ধারণার অতীত কাজ হইয়াছে। আমি প্রথম দিন হইতে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম যে, এই মোকদ্দমায় বালকের পক্ষে জিত হইবে। কিন্তু শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে জানাইয়া রায় লেখার পর দেখিলাম যে, তাহার হার হইয়াছে। তাই ভাবিতেছিলাম, বোধ হয় আমি অন্যায় করিয়াছি।" বড় বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "বাবা, জগন্নাথের কৃপায় ঠিক উচিত বিচারই হইয়াছে, কারণ ঐ বালক মামলার পূর্ব্ব হইতে নিয়ত শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে জানাইতেছিল যে, 'হে প্রভু, আমার ঐ মঠের মহান্তগিরিতে কাজ নাই; আমি নির্ব্বিষয় হইয়া নিরুদ্বেগে এই বাবাজীদের সঙ্গে থাকি।' ভক্তবৎসল শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব বালকের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন। ইহাতে তোমার দোষ কি বাবা?"

ইত্যবসরে শীতলদাসকে বাড়ী লইয়া যাইবার জন্য উহার পিতা মাতা, ভ্রাতা ও আত্মীয়স্বজন সকলে বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার ভ্রাতা বালকটীকে ধরিতে যাইবামাত্র সে চীৎকার করিতে করিতে দৌড়িয়া বড় বাবাজী মহাশয়ের নিকট আসিয়া পিতামাতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল, "দেখ, তোমরা আমার আশা পরিত্যাগ করিয়া আমাকে মহান্ত করিয়া দিয়াছিলে। যদি আমি মহান্ত থাকিতাম, তবে তোমরা আমাকে ঘরে লইতে কি? অতএব তোমাদের আমার আশা ত্যাগ করা উচিত। এখন আমি আর

তোমাদের নই। তোমরা আমার গুরুজন, তোমাদেরই কৃপায় আমার সংসারবন্ধন মোচন হইয়াছে। এখন আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমি নির্ব্বিঘ্নে ইঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া ভজন করিতে পারি।" এইরূপ অনেক প্রবোধবাক্যে সে পিতামাতাকে বুঝাইতে লাগিল। সকলে বালকের মুখে এইরূপ বৈরাগ্যপূর্ণ কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। অগত্যা বালকের পিতামাতা তাহার হাত ধরিয়া বড় বাবাজী মহাশয়ের হাতে সমর্পণপূর্ব্বক দুঃখিত হৃদয়ে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। বালকের মনে আজ আনন্দ আর ধরে না। আজ হইতে তাহার সকল চিন্তা দূর হইল। বড় বাবাজী মহাশয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মসেবায় এই শ্রীতলদাসকেই নিযুক্ত করিলেন। একটী ময়রা বন্ধানীপূর্ব্বক কিছু মিষ্টান্ন শ্রীগৌরাঙ্গসেবায় দিতে লাগিল। এইরূপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মসেবা রীতিমতভাবেই চলিতে লাগিল।

বড় বাবাজী মহাশয় একদিন পূর্ব্বোক্ত গৌরচরণ চক্রবর্ত্তীকে নারায়ণছাতার কর্ত্তাবাবাজী মহাশয়ের নিকট ভেক গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন। গৌরচরণ অনেক আপত্তির পর অগত্যা বড় বাবাজী মহাশয়ের আদেশ পালন করিলেন। তাঁহার ভেকের নাম হইল গোবিন্দদাস। এইরূপে এক একজন করিয়া ক্রমে ক্রমে বহু সঙ্গী আসিয়া জুটিতে লাগিল।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা

আজ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা। প্রাতঃকাল হইতে এই উৎসব উপলক্ষে নানাবিধ আয়োজন হইতেছে। স্নানবেদীর উপর নানাবর্ণের চন্দ্রাতপ সুসজ্জিত হইয়াছে। বড় বাবাজী মহাশয় সঙ্গিগণসঙ্গে করতাল ও কাঠের খোল সহযোগে মধুর কীর্ত্তন করিতেছেন। বহুলোকের

সমাগম হইয়াছে। সকলেই আনন্দে উন্মত্ত। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব পহুণ্ডি বিজয়ের পর স্নানবেদীর উপর যাইয়া বসিলে দইতা পাণ্ডাগণ তাঁহাকে স্নান করাইতে আরম্ভ করিলেন। কি মধুর দৃশ্য! কি মনোহারিণী শোভা! চতুর্দ্দিকে বহুবিধ বাদ্যযন্ত্র বাজিতেছে। জয়ধ্বনি, শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনিতে দশদিক্ মুখরিত। এই সময় বড় বাবাজী মহাশয় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মুখচন্দ্র অবলোকন করিয়া ভাবাবেশে পদকীর্ত্তন ধরিলেন :—

"নাচেরে গৌরাঙ্গহরি ভক্তগণ সাথ।
সিনান মণ্ডপে হেরি শ্রীল জগন্নাথ॥
পূরবের ভাবে নাচে শ্রীশচীনন্দন।
জগন্নাথে দেখে যেন ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
বৃন্দাবনমাঝে যেন দেবী পৌর্ণমাসী।
অভিষেক করিছেন পরম হরষি॥
স্বরূপেরে বলে গোরা হাসিয়া হাসিয়া।
হের গো ললিতা তোমার পরাণ বঁধুয়া॥
ভাবের তরঙ্গে গোরা অধীর হইল।
নাচিয়া রাধার ভাবে নাচিতে লাগিল॥
কেহ নাচে কেহ গায় বিভোর হইয়া।
ভূমে পড়ি যায় কেহ প্রেমাবিষ্ট হইয়া॥"

কীর্ত্তন শুনিয়া সকলেই আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন। বড় বাবাজী মহাশয়ের মুখ হইতে যেন ঝঞ্ঝাবাত বহিতেছে! কাহার সাধ্য যে ঐ পদাবলী-সকল মুখস্থ বা লিপিবদ্ধ করে? তাঁহার সঙ্গিগণের মধ্যে কাহারও কাহারও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ যাহা মনে ছিল, তাহাই সংগৃহীত হইল।

ক্রমে বেলা শেষ হইতে লাগিল। প্রেমানন্দে কাহারও সংজ্ঞা নাই।

সকলেই দাদার মুখাপেক্ষী। শ্রীশ্রীজগন্নাথের শ্রীমুখপানে চাহিয়া চোখের জলে বড় বাবাজী মহাশয়ের মুখ বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। তিনি ফুকারিয়া ফুকারিয়া কাঁদিতেছেন এবং শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে লক্ষ্য করিয়া কতই কি বলিতেছেন। কখনও অভিমান, কখনও দৈন্য, কখনও বা আক্ষেপ করিয়া কত পদ গাহিতেছেন। সে সকল পদের ভাবই বা কি অপূর্ব্ব! দর্শকবৃন্দ কাহাকে দেখিবেন? জগন্নাথদেবকে, না বড় বাবাজী মহাশয়কে? দুইই সমান চিত্তাকর্ষক, দুইজনেই সমভাবে সকলের মনপ্রাণ হরণ করিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে ভক্তগণের আগ্রহে অগত্যা কীর্ত্তন সমাপ্ত করিতে বাধ্য হইলেন। তখন মহাপ্রসাদ আসিয়া উপস্থিত হইলে ঐ স্নানবেদীর উপরই পঙ্গত হইতে লাগিল। কি আনন্দ! আনন্দঘন লীলাময় বিগ্রহ প্রভু আমার, যখন যে লীলা করিতেছেন, তাহাতেই যেন আনন্দের পাথার বহিয়া যাইতেছে। কেহ কাহারও মুখে প্রসাদ তুলিয়া দিতেছে; কেহ বা কাহারও মুখ হইতে কাড়িয়া খাইতেছে। সকলেই যেন বাল্যভাব প্রাপ্ত হইলেন। হুড়াহুড়ির চূড়ান্ত হইতে লাগিল। কিন্তু কাহারও মনে কোনও প্রকার বিকার নাই। পিতা পুত্রে এক সঙ্গে বসিয়া আনন্দ করিতেছে। জাতিবিচার একেবারেই নাই। সকলেরই মন নির্ব্বিকার। যথাসময়ে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। আজ হইতেই শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মণিকোঠার দ্বার বন্ধ হইল; আর দর্শন নাই। এই দর্শনাভাবেরই নামান্তর অনবসর।

আলালনাথ যাত্রা

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের অনবসরকালে সকলেরই মন মলিন। সকলেই নীলাচলনাথের বিরহে কাতর। সাধুবৈষ্ণবগণ ব্যাকুলমনে শ্রীধাম ত্যাগ

করিয়া অন্যত্র যাইবার মনস্থ করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই সময়ে আলালনাথে যাইতেন; তাই ভক্তবৃন্দ তাঁহার অনুকরণ করিলেন। বহুলোক একত্রিত হইয়া খোল করতালযোগে কীর্ত্তন করিতে করিতে আলালনাথ যাত্রা করিলেন। এই কার্য্যের প্রধান উদ্যোগী অর্জ্জুন সাঁতরা; কারণ তাহার নিজবাড়ী আলালনাথ যাইবার পথে। উহার আন্তরিক অভিলাষ যে, একবার ইঁহাদিগকে শিউড়ী মহাবীর দর্শন করাইয়া একরাত্রি নিজবাড়ীতে রাখিয়া পরে আলালনাথে লইয়া যায়। বড় বাবাজী মহাশয়ের নিকট এই প্রস্তাব উত্থাপন করিলে তিনিও তাহাতে সম্মত হইলেন। কাজে কাজেই একটু ঘুরিয়া শিউড়ী মহাবীরের দর্শনার্থ গমন করিলেন। সেইদিন তাঁহারা ভক্তপ্রবর অর্জ্জুন সাঁতরার বাড়ীতেই থাকিলেন। তথায় বিশেষরূপ কীর্ত্তনানন্দে রাত্রি কাটিয়া গেল। পরদিন প্রভাতে সকলেই আলালনাথ যাত্রা করিলেন। আনন্দের সীমা নাই। বড় বাবাজী মহাশয় কীর্ত্তনের ধুয়া ধরিলেন —

"জগন্নাথের অদর্শনে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।
চলিলেন আলালনাথে ক্ষেত্র পরিহরি॥
ভক্তগণ সবে চলে গৌরাঙ্গের সঙ্গে।
ডুবিলেন গোরাচাঁদ ভাবের তরঙ্গে॥
ভাবনিধি গোরার মনে কত ভাব উঠে।
কভু ধীরে যায় কভু দ্রুতগতি ছুটে॥
চরণে চরণ প্রভু নেচে নেচে চলে।
দু'বাহু তুলিয়া কেবল হরিবোল বলে॥

ইত্যাদি সুমধুর পদ গান করিতে করিতে সকলে আলালনাথের ঠাকুরবাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। কীর্ত্তনের ধ্বনি শুনিয়া গ্রামবাসী লোকসকল একত্রিত হইল। শ্রীমন্দিরের সম্মুখে কিছুকাল উদ্দণ্ড নৃত্য

এবং কীর্ত্তন করিয়া সকলে বিশ্রাম করিলেন। কোনও সৌভাগ্যবান্ ভক্ত সেদিন আলালনাথের বিশেষরূপ ভোগের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এইস্থানে প্রসিদ্ধ ভোগ পায়সান্ন। ঠাকুরের এমন সুন্দর পায়সান্ন ভোগ আর কোথাও হয় কি না সন্দেহ। কিন্তু ঠাকুরের ভোগ উত্তপ্ত পায়সান্নই দেওয়ার নিয়ম। যিনি আজ ভোগ দিয়াছেন, তাঁহার বড় ইচ্ছা যে, সকলকে প্রাণ ভরিয়া পায়সান্ন প্রসাদ দেন। সেইরূপ উদ্যোগ আয়োজনও হইয়াছে। সকলই প্রস্তুত। ঠাকুরের ভোগের পর সকলে প্রসাদ পাইতে বসিলেন। কিন্তু শুভকার্য্যে বহু বিঘ্ন। যেমন উত্তপ্ত পায়সান্ন ঠাকুরের ভোগ লাগিয়াছে, সেইরূপ উত্তপ্ত প্রসাদই ভক্তগণের পাতায় পড়িল। ইন্দ্রদেব যেন ইহা সহ্য করিতে পারিলেন না। কোথা হইতে বিনামেঘে হঠাৎ ভয়ানক বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বৈষ্ণবগণ নিজ নিজ বুকের নীচে পাতা রাখিয়া সেই উত্তপ্ত পায়সান্ন প্রসাদ পাইতে লাগিলেন। কেহ কেহ বা বৃষ্টির জলের সঙ্গে মিশাইয়া শীতল করিয়া প্রসাদ পাইতে লাগিলেন। অপূর্ব্ব আনন্দ! মাথার উপর জল, নীচে কাদা। বৈষ্ণবগণ পরমানন্দে প্রসাদ পাইতেছেন, আর মুখে "গৌর হরিবোল" উচ্চ ধ্বনি করিতেছেন। অন্য কথা নাই। এইরূপে কোন রকমে মহাপ্রসাদ পাওয়া শেষ করতঃ সকলেই প্রেমভরে উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন। কি মধুর দৃশ্য! যাঁহারা জলে ভিজিবার ভয়ে ঠাকুরের জগমোহনে এবং অন্যান্য স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও সেই অতুল আনন্দস্রোতে ভাসিলেন এবং ক্রমে ক্রমে নিম্নে আসিয়া নৃত্যকীর্ত্তনানন্দে যোগ দিতে লাগিলেন। সকলেই একাকার। বৃষ্টি থামিয়া গেল। ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গনের জলে প্রথমে কাদা হইল; পরে পায় পায় কাদা শুকাইয়া পুনরায় পূর্ব্ববৎ ধূলি হইল। কীর্ত্তনশ্রান্ত বৈষ্ণব-বাবাজীগণের শরীরে ঘর্ম্মবৃষ্টি আরম্ভ হইল। শুষ্ক বস্ত্র পুনরায় সিক্ত

হইল। সকলের মুখে কেবল একমাত্র বুলি "গৌরহরিবোল"। কাহারও দেহানুসন্ধান নাই। সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে একজন ভক্ত আসিয়া বলিলেন, "আরতি হেব চলন্ত দর্শন করিবা হেবে।" প্রেমোন্মত্ত বাবাজীগণ কিন্তু ভক্তটির ভাষা কিছুই বুঝিলেন না; কেবল 'আরতি হইবে' এই মাত্র বুঝিলেন। ইঁহারা তখন যে অবস্থায় ছিলেন, সেই অবস্থাতেই ঠাকুরের সম্মুখে যাইয়া দাঁড়াইলেন। ইঁহাদিগের বস্ত্রাদি ও সর্ব্বশরীর কর্দ্দমাক্ত। উপস্থিত লোকসকল ইহা দেখিয়া অবাক্! ইঁহাদিগের প্রতি সকলেরই দৃষ্টি পতিত হইল। কেহ কেহ বলিল, "ইহারা পাগল হইয়াছে।" কেহ বলিল, "এমন মহাপুরুষ ত আর কখনও দেখি নাই।" বড় বাবাজী মহাশয়কে এক্ষণে সকলেই চিনিয়া ফেলিয়াছে; তিনি যেখানেই যান না কেন, সকলেই তাঁহাকে "বড় বাবাজী মহাপ্রভু" বলিয়া সম্বোধন করে। যথাসময়ে আরতি শেষ হইলে বাবাজীগণ আরতিকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। রাত্রি দেড় প্রহর পর্য্যন্ত কীর্ত্তন করিয়া সকলে বিশ্রাম করিলেন। জনৈক ভক্ত ঠাকুরের ভোগের জন্য কিছু কাক্রা পিঠা ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ভোগের পর মহাপ্রসাদ পাইয়া সেখানেই পরমানন্দে রাত্রিযাপনপূর্ব্বক প্রভাতে উঠিয়া সকলে প্রভাতী কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

নগরকীর্ত্তন ও মহোৎসব

সূর্য্যোদয় হইবামাত্র বড় বাবাজী মহাশয় বহুলোক সঙ্গে লইয়া নগরকীর্ত্তনে বাহির হইলেন। সকলেই প্রেমানন্দে উন্মত্ত। গন্তব্যস্থানের স্থিরতা নাই; গ্রাম হইতে গ্রামান্তর চলিতে লাগিলেন। গ্রামবাসী

আবালবৃদ্ধবনিতা মন্ত্রমুগ্ধবৎ সংকীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতেছে। সকলের মুখেই একমাত্র বুলি "গৌরহরিবোল।" শিশুগণ উলঙ্গ হইয়া কেহ আগে কেহ পাছে নাচিতে নাচিতে চলিতেছে। তাহাদের আজ আনন্দের অবধি নাই। মাতাপিতা সঙ্গে থাকিয়াও উহাদিগকে নিবৃত্ত করিতে পারিতেছে না। সকলেই প্রেমানন্দে উৎফুল্ল হইয়া সংকীর্ত্তনের সঙ্গে চলিয়াছে। অপূর্ব্ব দৃশ্য। ক্রমে বেলা দ্বিতীয় প্রহর হইল। কোনও গ্রামে জনৈক পরিণতবয়স্ক ভদ্রলোক আসিয়া বড় বাবাজী মহাশয়ের কোন সঙ্গীকে ধীরে ধীরে কহিলেন, "বেলা অধিক হইয়াছে, অদ্য অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদের এই ভাগবত গৃহে আপনারা বিশ্রাম করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন।" এই কথা বড় বাবাজী মহাশয়কে জানাইলে তিনি প্রসন্নচিত্তে সম্মতি প্রদান করিলেন। ক্রমে ভোগের দ্রব্য-সম্ভার আসিতে লাগিল। সকলেই কীর্ত্তনশ্রান্ত হইয়া সেই ভাগবতগৃহে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এদিকে শ্রীক্ষেত্রবাসী দুই তিন মূর্ত্তি বাবাজী এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ী দুই মূর্ত্তি ব্রাহ্মণ পূজারী একসঙ্গে রন্ধন করিতে আরম্ভ করিলেন। একশত পাঁচতোলা ওজনের দেড় মণ চাউলের অন্নভোগ প্রস্তুত হইল। সকলেই স্নানাদি করিয়া "জয় জয় নিত্যানন্দাদ্বৈত গৌরাঙ্গ" এই পদ কীর্ত্তন করিতে বসিলেন। কোথা হইতে লোকসমাগম হইতে লাগিল, কে বলিবে? গ্রামবাসী আবাল বৃদ্ধবনিতা সকলেই যেন আনন্দে আত্মহারা হইয়া ভাগবতগৃহের দিকে ছুটিতেছে। আজ তাহাদের দলাদলি নাই—দ্বেষ হিংসা নাই—ছোট বড় ভেদজ্ঞান নাই। সকলেই একত্র মিলিত; সকলেরই প্রাণে এক ভাব। ক্রমে ক্রমে লোকসংখ্যা অনুমান চারিশতের উপর হইল। সকলেই কীর্ত্তনে যোগ দিয়াছে।

কীর্ত্তনও শেষ হইল, সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের ভোগও শেষ হইল।

বড়বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "ভাই সব, আমরা বিদেশী ; তোমাদের
তোমাদের ঘরের ভিক্ষার চা'ল ডা'ল রান্না করিয়া
রর ভোগ দিয়াছি। মহাপ্রসাদ পাইতে তোমাদের
আছে কি ? দেখ, ভগন্নিবেদিত মহাপ্রসাদ স্পর্শদোষে
"স্পর্শদোষে মহাপ্রসাদ নষ্ট নাহি হয়। নষ্টদোষ
শ্চয়॥ শাস্ত্রে আছে :—
র্য্যুষিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ।
ত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কালবিচারণা॥"

প্রমাণাদি দেওয়ার পর স্থানীয় জনৈক ভদ্রলোক
বড় বাবাজী মহাশয়ের উপদেশগুলি সকলকে বুঝাইয়া
ার বহু সাধুবাদ করিলেন। ইহা শুনিয়া উপস্থিত
বলিয়া উঠিল, "মহাপ্রভু, আজি আম্ভ মানঙ্কর
এহি দেশরে আপন• আসি বিজয় কলে, আপনঙ্কর
আম্ভে তরি জিবা।" তখন বড় বাবাজী মহাশয়
রে এক পঙ্গতে বসাইয়া দিতে আদেশ করিলেন।
ানি না বসিলে বসিব না" বলিয়া আপত্তি করিল ;
কিন্তু সে আপত্তি টিকিল না। তিনি হাতে ধরিয়া মধুর বচনে বিনয়
করিয়া সকলকে বসাইয়া দিতে লাগিলেন এবং রশুইদার পূজারীদিগকে
বলিলেন, "দেখ বাবা, কোনও চিন্তা নাই ; প্রাণ খুলিয়া পরিবেশন
কর ; পরম দয়াল নিতাইচাঁদ অভাব পূরণ করিবেন।" এই কথা
বলিবামাত্র সকলেই মহানন্দে "হরিবোল" বলিয়া জয়ধ্বনি দিলেন।
পঙ্গত আরম্ভ হইল। কি আশ্চর্য্য ! সকলে আকণ্ঠ পূরিয়া মহাপ্রসাদ
পাইলেন। তৎপর প্রায় একশত স্ত্রীলোক আসিয়া উপস্থিত হইলে
তাহাদিগকেও প্রসাদ বিতরিত হইল। অবশেষে পরিবেশক পূজারীগণ

এবং বড় বাবাজী মহাশয় প্রসাদ পাইতে বসিলেন। রাত্রি তখন প্রায় এক প্রহর। এই মহা মহোৎসব দেখিয়া সকলেই অবাক্! সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল,—"দেখ, কেত্তে চাউল রান্ধি কেত্তে লোক খুয়াইলে, এ বাবাজী মহাপ্রভু সামান্য নুহে, নিশ্চয় এ জনে মহাপুরুষ।" সেই গ্রামেই ইহারা সদলবলে সে রাত্রি কাটাইলেন। পরদিন প্রভাতে পুনরায় সকলে কীর্ত্তন করিতে করিতে বাহির হইলেন। এখনও ইঁহাদের গন্তব্য পথের স্থিরতা নাই। কোন্‌দিকে যাইতেছেন, লক্ষ্য নাই। গ্রামের পর গ্রাম কীর্ত্তনানন্দে ভাসাইয়া ক্রমাগত পাঁচ ছয় দিন এইরূপ পর্য্যটনের পর শ্রীক্ষেত্রে প্রত্যাবর্ত্তনের কথা মনে পড়িল।

শ্রীক্ষেত্রের কথা মনে পড়িবামাত্র বড় বাবাজী মহাশয় বলরাম বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখান হইতে পুরীধাম কতদূর হইবে?" বলরামবাবু বলিলেন, "পুরীধাম এখান হইতে প্রায় এগার বার ক্রোশ দূরে উত্তর-পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত।" বড় বাবাজী মহাশয় আর কিছুই বলিলেন না। অতি প্রত্যূষে উঠিয়া সংকীর্ত্তনানন্দে উন্মত্ত হইয়া শ্রীধাম পুরী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিন চারি ক্রোশ রাস্তা যাইতে না যাইতেই কোনও গ্রামের বহু ভক্তমণ্ডলীর অনুরোধে অগত্যা সেইদিন তাহাদের আতিথ্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। এইরূপে দ্বাদশীর দিন বেলা দ্বিপ্রহরের সময় ইঁহারা আসিয়া পুরী সমুদ্রতীরে পৌছিলেন। পরে পরমানন্দে সমুদ্রস্নান করিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের দিকে যাইতেছেন, এমন সময় গঙ্গামাতা মঠের বিহারী পূজারীজি আসিয়া অতিশয় আগ্রহসহকারে সকলকে মহাপ্রসাদ পাইবার জন্য মঠে লইয়া গেলেন। ইঁহারাও সেখানে পরমানন্দে মহাপ্রসাদ পাইয়া নাম করিতে করিতে শ্রীশ্রীজগন্নাথবল্লভে আসিয়া বিশ্রাম করিলেন।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নবযৌবন দর্শন

দেখিতে দেখিতে অমাবস্যা আসিয়া উপস্থিত হইল। আজ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নবযৌবন দর্শনোৎসব। শ্রীমন্দির লোকে লোকারণ্য। তাহার মধ্য দিয়া বড় বাবাজী মহাশয় "জয় জয় নীলাচলচন্দ্র জগন্নাথ। কৃপা করি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত॥" বলিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখে যেমন সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন, অমনি সঙ্গিগণও ইহার অনুকরণ করিলেন। একটু পরেই শ্রীমন্দিরের দ্বার খোলা হইলে বড় বাবাজী মহাশয় বহুদিন পরে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমুখ দর্শনে প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া কীর্ত্তন ধরিলেন :—

"বহুদিন পরে আজ দেখিয়া শ্রীমুখ।
খণ্ডিল হৃদয়-ব্যথা পরাণের দুখ॥
দেখ না চাহিয়া কিবা রূপের মাধুরী।
চাঁদমুখ দেখে সবে আপনা পাসরি॥"

কীর্ত্তনানন্দে সকলেই আত্মহারা হইলেন। স্ত্রীপুরুষ সকলেই হাতে তালি দিয়া নাচিতেছে আর গান করিতেছে। কাহারও কোনরূপ সঙ্কোচ নাই। সকলেই প্রেমানন্দে বিভোর। কিছুক্ষণ পরে কীর্ত্তন সমাপ্তি হইল।

শ্রীশ্রীগুণ্ডিচা মার্জ্জন

আজ আবার সিদ্ধবকুল মঠে প্রসাদ পাইবার জন্য সকলের আমন্ত্রণ হইল। বড় বাবাজী মহাশয় কীর্ত্তন ধরিলেন "নিতাই এনেছে নাম, হরিবোল, হরিবোল।" সিদ্ধবকুল মঠের অধিকারী কৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয় আসিয়া অতিশয় যত্ন ও আগ্রহসহকারে ইঁহাদিগকে অভ্যর্থনা

করিয়া মঠে লইয়া গেলেন এবং পরমসমাদরে বহুবিধ প্রসাদ দিয়া আপ্যায়িত করিলেন। পঙ্গতের মধ্যেই প্রসঙ্গক্রমে শ্রীমন্মহাপ্রভুর গুণ্ডিচা মার্জ্জন লীলার কথা উঠিল। জনৈক বৈষ্ণব বলিয়া উঠিলেন, "গুণ্ডিচা মার্জ্জন লীলার কথা ত আমরা গ্রন্থেই দেখিতে পাই, উহার আচরণ ত দেখা যায় না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই লীলার অনুকরণ ভক্ত মাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য।" ইহা শুনিয়া গম্ভীরার হরিভজন দাস অধিকারী মহাশয় বলিলেন, "পূর্ব্বে এই লীলা এইরূপেই আচরিত হইত। নানা কারণে গঙ্গামাতা মঠের কীর্ত্তন লইয়া গোলযোগ হওয়ায় তাঁহারা এখন এই উৎসবে যোগদান করেন না। কেবল গম্ভীরার কীর্ত্তন হইয়া থাকে এবং নামমাত্র নিয়ম রক্ষা করা হয়। কার্য্যতঃ কোনরূপ লীলানুভব হয় না। বলিতে কি, লীলাটি কালপ্রভাবে একেবারে বিলুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে।" তখন বড় বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "এই অপূর্ব্ব উৎসবের পুনরুদ্ধারের জন্য আপনাদের সকলেরই বিশেষ যত্ন করা কর্ত্তব্য। কারণ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এই গুণ্ডিচা মার্জ্জন সেবাটী রাজার নিকট হইতে চাহিয়া লইয়াছিলেন।" ইহা শুনিয়া সিদ্ধবকুল মঠের অধিকারী বড় বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন, "আপনি যদি একটু চেষ্টা করেন, তাহা হইলে আমার বিশ্বাস, শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই বিলুপ্তপ্রায় নিরুপম লীলা উৎসবটীর পুনরুদ্ধার সাধন হইতে পারে।" বড় বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "বাবা, আমি নিশ্চয়ই প্রাণপণে চেষ্টা করিব ; ইহাতে আপনাদের সকলের আশীর্ব্বাদ ও পরম দয়াল নিতাইচাঁদের কৃপা চাই।" এই বলিয়া সেই পঙ্গতের মধ্যেই বৈষ্ণবমণ্ডলীর নিকট করযোড়ে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "আপনারা কৃপা করিয়া আগামী কল্য বেলা দ্বিপ্রহরের সময় সিংহদ্বারের নিকট আমাদের সহিত কীর্ত্তনে যোগদান করিলে কৃতার্থ হইব। এটী আপনাদেরই কার্য্য। আপনারা আমাদিগকে যে পথে

চালাইবেন, আমরা সেই পথেই চলিব।" ইহা শুনিয়া সকলেই অতিশয় আনন্দের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "ইহা ত আমাদের সৌভাগ্যের কথা। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু স্বয়ং আচরণ করিয়া যে সেবাকার্য্য দেখাইয়া গিয়াছেন, আমাদের সকলেরই তাহা অবশ্য আচরণীয়।" তখন সিদ্ধবকুল মঠের মহান্ত পরমানন্দ দাস বাবাজী মহাশয় ও অধিকারী কৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয় স্বেচ্ছায় বলিয়া উঠিলেন, "এই মহৎ এবং শুভ কার্য্যে আমরাও নিশ্চয়ই যোগদান করিব।"

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর পঙ্গত শেষ হইলে বড় বাবাজী মহাশয় সদলে গঙ্গামাতা মঠে গিয়া বিহারী পূজারীকে ও মহান্ত মাধবদাস বাবাজী মহাশয়কে গুণ্ডিচা মার্জ্জন সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া বলায়, তাঁহারাও উৎসাহ দিয়া বলিলেন, "এ ত অতি উত্তম কথা; আপনি একটু চেষ্টা করুন, তাহা হইলেই হইবে। আমরা অবশ্যই এ কার্য্যে যোগদান করিব।" তখন বড় বাবাজী মহাশয় বলরাম বাবুকে আদেশ করিলেন, "দেখ বলাই, একশত নূতন কলসী ও ঝাড়ু যেমন করিয়া পার তুমি সংগ্রহ কর।" বলরামবাবু, বড় বাবাজী মহাশয়ের আদেশ শিরোধারণ-পূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কিছু মহাপ্রসাদের ব্যবস্থা করিলে ভাল হয় না কি?" বড় বাবাজী মহাশয় হাসিয়া উত্তর দিলেন, "তাহা হইলে ত ভালই হয়; আমরা ত মহাপ্রসাদই জানি ও চিনি। প্রভু যদি কৃপা করিয়া আমাদিগকে এত প্রসাদ না দিতেন, তবে কি আমাদের মত লোক তাঁহাকে ভজিত?" বড় বাবাজী মহাশয়ের রসপূর্ণ কথা শুনিয়া সকলেই উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন। ইহার পর সকলে নামসংকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীশ্রীজগন্নাথবল্লভে রওয়ানা হইলেন। সুচতুর বলরাম বাবু ইতিমধ্যেই একশত ঝাড়ু ও কলসীর বন্দোবস্ত করিলেন।

এই বলরামটী ঠিক যেন মহাপ্রভুর বাণীনাথ। তিনিও পট্টনায়ক, ইনিও পট্টনায়ক। তবে শ্রীমন্মহাপ্রভু বাণীনাথকে কোন আদেশ করিতেন না। এই মহাপুরুষ কিন্তু বলরামকে প্রয়োজনমত আদেশ করেন। বলরাম ভিন্ন ইনি জানেন না। বলরামও ইহার আজ্ঞা-পালনের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত। গৃহ, ধন, স্ত্রী, পুত্র, পরিজন সকল দিয়াও যদি এই মহাপুরুষের সন্তোষ বিধান করিতে পারেন, বলরাম তাহাতে কুণ্ঠিত নন। মহাপুরুষও তাঁহার প্রতি যথেষ্ট অনুকূল। মাসের মধ্যে প্রায় পনর দিন তাঁহার কাছারী যাওয়া ঘটে না। তথাপি কোন অভাব নাই। "যেই জন ভজে মোরে অনন্য হইয়া। তারে ভিক্ষা দেই মুঞি মাথায় বহিয়া।" এই মহাবাক্যটীর সার্থকতা আমরা বলরাম বাবুকে দিয়া বেশ প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

রাত্রিপ্রভাতে সকলে নরেন্দ্র সরোবরে প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির পরিক্রমাপূর্ব্বক ভিতরে প্রবেশ করিলেন। যথাবিধি প্রাত্যহিক কীর্ত্তনান্তে বল্লভভোগের কিঞ্চিৎ প্রসাদ পাইয়া সকলে দক্ষিণ দরজায় লালাবাবুর ছত্রে গেলেন। ছত্রের ম্যানেজার প্যারীমোহন বাবু ইঁহাদিগকে বিশেষ স্নেহ করিতেন এবং ভক্তির চোখে দেখিতেন। তিনি মহাসমাদরে ইহাদিগকে সেখানে বসাইয়া ভৃত্য দীনবন্ধু দাসকে নানা প্রকার মহাপ্রসাদ আনিতে আদেশ করিলেন। ভৃত্যটীও পরম ভক্ত এবং ম্যানেজার বাবু অপেক্ষা অধিকতর উৎসাহী। সে অবিলম্বে নানাবিধ পিঠাপানা এবং পাখাল প্রসাদ প্রভৃতি লইয়া আসিল। ইঁহারা সকলে ঐস্থানে মহাপ্রসাদ পাইয়া শ্রীশ্রীগম্ভীরায় আগমনপূর্ব্বক বিশেষ উদ্যোগের সহিত তথাকার কীর্ত্তন-সম্প্রদায় বাহির করাইয়া দিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথবল্লভে আসিয়া দেখিলেন, সকলেই ঝাড়ু, কলসী, খোল করতালাদি লইয়া ইহাদিগের জন্য অপেক্ষা

করিতেছে। ইঁহাদিগকে দেখিয়া সকলেই হরিধ্বনি করিতে লাগিল। ইত্যবসরে শ্রীপাদ রঘুনাথ দেব গোস্বামী প্রভু ও শ্রীপাদ হরিদেব গোস্বামী প্রভু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলে আনন্দে মত্ত হইল। তখন বড় বাবাজী মহাশয় নিতাইচাঁদের করুণার জয় দিয়া ভাবভরে কীর্ত্তনের ধুয়া ধরিলেন :—

"ভাবাবেশে মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
নাচিতে নাচিতে চলে অতি মনোরঙ্গে॥
কাল আসিবেন প্রাণবঁধু নিকুঞ্জমন্দিরে।
স্থান উপস্করিবারে চলগো সত্বরে॥
নানাজাতি ফুল তুলি কুঞ্জ সাজাইব।
সুগন্ধি কুসুমহার বঁধুগলে দিব॥
কুসুম-তলপে বঁধু শুতিবেন সুখে।
বাসিত তাম্বূল লেই দিব চাঁদমুখে॥
সুচামর ধরি কেহ করিবে বীজন।
কেহ বা করিবে মৃদু পাদসংবাহন॥
চুয়া চন্দন গন্ধ দিব চারিভিতে।
রসময় বঁধু কেলি করিবে নিভৃতে॥"

ইত্যাদি সময়োচিত শত শত পদ গীত হইতে লাগিল। মধুর কণ্ঠের মধুর ঝঙ্কারে চতুর্দ্দিক্ মুখরিত হইল। তখন সকলে প্রেমাবেশে শ্রীশ্রীগুণ্ডিচা-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দসন্তান রাজগুরু শ্রীপাদ রঘুনাথ দেব গোস্বামী প্রভু ও শ্রীপাদ হরিদেব গোস্বামী প্রভু এই দুইজনে রত্নবেদীর উপর ঝাঁটু দিতে লাগিলেন। অন্যান্য শত শত লোক ক্ষণকাল মধ্যে মন্দিরের উপর-নীচ পরিষ্কার করিয়া ফেলিল। আশ্চর্য্য দৃশ্য! অপূর্ব্ব লীলা! একজন দীর্ঘাকার পুরুষ অপর একজনকে কাঁধে

বলিতেছে, "তুমি উপর বেশ করিয়া ঝাড়; কোন ভয় নাই।" এইরূপে একের কাঁধে আর একজন, তাঁর কাঁধে একজন, এইরূপ করিয়া শ্রীমন্দিরের উপর নীচ সুচারুরূপে পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। কতক্ষণ পরে বড় বাবাজী মহাশয়—**'জল জল'** বলিয়া যেমন ডাক দিলেন, অমনি কূপ হইতে জল তোলা আরম্ভ হইল। কেহ বা ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর হইতে মাথায় এবং হাতে কলসী করিয়া জল আনিতে লাগিল। সকলেই আজ একপ্রাণ—একমন; সকলেই আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন। শ্রীশ্রীগুণ্ডিচা মন্দিরটী যেন আনন্দ-কানন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। হঠাৎ রঘুনাথ দেব গোস্বামী প্রভু ভাবাবিষ্ট হইয়া প্রেমোন্মাদে রত্নবেদীর উপর হইতে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক নীচে নামিয়া নাচিতে নাচিতে বলিতে লাগিলেন. "ঐ যে আমার নিতাই গৌর দুই ভাই নাচিতে নাচিতে শ্রীমন্দির মার্জ্জনা করিতেছেন। আহা মরি! কি অপরূপ শোভা!" এই কথা বলিবামাত্র বড় বাবাজী মহাশয়ের মনে কি যেন এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইল। তিনি আবেশে পদ ধরিলেন:—

"ঐ যে আমার নিতাই গৌর নাচে মনোরঙ্গে।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর নাচে সঙ্গে সঙ্গে॥"

গোস্বামী প্রভু অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। সকলেই ভাবে মাতোয়ারা! লঘুগুরু ভেদ নাই; কেহ বা কাহারও মাথায় জল ঢালিয়া দিতেছে; ভাবভরে কেহ বা কাহারও চরণতলে পড়িয়া অঝোর নয়নে ঝুরিতেছে। শত কলসীর স্থানে যে কত শত কলসী আসিল, তাহা কে গণনা করিবে? জল ক্রমে ভিতর হইতে বাহির, বাহির হইতে সিংহদ্বার ভাসাইয়া পথে আসিয়া পড়িতে লাগিল। উপস্থিত ভক্তবৃন্দ সকলেই এই অপূর্ব্ব উৎসবানন্দ উপভোগ করিয়া একবাক্যে বলিতে লাগিলেন, "সাক্ষাৎ নিতাই-চাঁদ যেন বড় বাবাজীরূপে লীলা করিতেছেন। তাহা না হইলে এমন

আনন্দ ত আমরা আর কখনও উপভোগ করিনাই। যে লীলা শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রকট করিয়াছিলেন, শাস্ত্রে যাহা শুনিতে পাই, আজ চারিশত কয়েক বৎসর পরে এই মহাত্মার কৃপায় আমরা সেই লীলা এখানে উপভোগ করিলাম।" কেহ বা প্রেমভরে কাঁদিয়া অধীর হইতেছেন; কেহ বা বড় বাবাজী মহাশয় যে যে স্থানে নাচিয়া নাচিয়া জলের কলসী লইয়া যাইতেছেন, সেই সেই স্থানে গড়াগড়ি দিয়া আপনাকে ধন্য মানিতেছেন। বড় বাবাজী মহাশয়ের গুণ্ডিচা মার্জ্জন-আনন্দের কথা সামান্য লেখনী দ্বারা প্রকাশ করা অসম্ভব। যে কোনও ভাগ্যবান্ ব্যক্তি বড় বাবাজী মহাশয়ের সং- থাকিয়া এই লীলা দর্শন করিয়াছেন, তিনিই ইহার মধুরত্ব কিঞ্চিৎ অনুভব করিতে পারিয়াছেন। ইহার অদ্ভুত কৃপাশক্তির প্রভাবে গুণ্ডিচামার্জ্জন লীলানন্দ এখনও পূর্ণভাবে বিরাজমান। যদি কেহ অদ্যাপি তাঁহার পদাশ্রিত ভক্তবৃন্দের সঙ্গে যাইয়া এই লীলা প্রত্যক্ষ অনুভব করেন, তাহা হইলে আমার সামান্য লেখনীতে যে সে আনন্দের শতাংশের একাংশও প্রকাশ পায় নাই, বোধ হয় একথা তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন।

এইভাবে সকলে মিলিয়া প্রেমানন্দে রত্নবেদী এবং মণিকোঠা ধৌত করিলেন। কেহ কেহ বা ভাঙ্গা কলীর খাপরায় করিয়া ঊর্দ্ধদিকে জল ছিটাইয়া মন্দিরের উপরিভাগ ধৌত করিতে লাগিলেন। এই-রূপে ক্রমে জগমোহন, বাহিরচত্বর এবং ভোগমণ্ডপ, রান্নাবাড়ী প্রভৃতি সমস্ত শ্রীমন্দির সম্পূর্ণরূপে বিধৌত করিয়া নিজ নিজ মনোবৃত্তির ন্যায় স্বচ্ছ ও নির্ম্মল করিলেন। পরিশেষে সকল স্থান বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সকলে একত্র মিলিত হইয়া জলকেলি করিবার মানসে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে চলিলেন। একে একে সকলে পরমানন্দে জলে ঝম্পপ্রদান করিতে লাগিলেন। সকলেই যেন বালস্বভাব। একজন আর একজনকে

বলপূর্ব্বক গভীর জলে টানিয়া লইয়া চলিলেন। কেহ বা কাহাকে কাঁধে করিয়া জলের ভিতর নাচিতে লাগিলেন। বড় বাবাজী মহাশয়ের এমন একটা সন্তরণ করিবার অদ্ভুত শক্তি ছিল যে, তিনি হাতের সাহায্য ব্যতীত দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পায়ে সাঁতরাইয়া অনেকদূর যাইতে পারিতেন। আজও তিনি ঠিক সেইরূপভাবে সাঁতার দিয়া বহুদূর চলিয়া গেলেন। ঠিক যেন জলে হাঁটিয়া যাইতেছেন। তৎপরে চিৎ হইয়া জলে ভাসিতে লাগিলেন। যেন একটা দারুময় মূর্ত্তি ভাসিতেছে।

এই সময়ে এক ব্যক্তি দশ এগার বৎসরের একটি বালককে লইয়া ইঁহার বুকের উপর বসাইয়া দিবামাত্র জনৈক ভক্ত ভাবাবেশে বলিয়া উঠিলেন, "দেখ দেখ, ঠিক্ যেন অনন্তশয্যা হইয়াছে।" এইরূপ নানাবিধ জলকেলি হইতে লাগিল। ভক্তবৃন্দের আনন্দের সীমা নাই। এই আনন্দের প্রধান সহযোগী রঘুনাথ দেব গোস্বামী প্রভু এবং বড় বাবাজী মহাশয়। ইঁহাদের দুইজনের পরম সখ্যভাব। উভয়েই উভয়ের দাদা। পরস্পর দেখা হইলে উভয়ের আত্মস্মৃতি রহিত হইয়া যায়। ইঁহাদের সৌহার্দ্দের কথা বলিয়া শেষ হয় না। এমন কি, দুইজনে এক সঙ্গে প্রসাদ পাইতে বসিলে উভয়েরই বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়া যায়। কাড়াকাড়ি, ধরাধরি, হাতাহাতি ব্যাপার! তখন ইঁহারা শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈতভাবে বিভাবিত হন।

জলকেলি শেষ হইলে মহাপ্রসাদ পাইবার উদ্যোগ হইতে লাগিল। যত পিঠাপানা, মিষ্টান্ন প্রসাদ সকলই একত্র করিয়া মাখা হইল। লোকসংখ্যা যাহা অনুমান করা হইয়াছিল, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী হইয়াছে; কাজে কাজেই যে পাতার আয়োজন করা হইয়াছিল, তাহাতে অকুলান পড়িল। অবশেষে কেহ বা কাপড়ের উপর, কেহ বা কাহারও সঙ্গে এক পাতে, কেহ কেহ বা পঙ্গতের পরে প্রসাদী পাতায়

মহাপ্রসাদ পাইতে লাগিলেন। ইহাতেই তাঁহাদের অতুল আনন্দ! রাত্রি দেড় প্রহরের পর প্রসাদ পাওয়া ব্যাপার শেষ হইল। সকলেই তখন উচ্চকণ্ঠে বড় বাবাজী মহাশয়কে প্রাণ ভরিয়া ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। এইরূপ মহাসমারোহে শ্রীশ্রীগুণ্ডিচা মার্জ্জন উৎসব সমাধা করিয়া পুনরায় কীর্ত্তন করিতে করিতে সকলেই পরমানন্দে নিজ নিজ বাসস্থানে গমন করিলেন।

শ্রীশ্রীরথযাত্রা উৎসব

কাল রথযাত্রা উৎসব। সকলেরই মনে আনন্দের স্রোত বহিতেছে। প্রত্যেকের মনে নানাভাবের উদয় হইতেছে। রাত্রি প্রভাতে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব রথে উঠিবেন—প্রাণ ভরিয়া তাঁহার শ্রীমুখ দর্শন করিবেন, এই উৎকণ্ঠায়ই যেন সে রাত্রি অতি শীঘ্র প্রভাত হইয়া গেল। সকলেই ত্বরান্বিত হইয়া নরেন্দ্র সরোবরে স্নান করিতে গেলেন। তখনকার শ্রীশ্রীজগন্নাথবল্লভ মঠবাসীদিগের এই নিয়ম ছিল, বহির্দ্দেশ যাইতে হইলে নরেন্দ্র সরোবরতীরে যে সরকারী পায়খানা আছে, উহাতেই যাইয়া একেবারে স্নান করিয়া আসিতে হইত। কাজে কাজেই কি প্রাতে, কি মধ্যাহ্নে, কি সায়াহ্নে এই স্নানটী যেন ইঁহাদের সঙ্গের সাথী। আজ শীঘ্র শীঘ্রই প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পহণ্ডী বিজয় দেখিবেন বলিয়া তাড়াতাড়ি সকলে শ্রীমন্দিরে চলিলেন। এদিকে সেবকগণ অতি ব্যস্ততা সহকারে যথাসময়ে খিচুড়ী ভোগ দিয়া বহুমূল্য পট্টবস্ত্র দ্বারা শ্রীশ্রীবলভদ্র, শ্রীশ্রীসুভদ্রা এবং শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের কটিদেশ, বক্ষোদেশ প্রভৃতি স্থান অতি যত্নে বন্ধনপূর্ব্বক বলশালী দয়িতা পাণ্ডাগণ অগ্রে অগ্রে শ্রীশ্রীবলদেবকে, তৎপশ্চাৎ শ্রীশ্রীসুভদ্রাদেবীকে

এবং তৎপশ্চাৎ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে বিজয় করাইতে লাগিলেন। বড় বাবাজী মহাশয় সদলবলে সেখানে উপস্থিত ছিলেন; শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের গমনভঙ্গি দেখিয়া ভাব-গদগদকণ্ঠে কীর্ত্তন ধরিলেন :—

"আসিছেন জগন্নাথ হেলিয়া দুলিয়া।
নাচে রে গৌরাঙ্গ আমার হেমকিরণিয়া॥
স্বরূপ রামানন্দ দোঁহে রহে দুই পাশে।
মাতল গৌরাঙ্গচাঁদ রাধাভাবাবেশে॥"

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব আনন্দে মত্ত হইয়া হাসিতে হাসিতে এক তুলিকা হইতে যেমন অপর তুলিকায় আরোহণ করিতেছেন, অমনি ভয়ানক শব্দে সেই তুলিকা ফাটিয়া তুলা ঊর্দ্ধদিকে উড়িতেছে। ইহা দেখিয়া বড় বাবাজী মহাশয় প্রেমানন্দে মত্ত হইয়া 'হরিবোল' বলিয়া নাচিতেছেন দেখিয়া উপস্থিত ভক্তবৃন্দের মনে হইল, তুলিকা ফাটা নয়; উহা যেন বড় বাবাজী মহাশয়ের হৃদয়ের আনন্দ-উৎস ছুটিয় আপামর সর্ব্বসাধারণ দর্শকবৃন্দের হৃদয়ক্ষেত্র আনন্দে প্লাবিত করিতেছে।। ক্রমে শ্রীশ্রীজগবন্ধু রথে আরোহণ করিলেন। কালাবেঠিয়াগণ (নিযুক্ত রথচালকগণ) আসিয়া রথরজ্জু ধরিল। যাত্রিগণ গগনভেদী 'হরিবোল' ধ্বনি, শঙ্খধ্বনি এবং মঙ্গলময় উলুধ্বনিতে জগৎ মাতাইয়া তুলিল। পাণ্ডাগণের "ঝাঁকর ঝাঁই" কাঁসরের শব্দে লোকের কর্ণে তালা লাগিল। কীর্ত্তনীয়াগণের শত শত মৃদঙ্গ মাদল ও ঝাঁজের ধ্বনিতে দশদিক্ মুখরিত হইল। তাহার মধ্যে বড় বাবাজী মহাশয়ের সেই জগন্মনোহারী মধুর কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। পদকর্ত্তা খুঁজিতে হইল না। গ্রন্থ দেখিয়া পদ বলিয়াও দিতে হইল না। সঙ্গিগণ ইঁহার মুখপানে তাকাইয়া আছেন, কি শব্দ উচ্চারিত হয়। বড় বাবাজী মহাশয়

অনিমেষ-নয়নে এতক্ষণ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমুখচন্দ্র দর্শন করিতেছিলেন, হঠাৎ যেন চমক ভাঙ্গিল। কি দেখিলেন, তিনিই জানেন। মহাশব্দে রথ চলিতে লাগিল ; তখন ভাবগদগদকণ্ঠে স্বরচিত পদ ধরিলেন :—

রথের আগে নাচে গোরা রাধাভাবাবেশে।
আনন্দে ভকতগণ নাচে চারি পাশে ॥
নিতাই অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি।
বিভোর হইয়া ভাবে নাচে নিরবধি ॥
স্বরূপ রাম রায় নাচে গোবিন্দ মুকুন্দ।
বাসুদেব ঘোষ বক্রেশ্বর শিবানন্দ ॥
গৌড়দেশবাসী যত ভক্ত অগণন।
গোরাসনে নাচে ভাবে হইয়া মগন ॥
জগন্নাথে চাহি গোরা কত কিনা বলে।
মুখ বুক ভাসি যায় নয়নের জলে ॥
পূর্ব্বে যেন কুরুক্ষেত্রে সব গোপীগণ।
কৃষ্ণের দর্শন পাঞা আনন্দিত মন ॥
জগন্নাথে দেখি প্রভুর সে ভাব উঠিল।
রাধাভাবে কৃষ্ণ ঠাঞি কহিতে লাগিল ॥
শুন হে পরাণবঁধু মোর নিবেদন।
বৃন্দাবনে চল যাই কমললোচন ॥
সেই তুমি সেই আমি সে নব সঙ্গম।
তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন ॥
ইঁহা লোকারণ্য হাতী ঘোড়া রথধ্বনি।
তাঁহা পুষ্পবন ভৃঙ্গপিকনাদ শুনি ॥

ইহা রাজবেশ সঙ্গে পাত্রমিত্রগণ।
তাঁহা নব নটবর মুরলীবদন॥
ব্রজে তোমা সঙ্গে সেই সুখ আস্বাদন।
সে সুখ-সমুদ্রের ইহা নাহি এক কণ॥
আমা লঞা পুন লীলা কর বৃন্দাবনে।
তবে মোর মনসাধ হয়ত পূরণে॥

বলিতে বলিতে মধুর নৃত্য আরম্ভ করিলেন। ক্ষণকাল পরে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের শ্রীশ্রীজগন্নাথদর্শনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর রাধাভাবাবেশে প্রলাপোক্তি কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন :—

"অন্যের যে অন্য মন, আমার মন বৃন্দাবন,
মনে বনে এক করি জানি।
তাঁহা তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়,
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি॥
প্রাণনাথ! শুন মোর সত্য নিবেদন।
ব্রজ আমার সদন, তাঁহা তোমার সঙ্গম,
না পাইলে না রহে জীবন॥
পূর্ব্বে উদ্ধবদ্বারে, এবে সাক্ষাৎ আমারে,
যোগজ্ঞানের কহিলে উপায়।
তুমি বিদগ্ধ কৃপাময়, জান আমার হৃদয়,
মোরে ঐছে করিতে না জুয়ায়॥
চিত্ত কাঢ়ি তোমা হৈতে, বিষয়ে চাহি লাগাইতে,
যত্ন করি নারি কাঢ়িবারে।
তারে জ্ঞান শিক্ষা কর, লোক হাসাইয়া মার,
স্থানাস্থান না কর বিচারে॥

নহে গোপী যোগেশ্বর, তোমার পদ কমল,
ধ্যান করি পাইবে সন্তোষ।
তোমার বাক্য পরিপাটী, তার মধ্যে কুটীনাটি,
শুনি গোপীর বাঢ়ে আর রোষ॥
দেহস্মৃতি নাহি যার, সংসারকূপ কাঁহা তার,
তাহা হৈতে না চাহে উদ্ধার।
বিরহ-সমুদ্রজলে, কামতিমিঙ্গিলে গিলে,
গোপীগণে লেহ তার পার॥
বৃন্দাবন গোবর্দ্ধন, যমুনা পুলিন বন,
সেই কুঞ্জে রাসাদিক লীলা।
সেই ব্রজে ব্রজজন, মাতা পিতা মিত্রগণ,
বড় চিত্র কেমনে পাশরিলা॥
বিদগ্ধ মৃদু সদ্‌গুণ, সুশীল স্নিগ্ধ করুণ,
তাহে তোমার নাহি দোষাভাস।
তবে যে তোমার মন, নাহি স্মরে ব্রজজন,
সে আমার দুর্দ্দৈব বিলাস॥
না গণি আপন দুঃখ, দেখি ব্রজেশ্বরী মুখ,
ব্রজজনের হৃদয় বিদরে।
কিবা মার ব্রজবাসী, কিবা জীয়াও ব্রজে আসি,
কেন জীয়াও দুঃখ সহিবারে॥
তোমার যে অন্য বেশ, অন্য সঙ্গ অন্য দেশ,
ব্রজজনে কভু নাহি ভায়।
ব্রজভূমি ছাড়িতে নারে, তোমা না দেখিলে মরে,
ব্রজজনের কি হবে উপায়॥

তুমি ব্রজের জীবন, তুমি ব্রজের প্রাণধন,
তুমি ব্রজের সকল সম্পদ।
কৃপার্দ্র তোমার মন, আসি জীয়াও ব্রজজন,
ব্রজে উদয় করাহ নিজ পদ ॥

শ্রীচৈঃ চঃ।

— —

স্বরূপেরে ধরি, কহে ধীরি ধীরি,
শুনলো মরমী সখী।
রথেরে চড়িয়া, আসিছে বঁধুয়া,
অরুণ কমল আঁখি ॥
হাসিয়া বাঁশীয়া, মু'খানি চাহিয়া,
কত না উঠিছে মনে।
মল্লিকা মালতী, ফুলে মালা গাঁথি,
সাজাইব সযতনে ॥
অতি নিরজনে, বসিয়া দু'জনে,
হৃদয় ঢালিয়া দিব।
অতি সংগোপনে, পরশ রতনে,
হিয়ার মাঝারে থোব ॥
শুনগো ললিতা, মরমের কথা,
কহিনু তোমার ঠাঁঞি।
এ তিন ভুবনে, প্রাণবঁধু বিনে,
আর কেহ মোর নাই ॥"

এই পদ গাহিতে গাহিতে গৌরলীলা যেন পুনঃ প্রকট হইল। চোখের জলে ইহার বুক ভাসিয়া যাইতেছে। হাতের ভঙ্গিতে এবং

নয়নের কটাক্ষে প্রাণবঁধুয়াকে যে কত কি বলিতেছেন, তাহা একমাত্র রসময় ভাবনিধি শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরই জানেন; আর যিনি বলিতেছেন, তিনিই জানেন। সঙ্গিগণ "এ তিন ভুবনে, প্রাণবঁধু বিনে, আর কেহ মোর নাই" এই ধুয়া গাহিতেছে এবং মহাপুরুষ মধুর নৃত্য করিতেছেন। ইঁহার বিশাল দেহখানি নৃত্যকালে যেন অতিশয় লঘু বলিয়া বোধ হইতেছে। চরণে চরণ দিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের নিত্য পার্ষদরূপে গোপীভাবে যেন তাঁহার পিছনে পিছনে নাচিতেছেন। ঐ অদ্ভুত নৃত্যভঙ্গি—ঐ অভূতপূর্ব্ব ভাবতরঙ্গ যে একবার দেখিতেছে, সেই চিত্রপুত্তলীর ন্যায় ইঁহার প্রতি চাহিয়া রহিতেছে। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবও যেন এই মধুর নৃত্য দেখিতে দেখিতে ধীরে ধীরে চলিতেছেন। এই সময় পংক্তিভোগ উপলক্ষে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথ থামিল। কি জানি, কেন যেন বড় বাবাজী মহাশয় এই সময় নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন। ইঁহার তাৎকালিক ভাবদর্শনে বোধ হইতে লাগিল, যেন ইনি কি একটী প্রাণের জিনিষ হারাইয়া অতিশয় উৎকণ্ঠাভরে তাহা খুঁজিতেছেন। ক্ষণকাল পরেই ইঁহার আর ধৈর্য্য রহিল না। দুইটী গণ্ডস্থল আরক্তিম হইল—অবিরতধারে নয়নে প্রেমধারা বহিতে লাগিল। গদগদকণ্ঠে কি যেন কি কি বলিতে চাহিলেন; কিন্তু কণ্ঠরোধ হইয়া গেল; আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। কেবল 'গো গো' করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন। অষ্ট সাত্ত্বিকবিকার যেন অবসর খুঁজিতেছিল; সময় বুঝিয়া সকলেই ইঁহাকে যুগপৎ আক্রমণ করিল। ইঁহার অশ্রুজলে সে স্থানের রজ কর্দ্দমাকার ধারণ করিল। সেই বিশাল দেহের কম্পে পার্শ্বস্থ ভক্তগণ সকলেই কম্পিত হইতে লাগিলেন। ধূলিধূসরিত ঘর্ম্মাক্ত দেহে পুলকাবলি যেন সুপক্ব কণ্টকীফলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। সুবিশাল দেহখানি

এক একবার ফুলিয়া উঠিতেছে, এক একবার যেন মাটিতে মিশিয়া যাইতেছে। কখনও বা হস্তপদ মুষ্টিবদ্ধ হইয়া লৌহদণ্ডের ন্যায় দৃঢ় হইতেছে; আবার কখনও বা শ্লথসন্ধিবৎ শিথিল হইয়া পড়িতেছে। 'গো গো' শব্দ করিতে করিতে মুখে ফেন উঠিতেছে। উৎকট বিরহোৎ-কণ্ঠাভরে ভূমিতে মুখ ঘর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে ভক্তগণ কাঁদিতে কাঁদিতে হস্তদ্বারা নিবারণ করিতেছেন। এইভাবে কিছুক্ষণ অতীত হইল। বহু সন্তর্পণে অর্দ্ধবাহ্যদশা লাভ করিয়া পার্শ্বস্থ প্রিয় সহচর নবদ্বীপ দাসের কণ্ঠ ধারণপূর্ব্বক ধীরে ধীরে মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন :—

কে মোর মরমী বটে কারে কব দুখ।
না হেরি গৌরাঙ্গচাঁদে বিদরয়ে বুক ॥
কাঁহা স্বরূপ রামরায় কাঁহা নিত্যানন্দ।
কাঁহা শ্রীবাস গদাধর শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র ॥
কাঁহা রূপসনাতন মুরারি মুকুন্দ।
কাঁহা হরিদাস কাঁহা সেন শিবানন্দ ॥
এই না রথের আগে লয়ে ভক্তগণ।
ভাবাবেশে গোরা কত করিল নর্ত্তন ॥
সেই জগন্নাথ সেই রথের সাজনী।
কোথা লুকাইল মোর গোরা গুণমণি ॥
অনলে পশিমু কিংবা ভখিমু গরলে।
গৌরাঙ্গ বিরহে প্রাণ ত্যজিমু সলিলে ॥
রসভরে গোরাচাঁদে দেখিনু নাচিতে।
হারাইনু হারানিধি দেখিতে দেখিতে ॥
কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ লাগিয়া।
কি দিয়া গঢ়ল বিধি পাষাণ করিয়া ॥

নীলাচলবাসী ভক্তগণকে লক্ষ্য করিয়া করযোড়ে বলিতে লাগিলেন :—

ওগো নীলাচলবাসী করি নিবেদন।
একবার দেখাও মোর পরাণরতন ॥
এবার পাইলে দেখা গোরা দ্বিজমণি।
হিয়ার মাঝারে রাখি জুড়াব পরাণি ॥
কাঁহা করো কাঁহা যাঙ কহত আমারে।
না হেরি গৌরাঙ্গচাঁদে পরাণ বিদরে ॥

এই বলিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন। তখন ভাবের ভাবুক কৌশলী নবদ্বীপ দাসের মনে হঠাৎ একটি ভাবের উদয় হইল। তিনি বলিয়া উঠিলেন :—

ঐযে নাচিছে গোরা ভক্তগণ সাথে।
চলগো দেখিব মোরা রথের পশ্চাতে ॥

এই কথা শুনিবামাত্র বড় বাবাজী মহাশয় প্রেমানন্দে অধীর ভাবে নবদ্বীপকে বক্ষে ধারণপূর্ব্বক দৃঢ় প্রেমালিঙ্গন দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন ; "ভাইরে"—

'কি ধন আমার আছে কিবা দিব তোরে।
গোরা বিনিময়ে আজ কিনিলি আমারে ॥' "

এই বলিতে বলিতে উঠিয়া অতি দ্রুতগতিতে রথের পশ্চাতে চলিলেন। তথায় যাইয়া কি দেখিলেন, তিনিই জানেন। প্রেমানন্দে দুই বাহু তুলিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে রথ প্রদক্ষিণ করতঃ পুনরায় যেমন সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, অমনি রথ চলিতে আরম্ভ করিল। ইনিও পূর্ব্ববৎ কীর্ত্তন ধরিলেন :—

আবেশে গৌরাঙ্গহরি স্বরূপেরে বলে।
কত না রূপের ছটা দেখ গো সকলে ॥

আসিছেন প্রাণবঁধু রথেতে চড়িয়া।
দেখ না চাহিয়া রূপ দেখ না চাহিয়া॥
কালিয়া বরণখানি চন্দনেতে মাখা।
নটবর নাগর ত্রিভঙ্গিম বাঁকা॥
অরুণ কমল আঁখি ঢুলি ঢুলি চলে।
হেরিয়া মোহনরূপ পরাণ উছলে॥

এইরূপ কত কত পদ পদাবলী যে গীত হইতে লাগিল, কাহার সাধ্য তাহা লিপিবদ্ধ করে? দর্শকবৃন্দ এক একবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমুখপানে চাহিতেছে, আর এক একবার বড় বাবাজী মহাশয়ের প্রেমে ঢলঢল মুখপানে চাহিয়া হাতে তালি দিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছে। কেহ কেহ বা গললগ্নীকৃতবাসে প্রেমবিহ্বলচিত্তে "মহাপ্রভু, পতিতপাবন, দয়াময়, আমরা ঘোর পাতকী, কৃপাকটাক্ষপাত কর প্রভু, তোমা বিনা আর গতি নাই" ইত্যাদি কতই কি প্রার্থনা করিতেছে। রথযাত্রা উৎসবে আনন্দের কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। সামান্য লেখনীর কি সাধ্য যে, ঐ অপার আনন্দরাশির শতাংশের একাংশও বর্ণনা করে?

শ্রীশ্রীজগবন্ধু আনন্দে হেলিয়া দুলিয়া চলিতে লাগিলেন। ক্রমে দিবা অবসান হইল। লোকসকল বড়ই পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল। ভক্তবৎসল শ্রীশ্রীজগবন্ধু ভক্তদুঃখে কাতর হইয়াই যেন তখন বলগণ্ডীর নিকটে সেদিনের জন্য বিশ্রাম করিলেন। ভক্তগণও স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। বড় বাবাজী মহাশয় কিন্তু নিজগণসহ সেই স্থানেই অবস্থান করিলেন। ইহার এই নিয়ম ছিল, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব যতদিন পথে থাকিবেন, ইনিও ততদিন তাঁহার সহিত পথে থাকিবেন। ঠাকুরের যাহা যাহা ভোগ হইবে ইনিও সেই সেই মহাপ্রসাদ

গ্রহণ করিবেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নিয়মিত সেবা আরম্ভ হইল। যাত্রিগণ অনেক চলিয়া গেল। বড় বাবাজী মহাশয় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সন্ধ্যা-আরতি দর্শন করিয়া পথের ধারে এক পিণ্ডার উপর বসিলেন। অনেক ভক্তমণ্ডলী আসিয়া ইঁহার নিকটে বসিয়া নানাপ্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। গোপাল প্রসাদ দত্ত নামক একজন পোষ্ট আফিসের হেড্ক্লার্ক বড় বাবাজী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবাজী মহাশ! 'পহণ্ডীবিজয়' শব্দের অর্থ কি ?" উত্তরে বড় বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "বাবা, উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ, এ কথাটা আমাকেই তোমাদের বুঝাইয়া দেওয়া উচিত; কারণ এ শব্দটী উড়িয়াভাষা। আমাদের স্বাভাবিক একটা দোষ, আমরা কোনও বিষয় বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখি না। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য বস্তুর মধ্য হইতেও আমরা অনেক উপদেশ পাইতে পারি। 'পহণ্ড' শব্দের অর্থ পা, 'পহণ্ডীবিজয়' শব্দে চরণে চলিয়া যাওয়া বুঝায়। তোমরা ত দেখিয়াছ যে, পহণ্ডীবিজয়ের সময় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব লাফ দিয়া দিয়া চলেন। তোমরা হয়ত মনে করিয়াছ, উহা একটী লীলামাত্র; কিন্তু তাহা নহে। আনন্দময় বিগ্রহ আনন্দভরে ঢুলিয়া ঢুলিয়া একটু লম্বিত পদে চলিয়া যান। তাই ঐরূপ দেখা যায়।" ইহা শুনিয়া সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "তাইত বটে, পহণ্ড শব্দে ত আমাদের চলিত ভাষায়ই পা বুঝায়।"

এইরূপ নানাবিধ লীলাকথায় কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। রাত্রি অধিক হইয়াছে দেখিয়া ভক্তগণ নিজ নিজ বাসায় চলিয়া গেলেন। বড় বাবাজী মহাশয়ও সঙ্গিগণকে বলিলেন, "তোমরা যে যে ইচ্ছা কর, বাসায় যাও, আমি আজ আর যাইব না।" ইহা শুনিয়া সে রাত্রিতে কেহই আর বাসায় গেলেন না। পথের উপর রথের কাছি মাথায়

দিয়া পরমানন্দে শয়ন করিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে সকলেই উঠিয়া নরেন্দ্র সরোবরে স্নান করতঃ নিজ নিজ নিত্য কৃত্য সমাপন পূর্ব্বক রথাগ্রে গমন করিবেন, এমন সময় পরমানন্দ দাস পণ্ডিত বাবাজী নামক একমূর্ত্তি বৈষ্ণব তাঁহার মঠে মহাপ্রসাদ পাইবার জন্য ইহাদিগকে অনুরোধ করিয়া বলিলেন, "আমার ওখানে কিঞ্চিৎ মহাপ্রসাদ পাইয়া পরে রথের নিকটে যাইবেন। এখনও রথটানের অনেক বিলম্ব আছে।" বৈষ্ণবের বাক্য অবহেলা করিতে না পারিয়া সকলেই পণ্ডিতজীর কথায় স্বীকৃত হইলেন এবং তাঁহার মঠে নানাপ্রকার মহাপ্রসাদ পাইয়া কিছুকাল বিশ্রামান্তে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের কাঁসর বাজিয়া উঠিলে তৎক্ষণাৎ দ্রুতগতিতে রথাগ্রে উপস্থিত হইলেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথটান আরম্ভ হইলে বড় বাবাজী মহাশয় প্রেমভরে পূর্ব্ববৎ পদ ধরিলেন :—

"আবেশে নাচয়ে মোর শচীর নন্দন।
চারিদিকে নাচে প্রিয় পারিষদগণ॥
জগন্নাথের মুখ হেরি গোরা দ্বিজমণি।
কত কি না বলে যেন রাধাবিনোদিনী॥
এস হে পরাণবঁধু এস হে কালিয়া।
চল বৃন্দাবনে চল রথেরে চড়িয়া॥
বহুদিন হৈতে সাধ তোমারে লইয়া।
বৃন্দাবনে চলিবাঙ একত্র হইয়া॥
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর নন্দের নন্দন।
মনে কি পড়ে না বঁধু ব্রজে ব্রজজন॥
স্বরূপের করে ধরি কত কি না বলে।
বক্ষ ভেসে যায় দুটী নয়নের জলে॥"

ভক্তগণ কীর্ত্তনানন্দে মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছেন ! শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব যেন ভক্তগণের শ্রম দেখিয়াই রথ রাখিলেন। এইভাবে চারিদিনে শ্রীশ্রীজগবন্ধু গুণ্ডিচামন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরে জগন্নাথদেব

আজ বড় বাবাজী মহাশয়ের মনে আনন্দ আর ধরে না। বৃন্দাবন-চাঁদকে বৃন্দাবনে পাইয়া প্রাণ খুলিয়া দুটী প্রাণের কথা কহিয়া যেন শান্তিলাভ করিতেছেন। এইরূপ অবিচ্ছিন্ন আনন্দে দিন যাইতে লাগিল। হঠাৎ একদিন ইঁহার মনে কি এক নবভাবের উদয় হইল। শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের শ্রীমুখপানে চাহিয়া তাঁহার নয়নযুগল হইতে দরদরিতধারে অশ্রু-বিসর্জ্জন হইতে লাগিল। তখন ভাবাবেশে মৃদুমন্দস্বরে পদ ধরিলেন :—

স্বরূপ রামানন্দে গোরা সঙ্গেতে লইয়া।
ভাবাবেশে জগন্নাথে কহেন ডাকিয়া ॥
আমি তোমায় না দেখিলে মরি।
তুমি আমায় চাহনাক ফিরি ॥
আহিরিণী হাম গোয়ালিনী।
তুহুঁ রসময় গুণমণি ॥
নয়নকমল দল জনু।
শিরীষ কুসুম জিনি তনু ॥
ভুরুযুগ কামের কামান।
কোটি চাঁদ জিনিয়া বয়ান ॥
আঁখিঠারে মজাইলে প্রাণ।
সদা মন করে আনচান ॥

অবলা সরলা কুলবালা।
ঘরে পরে কি বিষম জ্বালা॥
মোহে করি বাউলীর ধারা।
বঁধু তুহুঁ উদাসীন পারা॥

—:•:—

কি আর বলিব বঁধু কি আর বলিব।
মনের মরম কথা কাহারে কহিব॥
আপন জনারে বঁধু করিয়াছি পর।
ঘর কৈনু কানন কানন কৈনু ঘর॥
রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি।
পাইব বলিয়া বঁধু তোমার পীরিতি॥
শৈলসম দৌনকুল ঠেলিনু চরণে।
সতীর ধরম কিছু না গণিনু মনে॥
এতেকেও বঁধু যদি তোমা নাহি পাও।
শ্যামকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ ত্যজিবাও॥
অবলা সরলা মোরে রূপে ভুলাইয়া।
আঁখিঠারে আনিয়াছ ঘর ছোড়াইয়া॥
এবে পর হেন মোরে করিছ অন্তরে।
ত্যজিব পরাণ, বধ লাগুক তোমারে॥

এইরূপ আক্ষেপ অনুরাগে উদ্বেলিত হইয়া বাত্যাহত কদলীবৃক্ষের ন্যায় ইঁহার সেই বিশাল দেহখানি একেবারে ভূতলে নিপতিত হইল। কার সাধ্য সেই অবস্থায় ইঁহাকে ধরিয়া রাখে? ইঁহার সেই হৃদয়-বিদারক আর্ত্তি, সেই করুণ রোদন, সেই প্রবল অশ্রুধারা, সেই বিরহব্যাকুলভাব যিনি দেখিতেছেন, তিনি আর না কাঁদিয়া থাকিতে

পারিতেছেন না। মহাপাষণ্ডীর মনও বিগলিত হইতেছে। সেখানে লোকে লোকারণ্য হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে মশাল জ্বলিতেছে। বড় বাবাজী মহাশয় এক একবার গড়াগড়ি দিয়া জগমোহনের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যাইতেছেন। বেগতিক দেখিয়া সকলে ধরাধরি করিয়া ইঁহাকে জগমোহনের বাহিরে লইয়া আসিলেন। ইহাতে স্থির হওয়া দূরে থাক্, উৎকণ্ঠা আরও বাড়িয়া গেল। ফুকরিয়া ফুকরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। যখন ভূমিতলে গড়াগড়ি দিতেছেন, তখন বোধ হইতেছে যেন ইঁহার হস্তপদ বাহিরে নাই। এইভাবে কিছুক্ষণ থাকিয়া একেবারে অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হইল। হস্তপদের গ্রন্থিসকল শ্লথ হইয়া গেল। অতি নিপুণভাবে লক্ষ্য না করিলে শ্বাসক্রিয়া হইতেছে কিনা, তাহা ধারণা করা কষ্টকর হইয়া পড়িল। ইঁহার এরূপ অবস্থা দেখিয়া সঙ্গিগণের মধ্যে অনেকেই অধীর হইয়া পড়িলেন। সকলেরই মুখে এক কথা, "হায় কি হইবে! কি উপায়ে দাদাকে প্রকৃতিস্থ করা যাইবে!!"

এই সময় হঠাৎ গৈরিকবসনধারী, আকর্ণবিস্তৃতনয়ন, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, নাতিদীর্ঘ, নাতিখর্ব্ব, অতিতেজস্বী একটী সাধু ইঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া বলিতে লাগিলেন, "বাবা, তোমরা কোন ভয় করিও না। মনুষ্যশরীরে এরূপ অপূর্ব্বভাবের সমাবেশ কদাচিৎ দেখা যায়। আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রীগ্রন্থে দেখিতে পাই, শ্রীমন্মহাপ্রভুর এইরূপ ভাব হইত। এই মহাত্মার দেহে যে ভাব বিকাশ পাইয়াছে, ইহার নাম "প্রলয়োত্থ সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাব।" তোমরা কেহ যদি গান জান, তবে আমি যেরূপ ভাব বলি, সেইরূপ ভাবের একটী গান কর। দেখিবে মহাত্মা অচিরে চৈতন্যলাভ করিবেন।" তখন বড় বাবাজী মহাশয়ের অভিন্নহৃদয় নবদ্বীপ দাদা আশ্বস্ত হইয়া

বলিলেন, "মহাশয়, আমরা ত কোন গান জানি না; তবে আপনি যে ভাবটি বলিবেন, যদি অন্ততঃ মুখের কথাতেও পারি, সেই ভাবটি প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।" তখন সাধু বলিলেন, "দেখ, যখন প্রথম এইস্থানে গান আরম্ভ হয়, তখন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতীর আক্ষেপ অনুরাগের ভাব লইয়া গান হইতেছিল; উহা আমি শুনিয়াছি। সেই ভাবাবেশে ইঁহার এইরূপ অবস্থা হইয়াছে। অতএব শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক শ্রীমতীর সান্ত্বনাসূচক একটী পদ যদি তুমি গাহিতে পার, দেখিবে অবিলম্বে মহাপুরুষ চৈতন্যলাভ করিবেন।" সাধুর কথা শুনিয়া নবদ্বীপ দাদা নিমীলিত নেত্রে একটু ভাবিয়া একটী পদ গাহিতে লাগিলেন :—

"অকারণে কেন, এত অনুযোগ, শুন রাধে বিনোদিনি।
তুমি গো আমার, পরাণপুতলী, তোমা বিনু নাহি জানি॥
কতেক রমণী, বরজ নগরে, কাহার করিব নাম।
নিশি দিশি মুঞি, শয়নে স্বপনে, জপিয়ে তোমার নাম॥
উঠ গো কিশোরী; মান পরিহরি, শপতি আমার লাগে।
হেন দশা দেখি, পরাণ বিদরে, কহিনু তোমার আগে॥"

এই পদটী গীত হইবামাত্র বড় বাবাজী মহাশয় যেন চমকিয়া উঠিলেন। তখন ইঁহার দেহে যুগপৎ অশ্রু, কম্প, পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকার প্রকাশ পাইল। দেখিয়া সকলেই আশ্বস্ত হইলেন এবং সাধুকে শত শত ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। ঐ পদটীই বার বার গান করিতে করিতে ক্রমে ইঁহার ভাব সংবরণ হইলে ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন। সকলেই তখন প্রেমানন্দে 'গৌরহরিবোল' বলিয়া উচ্চ-ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। ইঁহার ধূলধূসরিত অঙ্গখানিতে কোনরূপ আঘাত লাগিয়াছে কিনা, সঙ্গিগণ তখন তাহাই দেখিতে লাগিলেন। মহাপুরুষের

কোন দিকে লক্ষ্য নাই। পুনরায় তিনি কীর্ত্তনের সুর ধরিবার উদ্যোগ করিতেই সঙ্গিগণের অনিচ্ছা বুঝিতে পারিয়া রামকৃষ্ণ দাস বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "জগন্নাথের ভোগের সময় হইয়াছে, চলুন আমরা একটু নির্জ্জনে গিয়া বসি।" বড় বাবাজী মহাশয় এই কথা শুনিয়া সঙ্গিগণসহ শ্রীমন্দিরের পশ্চাতে একটি বৃক্ষতলে গিয়া উপবেশন করিলেন। আগন্তুক লোকসকল ইহার চারিদিকে ঘিরিয়া বসিল। কিছুক্ষণ পরে পূর্ব্বোক্ত গোপাল বাবু বলিলেন, "আমি একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব ভাবিয়াছিলাম; কিন্তু আপনি বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন; জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাইতেছি না।"

বড় বাবাজী। বল, স্বচ্ছন্দে বল।

গোপাল। আজ্ঞে, আপনার শ্রীমুখে যখনই কীর্ত্তন শুনি, তখনই কেবল গৌরাঙ্গের রাধাভাব ভিন্ন অন্য কিছুই শুনিতে পাই না। অন্যভাব কি আমাদের লইতে নাই?

বড় বাবাজী। তবে শুন, শ্রীগৌরাঙ্গ আমার ভাবনিধি। এরূপ ভাব নাই, যাহা শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীঅঙ্গে নাই; কিন্তু তাঁহার অবতার-গ্রহণের প্রধান উদ্দেশ্যই রাধাভাবাস্বাদন। এই রাধাভাব আস্বাদনের জন্যই তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণ। শ্রীরাধার ভাবকান্তি লইয়াই শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার; অতএব তাঁহাকে যিনি সেইভাবে ভজিবেন, তিনিই তাঁহার অন্তরঙ্গ। আরও দেখ, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর ত অনেক সঙ্গীই ছিলেন, তবে স্বরূপ ও রামানন্দ এত প্রিয় হইলেন কেন? তাহার কারণ—স্বরূপ সর্ব্বদাই ললিতার ভাবে এবং রামানন্দ রায় বিশাখার ভাবে বিভাবিত থাকিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনে যখন যে ভাবটীর উদয় হইত, এই দুইজনেই তাহার পুষ্টিসাধন করিতেন। উঁহারা প্রভুকে রাধারাণী ভিন্ন অন্য কিছুই মনে করিতেন না। সেই জন্য প্রভুও

এই দুইজনকে লইয়াই রস আস্বাদন করিয়া সুখ পাইতেন। যে ব্যক্তি যে বস্তুর অভিলাষ করে, তাহাকে সেই বস্তুর পরিবর্ত্তে অন্য বস্তু দিলে সে কি সন্তুষ্ট হয়? তুমি পিপাসিত হইয়া পানীয় জল চাহিলে তোমাকে কেহ দুগ্ধ দিলে তোমার কি সেরূপ আনন্দলাভ হয়? বিশেষতঃ গোপীভাবই আমাদের একমাত্র সাধন। যিনি মধুরভাবে রাধাগোবিন্দের উপাসনা করিবেন, তিনি শ্রীগৌরাঙ্গকে রাধারাণী ভাবিয়া নিজে তাঁহার কিঙ্করী গোপী হইয়া উপাসনা না করিলে কিরূপে লীলায় প্রবেশ হইতে পারে? তাই বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত বলেন :—

ভাবনিধি শ্রীগৌরাঙ্গে ভাবের শাবল্য।
সব ভাব হৈতে রাধাভাবের প্রাবল্য॥
সব ভাব হইতে গোরার রাধাভাব সার।
রাধিকার ভাবে হয় সুখ পারাবার॥
গোপীভাব নিজ দেহে অঙ্গীকার করি।
গুরু-আনুগত্যে চিন্ত গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
গৌরাঙ্গ শ্রীরাধারাণী শ্রীগুরু মঞ্জরী।
তাঁর দাসীভাব সদা অঙ্গীকার করি॥
এই ভাবে গৌরলীলা করিলে ভাবন।
হেথায় গৌরাঙ্গ পাবে ব্রজে কৃষ্ণধন॥
কাহারও কোনও ভাব নিন্দা না করিবে।
নিন্দাশূন্য নম্রভাবে গৌরাঙ্গ ভজিবে॥

বড় বাবাজী মহাশয়ের উপদেশ শুনিয়া গোপাল বাবুর মনের সন্দেহ ঘুচিল। তিনি অতিশয় আনন্দসহকারে বলিতে লাগিলেন, "আমার আজ পরম শুভদিন, যেহেতু আমি কলিহত মায়ামুগ্ধ বহির্মুখ জীব হইয়াও অতি নিগূঢ় গৌরাঙ্গতত্ত্ব অবগত হইলাম। আজ অধিক

পরিশ্রান্ত হইয়াছেন এবং রাত্রিও অধিক হইয়াছে ; চলুন, এক্ষণে বাসায় যাওয়া যাক্।” বড় বাবাজী মহাশয় বলিলেন, “তোমরা যাও, আমরা আজ এখানেই থাকিব।” ক্রমে ক্রমে অধিকাংশ লোক বিদায়গ্রহণ করিল। ইঁহার অন্তরঙ্গ সঙ্গিগণমাত্র রহিলেন। জনৈক ভক্ত কিছু মহাপ্রসাদ আনিয়া দিলে, ইঁহারা সকলে মহাপ্রসাদ পাইয়া সেখানেই সে রাত্রি যাপন করিলেন। অতি প্রত্যূষে যথারীতি ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে স্নানাদি প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া পুনরায় সকলে শ্রীমন্দিরে আসিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মঙ্গল আরতি দর্শন করিলেন। ক্রমে বেলাও যেমন বাড়িতে লাগিল, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবাকার্য্যও যথানিয়মে সম্পন্ন হইতে লাগিল। বেলা দ্বিপ্রহরের সময় শ্রীশ্রীজগবন্ধুর সকালধূপ যেমন শেষ হইল, অমনি জনৈক ভক্ত আসিয়া ইঁহাদিগকে সাদরে বলিলেন, বাবা, কিছু মহাপ্রসাদ গ্রহণ করুন।” বড় বাবাজী মহাশয় প্রেমাবেশে সাশ্রুনয়নে বলিয়া উঠিলেন, “দেখ বাবা, আমরা ভজন সাধন করি না, তথাপি পরমদয়াল প্রভু এত করিয়া খাইতে পরিতে দিতেছেন। আহা! যদি আমরা ভজনপরায়ণ হইতাম, তবে না জানি কি না হইত! হায় রে কঠিন প্রাণ! হায় রে দুষ্ট মন! দয়াময় শ্রীভগবানের এত দয়া—এত করুণা দেখিয়াও তুই দ্রব হইলি না বা তোর ভক্তিবিশ্বাস জন্মিল না। ধিক্ এই মানব-দেহে! ধিক্ আমাদের জ্ঞানের গর্ব্বে! কেবল লোক ভুলাইতে বৈষ্ণব সাজিয়া উদর পূরণের আশায় দেশে দেশে বেড়াইলাম।” এইরূপ আর্ত্তিপূর্ণ বাক্য বলিতে বলিতে সেই ভক্তটির সঙ্গে যাইয়া শ্রীমন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে পঙ্গতে বসিলেন। কিছুক্ষণ পরে প্রেমানন্দে ধ্বনি দিতে লাগিলেন,—‘সাধু অবধান! ফের করো অবধান।

ভ্রমিতে ভ্রমিতে কোটি কোটি কল্প।

দৈবাৎ ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবসেবা ঘটে যদি অল্প॥

তবে জীবের কর্ম্মবন্ধ ছুটি কৃষ্ণপর হয়।
সালোক্যাদি চারি মুক্তি অঙ্গুলি না ছোঁয়॥
তারপর প্রেমভক্তি ক্রমে গোপিকার ভাব।
তারপর মহাভাব শ্রীরাধার স্বভাব॥
সর্ব্বোপরি তত্ত্ব নিতাইগৌরাঙ্গস্বরূপ।
রসরাজ মহাভাব দুঁহু একরূপ॥
যাহা দেখি রায় রামানন্দ মুরছিত।
তাহা এক শ্বপচ-বৈষ্ণবসেবায় লভ্য॥

ইত্যাদি নানারূপ ধ্বনি দিতে দিতে প্রেমানন্দভরে সকলে মহাপ্রসাদ পাইয়া সিংহদ্বারের বহির্ভাগস্থিত একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষতলে বসিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রামলাভ করিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বিবরণ

দিবা অবসানকালে ক্রমে ঐ বৃক্ষতলেই অনেক লোক আসিয়া বড় বাবাজী মহাশয়ের সহিত মিলিত হইতে লাগিল। চব্বিশ পরগণা-নিবাসী রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় নামক জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তথায় উপস্থিত হইয়া অতি ব্যাকুলভাবে বড় বাবাজী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, জগন্নাথদেবের ঈদৃশ মূর্ত্তি কেন হইল, জানিবার জন্য আমার মনে বড়ই অভিলাষ জন্মিয়াছে। আমার বিশ্বাস, আপনার মুখে এই বিষয়টী শুনিলেই আমার সন্দেহ মিটিবে।" বড় বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "বাবা, আপনি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, আমাদের পিতৃতুল্য। আমি মূর্খ, কেবল লাভ, পূজা ও প্রতিষ্ঠার আশায় সাধু সাজিয়াছি। আমার কথা শুনিয়া কি আপনার তৃপ্তি হইবে?" বৃদ্ধ বলিলেন,

"বাবা, তুমি আমার সন্তানতুল্য, এ কথা ঠিক্। কিন্তু গত কল্য তোমার অঙ্গে যে মহাভাবের বিকাশ দেখিয়াছি, ঐরূপ ভাব সামান্য মানবে সম্ভবে না। আবার তোমার মুখে শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্ব শুনিয়াও আমি বড় প্রীতিলাভ করিয়াছি। অতএব শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের তত্ত্বটী আমায় বলিয়া আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।" বড় বাবাজী মহাশয় বৃদ্ধকে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন :—

"একদিন দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতি প্রধানা ষোড়শ মহিষীর মধ্যগত হইয়া নিশাভাগে শয়ন করিয়া আছেন। স্বপ্নাবস্থায় হঠাৎ দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া 'হা রাধে হা রাধে' বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কিছুতেই তাঁহার ক্রন্দন থামে না, অগত্যা রুক্মিণী দেবী প্রাণবল্লভের চরণে হাত দিয়া জাগাইতে বাধ্য হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ নিদ্রাভঙ্গের পর একটু লজ্জিত হইলেন এবং অতি সন্তর্পণে নিজ ভাব সংগোপন করিলেন। মহিষীগণ তাঁহার এরূপ বিষাদের কারণ জিজ্ঞাসা করায় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র "কি জানি, আমার ত কিছুই মনে নাই" বলিয়া পুনরায় নিদ্রিত হইলেন। প্রকৃততত্ত্ব জানিবার জন্য মহিষীগণের হৃদয়ে অত্যন্ত ব্যগ্রতা জন্মিল। তখন সকলেই পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, 'দেখ, আমরা এই ষোড়শ সহস্র মহিষী ; কুলে, শীলে, রূপে, গুণে কোন বিষয়েই কেহ নিন্দনীয়া নহি, তথাপি আমাদের প্রাণবঁধু অপর রমণীর জন্য এত ব্যাকুল কেন ? ইহা ত বড়ই বিস্ময়ের কথা ! রাত্রিতে স্বপ্নাবস্থায়ও যে রমণীর জন্য প্রভু এত ব্যাকুল, সে রমণীই বা কিরূপ রূপগুণবতী ?' তখন রুক্মিণী দেবী বলিলেন, "আমরা শুনিয়াছি, বৃন্দাবনে রাধানাম্নী এক গোপকুমারী আছে, তাহার প্রতি নাকি প্রাণেশ্বর বড়ই আকৃষ্ট ছিলেন। তাহাকে তিনি কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছেন না।" সত্যভামা দেবী বলিলেন, "হাজার হউক, সে গোপকন্যা বই ত নয়। তাহার উপর

প্রাণকান্তের এত আসক্তি কেন? যাহা হউক, আমার মতে, রোহিণীমাকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে প্রকৃত বিষয় অবগত হইতে পারিব, কারণ তিনিও বৃন্দাবনে ছিলেন। তাৎকালিক সকল ঘটনাই তিনি সম্পূর্ণ অবগত আছেন।" সকলেই এই প্রস্তাবে অভিমত প্রকাশ করিলেন। ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া রাজসভায় গমন করিলেন। যথাসময়ে অন্তঃপুরে আসিয়া স্নানাদি সমাপন পূর্ব্বক আহারে বসিলেন। রাজভোগ আসিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। উদ্ধবাদি সখাবৃন্দ লইয়া তিনি ভোজনব্যাপার সমাধা করিয়া আচমনান্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রামপূর্ব্বক পুনর্ব্বার রাজসভায় গমন করিলেন। এই অবসরে মহিষীগণ রোহিণী দেবীকে পূর্ব্ব রাত্রির ঘটনা বলিয়া ব্রজবৃত্তান্ত জানিতে উৎসুক হইলেন। মা রোহিণী কহিলেন, "মা সকল, আমি যদিও ব্রজলীলার সমুদয় ঘটনাই অবগত আছি, কিন্তু জননী হইয়া পুত্রের গুপ্তলীলা-রহস্য কিরূপে বলিব? যদি রামকৃষ্ণ কেহ আসিয়া এ সকল কথা শুনিতে পায়, তবে লজ্জার আর সীমা থাকিবে না।" তখন মহিষীগণ বলিলেন. "মা, যে কোন উপায়েই হউক, আমাদিগকে ব্রজলীলার কথা শুনাইতেই হইবে।" রোহিণী দেবী বলিলেন, "তবে এক উপায় কর, সুভদ্রা দ্বারে দ্বারী থাকুক; যেন কাহাকেও ভিতরে আসিতে না দেয়। আমি নিঃসঙ্কোচে তোমাদিগের নিকট ব্রজলীলার কথা বর্ণনা করিতেছি।" রোহিণী দেবীর আদেশ প্রতিপালিত হইল। তিনি সুভদ্রার প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "দেখ, সুভদ্রে! রামকৃষ্ণ আসিলে কিছুতেই ভিতরে আসিতে দিবে না।" সুভদ্রা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া দ্বাররক্ষা করিতে লাগিলেন। মহিষীবৃন্দ মাতাকে চারিদিকে ঘিরিয়া বসিলে তিনি সুমধুর ব্রজলীলা বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

এদিকে রাজসভায় রামকৃষ্ণ দুই ভাই চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। কিছুতেই তাঁহারা রাজসভায় থাকিতে পারিলেন না। দুই ভাই উৎকণ্ঠিতচিত্তে অন্তঃপুরের দিকে ছুটিলেন। আসিয়া দেখেন, সুভদ্রা দ্বারদেশে দণ্ডায়মানা। তখন তাঁহারা সুভদ্রাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখানে কেন? দ্বার ছাড়িয়া দাও, আমরা ভিতরে যাই।" সুভদ্রা বলিলেন, "মা রোহিণী তোমাদিগকে এখন অন্তঃপুর যাইতে নিষেধ করিয়াছেন। এখন যাইতে পারিবে না।" কারণ বুঝিতে না পারায় ইঁহারা উভয়েই সেখানে দাঁড়াইয়া উৎকর্ণভাবে মহিষীদিগের সহিত মা রোহিণী দেবীর কথোপকথন শুনিতে লাগিলেন। মা রোহিণী দেবী মহিষীদিগের নিকট যখন রাসলীলা বর্ণনা করিতেছিলেন, তখন দুই ভাই দুই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অতিশয় মনোযোগের সহিত সেই সকল রসকথা শুনিতে লাগিলেন। শুনিতে শুনিতে উভয়ের শ্রীঅঙ্গেই অদ্ভুত প্রেমবিকার লক্ষণসকল দৃষ্ট হইতে লাগিল। ক্রমে দুই ভাই প্রেমানন্দে অধীর হইয়া পড়িলেন। নয়নধারায় উভয়েরই বক্ষস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া সুভদ্রারও তদ্রূপ অবস্থা হইল। যখন মা রোহিণী শ্রীমতীর প্রেমবৈচিত্র্য বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন বলরাম আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। প্রেমবিকারে তাঁহার হস্তপদ ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইতে লাগিল। যখন মা রোহিণী দেবী শ্রীমতীর সহিত বিলাস বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণেরও তদ্রূপ দশা হইল। তাঁহার হস্তপদ ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া গেল এবং সুভদ্রাও একেবারে নিশ্চল হইয়া পড়িলেন। হস্তপদ যে কোথায় প্রবেশ করিয়াছে, দেখিয়া সহজে বুঝিতে পারা যায় না। তিন জনেই স্থির হইয়া স্থাবরবৎ নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। সুদর্শন গলিয়া লম্বিত-ভাব ধারণ করিলেন।

এমন সময় স্বচ্ছন্দগতি দেবর্ষি নারদ ভগবদ্দর্শনের অভিপ্রায়ে দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন। রাজসভায় যাইয়া শুনিলেন যে, রামকৃষ্ণ দুইভাই অন্তঃপুরে গিয়াছেন। দেবর্ষি নারদের সর্ব্বত্র অবাধগতি; অন্তঃপুরের দ্বারদেশে যাইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তিনি স্তম্ভিত হইলেন। এরূপ দৃশ্য তিনি কখনও দেখেন নাই। ইহার কারণ কি ভাবিতে ভাবিতে সেখানে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে যখন মা রোহিণী দেবী শ্রীরাধিকার বিরহদশা বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন সকলের দেহ আবার পূর্ব্ববৎ হইল। এই অবসরে দেবর্ষি নারদ নানারূপ স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীভগবান্ নারদের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "নারদ, আজ বড় আনন্দের দিন। তুমি কি বর চাও, বল।" নারদ করযোড়ে উত্তর করিলেন, "প্রভো, বরের কথা পরে হইবে। অগ্রে আমার মনের সন্দেহ দূর করুন। এই যে আপনাদের একটী অপূর্ব্ব ভাববিকারাবস্থা দেখিলাম, এটী কি এবং কি কারণে আপনারা এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা আমাকে বলিতে হইবে।" শ্রীভগবান্ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "দেখ নারদ, মা রোহিণী দেবী মহিষীগণের নিকট ব্রজলীলার কথা বলিতেছিলেন। মধুর ব্রজলীলার এইরূপ অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি যে, যে কোন স্থানে যে কোন প্রকারে সেই অপূর্ব্ব লীলাকথার ব্যাখ্যা হইবে, তথায় আমাদিগকে যাইতেই হইবে। এই শক্তিবলে রাজসভা হইতে আমরা অন্তঃপুরে আসিলাম। আসিয়া দেখি, মা রোহিণী দেবী ভগিনী সুভদ্রাকে দ্বারদেশে রাখিয়াছেন। আমাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ নিষেধ। মাতৃদেবীর নিষেধ হেতু রাসলীলা-কীর্ত্তনস্থানে যাইতে না পারায় দ্বারদেশে থাকিয়া সেই রসময়ী লীলাকথা শুনিতেছিলাম। শুনিতে শুনিতে ঐরূপ অবস্থা হইয়াছিল। তুমি যে কখন আসিয়াছ, আমরা জানিতে

পারি নাই।" তখন নারদ বলিলেন, "প্রভো, আমার অন্য বরে অভিলাষ নাই; আমাকে এই বর দিন যে, আপনাদের চারিজনের একত্রে এই অপরূপ রূপটি পৃথিবীতে প্রকট হইয়া সর্ব্বসাধারণের নয়নগোচর হউক।" ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "তথাস্তু; এ বিষয়ে আমি আরও দুইজনের নিকট প্রতিশ্রুতি আছি। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন বহুকাল যাবৎ কঠোর তপস্যা করায় ব্রহ্মার প্রার্থনামতে আমি নীলাচলে দারু-মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইব বর দিয়াছি এবং বিমলাদেবীর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া সর্ব্বসাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণের জন্য স্বীকৃত আছি। অতএব নীলাচলে দারুমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক এই তিন উদ্দেশ্য সাধন করিয়া তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিব।" নারদ অতি আনন্দভরে শ্রীভগবান্‌কে প্রণাম করিয়া বীণায় হরিগুণ গান করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। রোহিণী মাতা লজ্জিতা হইবেন বলিয়া রামকৃষ্ণ দুই ভাই একটু অন্তরালে চলিয়া গেলেন। ঐ চতুর্ধা মূর্ত্তিই এই জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা ও সুদর্শনরূপে বিরাজ করিতেছেন।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বড় বাবাজী মহাশয়ের মুখে এই সুমধুর কাহিনী শ্রবণ করিয়া আনন্দভরে কহিলেন, "বাবা, আমার আর একটি সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। ব্রজলীলার কথা শুনিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রা দেবীর ঐরূপ হইল; কিন্তু মা রোহিণী কিংবা মহিষীগণের কোনরূপ অবস্থাপরিবর্ত্তন ঘটিল না ইহার কারণ কি?" বাবাজী মহাশয় একটু হাসিয়া কহিলেন, "এ বিষয়ে একমাত্র অভিমানই মূলীভূত কারণ। অভিমান থাকিলে মধুর ব্রজলীলা পূর্ণভাবে হৃদয়ে পরিস্ফুট হইতে পারে না। অভিমান লীলাস্ফূর্ত্তির মহৎ অন্তরায়। মা রোহিণী দেবীর মাতৃ-বাৎসল্য অভিমান। বাৎসল্য-প্রেমের নিকট মধুর প্রেম লজ্জিত-ভাবে অতিদূরে অবস্থিতি করে। আর মহিষীগণের জাতি, কুল, শীল ও

রূপের অভিমান। ইহারা প্রায়ই বলিয়া থাকেন যে, ব্রজগোপীগণ বৈশ্য-জাতি বনচারিণী গোয়ালিনী, উহাদের আবার ভাব-প্রেম কোথা হইতে আসিবে? এই অভিমানবশতঃই মধুর ব্রজলীলা-রসকথা শ্রবণ করিয়াও মহিষীগণের হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার বা ভাবের বিকাশ হয় নাই।"

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তখন প্রেমানন্দে গদগদকণ্ঠে বলিলেন, "আমার বহুদিনের সন্দেহ ঘুচিল, বড়ই আনন্দ পাইলাম।" এই বলিয়া তিনি বাবাজী মহাশয়কে প্রেমালিঙ্গন করিলেন এবং মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন, "বাবা, আমি অকপটচিত্তে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি, তুমি জগতের জীব উদ্ধার কর। অতি নিগূঢ় লীলাকথাও তোমা দ্বারা লোকে সহজে বুঝিতে পারিবে। বাবাজী মহাশয় তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। অপরাপর সকলেই প্রেমানন্দে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা-আরতির সময় হইয়াছে দেখিয়া সকলেই শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা

সন্ধ্যা-আরতি শেষ হইয়া গেলে একটী পাণ্ডা বলিল, "আগামী কল্য শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব নিজ মন্দিরে যাইবেন।" শুনিবামাত্র বড় বাবাজী মহাশয়ের মনে ভাবী বিরহভাব আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি সেই ভাবের কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন :—

আবেশের ভরে ধরি স্বরূপেরে,
কহিছে গৌরাঙ্গ রায়।
শুন গো সজনী, প্রভাতা রজনী,
হইলে কি হবে হায়॥

বরজ ছাড়িয়া, নিঠুর হইয়া,
যাইবে নিঠুর হরি।
কেমন করিয়া, হৃদয় বাঁধিয়া,
রহিব ধৈরয ধরি ॥
নিদারুণ বিধি, এ কি তোর বিধি,
দিয়া নিধি দুখিনীরে।
সাধ না পূরিতে, হৃদয় হইতে,
লইয়া যাইবি দূরে ॥
অনলে পশিয়া, কিবা বিষ খাইয়া,
ত্যজিব এ পাপ প্রাণ।
বঁধুয়া বিহনে, এই বৃন্দাবনে,
না রুচিবে অন্নপান ॥

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে লক্ষ্য করিয়া ইত্যাদি নানারূপ বিলাপপূর্ণ পদাবলী গাহিতে লাগিলেন। কে তাহার মর্ম্ম বুঝিবে? ক্রমে রাত্রি হইল, ভক্তগণ নিজ নিজ স্থানে গমন করিলেন। বড় বাবাজী মহাশয়ের মন আজ বড় বিমর্ষ। সর্ব্বদাই যেন কিছু অন্যমনস্ক। নিজভাব সংগোপন করিয়া ভক্তের ইচ্ছায় শ্রীমন্দিরের পার্শ্ববর্ত্তী কোনও এক উদ্যানে সে রাত্রি যাপন করিয়া রজনী প্রভাত হইলে নিত্যকৃত্য সমাপনান্তে শ্রীমন্দিরে গমন করিলেন। এখানে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব এক অপূর্ব্ব লীলা-রহস্য প্রকাশ করিয়াছেন। রত্নবেদী পরিত্যাগপূর্ব্বক জগমোহনে আসিয়া বসিয়াছেন। অসংখ্য রমণীগণ প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন দিতেছেন। কেহ কেহ বা প্রেমভরে প্রণয়রোষ বশতঃ তাঁহার শ্রীঅঙ্গে কঙ্কণের আঘাত করিতেছেন। মহাহুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। বড় বাবাজী মহাশয় অবাক্ হইয়া এই অপূর্ব্ব লীলারহস্য দর্শন করিতেছিলেন, হঠাৎ ইঁহার

ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল; আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। একেবারে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া গিয়া জগন্নাথদেবকে জড়াইয়া ধরিলেন। ইঁহার পুলকিত অঙ্গের কম্পে বিগ্রহ কাঁপিতে লাগিলেন। নয়নদ্বয় হইতে দরদরিতধারে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। তখন প্রেমাবেশে গদগদকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "হাহে বঁধু, বিরহবিধুরা সরলা ব্রজগোপীদিগকে চির-বিরহ-সাগরে মগ্ন করিবার জন্য আজ তোমার এত প্রীতি ও ভালবাসার ছড়াছড়ি কেন? তুমি চিরদিনই শঠ। তুমি যতই প্রণয়বিহ্বলতা দেখাও না কেন এবং পুনরাগমনের আশাভরসা দাও না কেন, তোমার প্রণয়কাতরা অবলা সরলা ব্রজগোপীদিগের কোমল প্রাণে আঘাত দেওয়ার জন্য তোমাকে কেহই নিষ্ঠুর বই দয়াল বলিবে না—কপট বই সরল বলিয়া বিশ্বাস করিবে না।" এই কথা বলিতে বলিতে বড় বাবাজী মহাশয় প্রেমভরে কাঁদিয়া আকুল হইলেন।

ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল। দয়িতা পাণ্ডাগণ পট্টডোরী দ্বারা শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের কটিদেশ ও বক্ষস্থল পূর্ব্ববৎ বন্ধন করিয়া পহণ্ডীবিজয় করাইতে লাগিলেন। আজ আর তত লোকের ভিড় নাই; যাত্রিগণ চলিয়া গিয়াছে। অতি অল্পসংখ্যক নীলাচলবাসীই উপস্থিত আছেন। সুতরাং আনন্দের তত আধিক্য নাই। বলরাম, সুভদ্রা ও সুদর্শনকে সঙ্গে লইয়া জগন্নাথদেব রথে উঠিলেন। বড় বাবাজী মহাশয় সম্মুখে যাইয়া রথচক্রের নিকট দাঁড়াইয়া আছেন, আর প্রেমভরে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছেন। এমন সময় রথের টান আরম্ভ করিল। দুইখানি রথ কিছুদূর অগ্রসর হইলে, যেমন জগন্নাথদেবের রথ চলিতে আরম্ভ করিল, অমনি ইনি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে কীর্ত্তন ধরিলেন:—

"রাধাভাবে গোরাচাঁদের ব্যাকুল অন্তর।
রথ ধরি কাঁদে শোকে হইয়া কাপর॥

ক্ষণেক দাঁড়াও বঁধু ক্ষণেক দাঁড়াও।
দুখিনীর পানে নাথ ফিরিয়া তাকাও ॥
নিচয় মরিব বঁধু নিচয় মরিব।
এ হেন নিলাজ প্রাণ কেমনে ধরিব ॥
বড় নিদারুণ বিধি বড় নিদারুণ।
রসময় পিয়া মোর কৈল অকরুণ ॥
ত্যজিয়া পরাণ বঁধু ত্যজিয়া পরাণ।
বিরহ বেয়াধি হ'তে পাব পরিত্রাণ ॥
কি দোষে ত্যজিলে বঁধু কি দোষে ত্যজিলে।
এ হেন পিরীতি পিয়া কেমনে ভুলিলে ॥
দিনে আঁধিয়ার বঁধু দিলে আঁধিয়ার।
সাধের বরজ হ'ল শোকের আগার ॥

এই পদ গাহিতে গাহিতে অধীর হইয়া পড়িলেন। ইঁহার তাৎকালিক ভাব যে একবার দেখিতেছে এবং বিরহব্যঞ্জক আর্ত্তি ও বিকলতাপূর্ণ কীর্ত্তন যে একবার শুনিতেছে, সেই কাঁদিয়া অস্থির হইতেছে। ক্রমে ক্রমে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথ দৃষ্টির অগোচর হইলে ইনি হতাশপ্রাণে রুদ্ধকণ্ঠে "হায় নিঠুর বঁধু। একেবারে দৃষ্টির পথ অতিক্রম করিলে!" এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পড়িলেন। সঙ্গিগণ যথাসাধ্য শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। সাত্ত্বিক বিকার সকল যেন অবসর পাইয়া ইঁহার সর্ব্বাঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করিল। বহুক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ করিলেন। এইরূপ ভাবাবেশ, এইরূপ সাত্ত্বিক বিকার ইঁহার দেহে প্রায়ই দৃষ্ট হইত।

নীলাচল বাসকালে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শন, শ্রীশ্রীটোটাগোপীনাথ দর্শন, শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধিদর্শন এবং সমুদ্রস্নান প্রভৃতি যে কোন

কার্য্যে বড় বাবাজী মহাশয়ের গতবিধি হইত, সর্ব্বত্রই শ্রীমন্মহাপ্রভুকে অগ্রে করিয়া তাঁহার আনুগত্যে গমন করিতেন, এটী ইঁহার স্বাভাবিক গুণ। কেহ কখন ইহার প্রকৃত মর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলে ইনি বলিতেন, "দেখ, নীলাচলে আমাদের আসিবার উদ্দেশ্যই মহাপ্রভুদর্শন ও তাঁহার মধুর লীলারসাস্বাদন। তিনি যে যে স্থানে যে যে লীলা করিয়াছেন, সেই সেই স্থান দর্শন করিয়া তাঁহার সেই সেই লীলা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহার আলোচনা করিতে করিতে আনন্দ-লীলাময়-বিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তাঁহার হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তি আনন্দময়ী লীলা যদি কিঞ্চিৎ কৃপা করেন, তবে ত্রিজগৎবাসী নরনারী, স্থাবরজঙ্গম, পশুপক্ষী সকলেই আনন্দসাগরে ডুবিয়া যাইতে পারে; নচেৎ সহস্র চেষ্টা করিলেও লীলা-রস-সিন্ধুর এক বিন্দুও স্পর্শ হইবে না; একথা ধ্রুব সত্য।" এই বলিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থতা লাভ করিয়া ধীরে ধীরে গমন করিতে উদ্যত হইলে সকলে বলিলেন, "চলুন, লক্ষ্মীবিজয় দেখিবেন।" বড় বাবাজী মহাশয় কাতরভাবে বলিলেন, "না, আমি আর কোথাও যাইতে পারিতেছি না। বিশেষ কথা—লক্ষ্মীদেবী তাঁহার প্রাণবল্লভের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করেন, অবশ্য উঁহারা দেবী, উঁহাদের পক্ষে সকলই সম্ভবে; কিন্তু আমরা মানুষ, আমাদের প্রাণে উহাতে বড়ই আঘাত লাগে। প্রেমিকা কখনও প্রেমময়ের প্রতি ঐরূপ ব্যবহার করিতে পারেন না।" ইত্যাদি অনেক কথা বলিতে লাগিলেন। ভক্তগণের আর 'লক্ষ্মীবিজয়' দেখা হইল না।

এইরূপভাবে দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল। বড় বাবাজী মহাশয় ও ইঁহার অনুগত সঙ্গিগণের নামসংকীর্ত্তন, শ্রীশ্রীজগন্নাথদর্শন, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর গুণগান ও তাঁহার লীলানুশীলন ভিন্ন অন্য কোন কাজ নাই। আহারের জন্য কোন চিন্তা নাই। যে দিন যেমন মহাপ্রসাদ উপস্থিত হয়, তাহা গ্রহণ করিয়া সকলে সমুদ্রস্নান করিতে

যান। তৎপর যদি কোথাও মহাপ্রসাদ পাইবার নিমন্ত্রণ থাকে, তবে সেই স্থানে যান। নচেৎ লালাবাবু প্রভৃতির ছত্রে গিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, লালাবাবু ও চিন্তামণি বাবুর ছত্রের ম্যানেজার শ্রীপ্যারীমোহন দাস মহাশয় বড় বাবাজী মহাশয়কে বিশেষ-ভাবে ভক্তি করিতেন। বড় বাবাজী মহাশয় ও ইঁহার সঙ্গিগণ ছত্রে মহাপ্রসাদ পাইতে গেলে তিনি নিজ তরফ হইতে নানাবিধ প্রসাদ আনাইয়া পৃথক্‌ভাবে ইঁহাদিগকে সেবা করাইতেন। ইঁহাদিগের বিশেষ একটি নিয়ম ছিল যে, মহাপ্রসাদ পাইবার সময় কোনও জাতিবিচার করিতেন না। "ইনি গৃহস্থ, ইনি বৈষ্ণব, ইনি পঙ্গতে বসিবার উপযুক্ত নন" ইত্যাদি বিচার ও ব্যবস্থা বড় বাবাজী মহাশয় আদৌ পছন্দ করিতেন না। ইনি বলিতেন, "তুলসীপত্রদ্বারা যাহা শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হইবে, উহা মহাপ্রসাদ জ্ঞানে গ্রহণ করিবে। মহাপ্রসাদ কখনও স্পর্শদোষে নষ্ট হয় না। নষ্টদোষ ঘটাইলে অনিষ্ট বই ইষ্টের সম্ভাবনা নাই।" এইরূপ রীতি শাস্ত্রমতে যুক্তিযুক্ত হইলেও অনেক বৈষ্ণবের অনুমোদিত নয়। এইজন্য অনেকেই বড় বাবাজী মহাশয়ের উপর এসম্বন্ধে একটু কটাক্ষ করিতেন। তাঁহারা বলিতেন, "ইঁহাদের ভজনসাধন, দীনতা, নামসংকীর্ত্তন ও চরিত্র ইত্যাদি সকলই প্রশংসনীয়, কেবল এই একটী দোষ যে, গৃহস্থ ও বৈষ্ণব একসঙ্গে বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন।" উক্ত প্যারী বাবুর ভ্রাতা জগদীশ বাবু হিন্দুধর্ম্মে নিষ্ঠাবান্ ছিলেন। তিনিও এই বিষয় লইয়া কোন কোন সময়ে তর্ক বিতর্ক করিবার মানসে বড় বাবাজী মহাশয়কে প্রশ্ন করিতেন; কিন্তু ইঁহার একমাত্র সরল উত্তর ছিল,—"বাবা, আমরা বৈষ্ণব নই; কেবল পেটের দায়ে ঘুরিয়া বেড়াই।" বৈষ্ণবোচিত দৈন্য ও নিরভিমানতা ইঁহার অঙ্গের ভূষণ ছিল। কখনও কোন

বিষয়ে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করা কিংবা ব্যবহার বিষয়ে কাহাকেও মানসিক দুঃখ দেওয়া ই হার স্বভাব ছিল না। কেহ কোন কথা বলিলে কড়যোড়ে নম্রভাবে বলিতেন, "আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আপনাদের আদেশ পালন করিতে সমর্থ হই।"

শ্রীবাসুদেব মহারাজ

একদিন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরে কীর্ত্তন শেষ হইবামাত্র শ্রীবাসুদেব রামানুজ দাস (পুরীতে ইঁহাকে সকলে বাসুদেব মহারাজ বলিয়া জানেন; ইনি আচারী সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন সিদ্ধপুরুষ) আসিয়া বলিলেন, "মহাত্মন্, আজ হামারি উহা মহাপ্রসাদ দর্শন করনে হোগা!" ইহারা সকলেই তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলেন। তিনিও "দাসোঽহস্মি" এই বাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক প্রতিদণ্ডবৎ করিয়া দরজায় বারভাইয়া মহাবীরের মন্দিরে গমন করিলেন। এই মহাপুরুষ প্রায়ই এখানে থাকেন। যথাসময়ে ইহারা সমুদ্রস্নান সমাপন করিয়া ঐখানে আসিলেন। আরও অনেক বৈষ্ণব নিমন্ত্রিত ছিলেন। শ্রীবাসুদেব মহারাজ তাঁহাদিগকে পৃথক্‌স্থানে বসাইয়া ইহাদের জন্য আলাহিদা স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। বহুবিধ মহাপ্রসাদের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই মহাপুরুষের মনে আজ এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইয়াছে। ইনি বড় বাবাজী মহাশয়কে এবং কৃষ্ণগোবিন্দকে একস্থানে বসাইয়া নিজ হস্তে প্রসাদ পরিবেশন করিতে লাগিলেন, আর বলিতে লাগিলেন, "এহি দোনো বৈষ্ণবমূর্ত্তিকো দেখ্‌কে হামারি মন্‌মে বৈসে রামলক্ষ্মণ ঐসে ভাব উদ্দীপন হোতা হায়। দেখো বৈষ্ণবগণ! এহি মহাত্মা সাধারণ মনুষ্য নাহি হায়; ইহো নিশ্চয়

ভগবৎপার্ষদ হায়, ঐসে প্রেমভাব হাম্ কভি নাহি দেখা।" এইরূপ ধারণা তাঁহার চিরকাল সমানভাবে ছিল। মহাপ্রসাদ পাইবার পর সকলে তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণতি করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলেন।

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবেরও নিত্য নূতন লীলা হইতে লাগিল এবং বড় বাবাজী মহাশয়েরও নব নব ভাবে নিত্য লীলা হইতে লাগিল। জন্মাষ্টমী, পদ্মবেশ, বালধূপ, নটবর বেশ, রঘুনাথ বেশ, হোরি প্রভৃতি পর্ব্ব উপলক্ষে নিত্য নূতন সংকীর্ত্তন-তরঙ্গে নীলাচলবাসী ভাসিতে লাগিল। মহাসংকীর্ত্তনযজ্ঞে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর আবির্ভাব যেন প্রত্যক্ষীভূত হইতে লাগিল।

শ্রীচন্দনযাত্রা

আজ অক্ষয়তৃতীয়া। পুরীবাসীরা আজ আনন্দে মাতোয়ারা। স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, যুবা সকলেই ফুলচন্দন ও একগাছি ফুলের মালা হাতে লইয়া মহানন্দে শ্রীশ্রীজগন্নাথদর্শনে যাইতেছে। আজ চন্দনযাত্রা উৎসব আরম্ভ। মদনমোহন চন্দন পুকুরে জলকেলি করিবেন, তাই সকলেই ব্যস্ত। বড় বাবাজী মহাশয় সদলবলে কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীমন্দিরে যাইয়া দেখেন, মদনমোহনের শিঙ্গার হইতেছে। কিছুক্ষণ পরেই নানাবিধ মনোহর সাজে সুসজ্জিত হইয়া শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন চতুর্দ্দোলার উপরে বসিলেন। দেবদাসীগণ নৃত্য করিতে করিতে অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে সংকীর্ত্তনের রোল উঠিয়াছে। বড় বাবাজী মহাশয়ও ভাবে ঢুলিতে ঢুলিতে সেই সঙ্গে চলিয়াছেন। যেমন সিংহদ্বার পার হইলেন, অমনি ভাবে মাতোয়ারা হইয়া পদ ধরিলেন :—

গোপীভাবে বিভাবিত শচীর নন্দন।
সঙ্গিগণ সঙ্গে করেন কীর্ত্তন নর্ত্তন॥
আহা মরি কি আনন্দ হেরি চারিপাশে।
মাতিয়াছে নরনারী প্রেমের আবেশে॥
মদনমোহন মোর রাধিকার সঙ্গে।
নৌকাকেলি করিবারে চলিলেন রঙ্গে॥
গোপীগণ দোঁহাকারে লইয়া চলিল।
দোলার উপরি দেখ কত শোভা হইল॥
আধ কাঞ্চনকান্তি আধ চিকণকালা।
আধ গলে গজমতি আধ বনমালা॥
চন্দনে চর্চ্চিত অঙ্গ ভুবন মোহন।
ললিত ত্রিভঙ্গ বাঁকা মুরলীবদন॥

প্রেমাবেশে এই পদটী গান করিতে করিতে বড় বাবাজী মহাশয় সদলে নরেন্দ্র-তীরে যাইয়া উপনীত হইলেন। শ্রীশ্রীমদনমোহন দোলা হইতে অবতরণ করিলেন। তৎক্ষণাৎ একখানি সুসজ্জিত নৌকা আসিয়া উপস্থিত হইলে শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন নৌকায় উঠিলেন। ইঁহারাও নরেন্দ্র সরোবরের তীরে তীরে কীর্ত্তন করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। লোকে লোকারণ্য। ইঁহারা কিন্তু কীর্ত্তনে মাতোয়ারা। ঐ সময়ে যে কেহ ইঁহাদিগকে দেখিতেছে, সেই অনুভব করিতেছে, কে যেন ইঁহাদের আগে আগে নাচিয়া নাচিয়া যাইতেছেন; তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ইঁহারা প্রেমাবেশে নাচিতে নাচিতে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই গান করিতেছেন। বড় বাবাজী মহাশয় পুনরায় ভাবাবেশে গান ধরিলেন :—

নীলাচল হইল যেন মধুর বৃন্দাবন।
নরেন্দ্র হইল আজ কালিন্দীর সম॥

ভাবাবেশে গোরাচাঁদ লয়ে ভক্তগণ।
নরেন্দ্রের চারিপাশে করিছেন কীর্ত্তন॥
হেলে দুলে নেচে যায় উলসিত মনে।
নরেন্দ্র হইল যেন যমুনাপুলিনে॥
সর্ব্ব অঙ্গে মাখিয়াছে সুগন্ধি চন্দন।
প্রতি অঙ্গে শোভে নানা ফুল আভরণ॥
কতক্ষণ নৃত্য করি গোরা নটবর।
আরম্ভিলা জলকেলি ল'য়ে সহচর॥

বড় বাবাজী মহাশয়ের সেই সুদীর্ঘ কলেবর চন্দনে চর্চ্চিত। কীর্ত্তন-শ্রমজনিত ঘর্ম্মে সর্ব্বাঙ্গ হইতে চন্দন গলিয়া পড়িতেছে। কোনও কোনও ভক্ত প্রেমানন্দে উঁহার শরীর হইতে চন্দন তুলিয়া লইতেছেন, পুনরায় কেহ বা চন্দন আনিয়া মাখাইয়া দিতেছেন। ইঁহাকে আজ কেহ চিনিতে পারিতেছে না। প্রায় এক অঙ্গুলি পরিমিত চন্দন সর্ব্বাঙ্গে মাখান; ফুলের মালা গলায় আর ধরে না। ইনি ভাবে বিভোর হইয়া কীর্ত্তনরণে মাতিয়াছেন। যেমন স্ফূর্ত্তি হইল "আরম্ভিলা জলকেলি ল'য়ে সহচর" অমনি ইনি ঝাঁপ দিয়া জলে পড়িলেন। আর চতুর্দ্দিক্ হইতে লোকসকলও জলে নামিতে লাগিল। সে এক অপূর্ব্ব আনন্দ! জলেই নৃত্য জলেই কীর্ত্তন। সকলেই সাঁতারিয়া নরেন্দ্র-সরোবরের মধ্যস্থিত মন্দিরের নিকট যাইয়া নানারূপ জলখেলা করিতে লাগিলেন। কোনও কোনও ভক্ত ঐ মন্দিরের চূড়ায় উঠিয়া লম্ফ দিয়া জলে পড়িতেছেন, আর জলস্থল কাঁপাইয়া গগনভেদী 'হরি হরি' ধ্বনি উঠিতেছে। ক্রমে রাত্রি হইল। শ্রীশ্রীমদনমোহন অনেকক্ষণ নৌকাবিহার করিয়া জলমধ্যস্থ বিলাসমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। তথায় তাঁহার নানারূপ ভোগের ব্যবস্থা হইতে লাগিল। প্রভুর সহিত

তাঁহার অনুগত দাসগণের নিত্যনৈকট্য সম্বন্ধ। যেমন শ্রীশ্রীমদন-মোহনের ভোগসমাধা হইল, অমনি এদিকে মহাপ্রসাদ আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন একটী রসিক ভক্ত বলিয়া উঠিলেন, "বাবাজী মহারাজ, প্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কালবিচারণা।" শুনিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিলেন। বলরাম বাবু ভক্তবৃন্দকে বসাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। তীর হইতে বিলাসমন্দিরে যাইবার পুলের উপরই সকলে বসিলেন। এক এক ভক্ত মনের মত এক এক রকম মহাপ্রসাদ আনিতে লাগিলেন। 'দশের লাঠি একের বোঝা'। সকলেই উপস্থিত ভক্তগণের সহিত অতি পরিতৃপ্তভাবে প্রচুর পরিমাণে মহাপ্রসাদ পাইয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলেন। গভীর রাত্রিতে শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন পুনরায় শ্রীশ্রীজগন্নাথের শ্রীমন্দিরের দিকে চলিলেন। এক্ষণে লোকসংখ্যা তত অধিক নহে; কিন্তু বড় বাবাজী মহাশয়ের দল পরিপুষ্টই আছে; কারণ মহা ঘোর পাষণ্ডী হইলেও যে একবার ইঁহার কাছে বসিয়াছে, কিংবা ইঁহার শ্রীমুখের দুইটী কথা শুনিয়াছে, সে আর ইঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিতেছে না। পুনরায় সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল :—

যমুনায় জলকেলি করি মনোরঙ্গে।
নিকুঞ্জ মন্দিরে সবে চলে রঙ্গে ভঙ্গে॥
চারিদিকে গোপীগণ প্রেমেতে বিভোর।
মাঝে মাঝে নেচে যায় যুগলকিশোর॥
নবজলধর কানু বামেতে কিশোরী।
নবীন জলদে জনু থির বিজুরী॥

ইত্যাদি নানারূপ পদাবলী গান করিতে করিতে সকলে সিংহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন ভিতরে প্রবেশ করিবামাত্র

বড় বাবাজী মহাশয় গোপীভাবে বিভাবিত হইয়া প্রেমাবেশে মধুরস্বরে কীর্ত্তন ধরিলেন :—

"অমনি থাকুক যুগল।
শ্যামের কোলে দিলাম রাই। আনন্দের আর সীমা নাই॥
চল্ বিশাখা (আপন আপন) কুঞ্জে যাই।
যা জানে তা করুক রাই॥"

সকলেই নিঃশব্দে শুনিতে লাগিলেন। ইঁহারা প্রেমানন্দে এই পদটী গান করিতে করিতে শ্রীশ্রীজগন্নাথবল্লভে আসিয়া বিশ্রাম করিলেন; এই-রূপভাবে একুশ দিন যাবৎ চন্দনযাত্রা উপলক্ষে পুরীধামে আনন্দোৎসব হইতে লাগিল।

দ্বিতীয়বার স্নানযাত্রা

কাল কাহারও বাধ্য নয়। দেখিতে দেখিতে এক বৎসর চলিয়া গেল। পুনরায় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা উৎসব আসিয়া উপস্থিত হইল। এবার যাত্রিকসংখ্যা খুব বেশী। বড় দাণ্ডে (রাস্তায়) এবং স্নানবেদীর চতুর্দ্দিকে কোথাও তিলার্দ্ধ স্থান নাই। শঙ্খ, কাহালী, ঘড়ি, কাঁসর, মৃদঙ্গ, মন্দিরা প্রভৃতির ধ্বনি একত্র হইয়া গগনভেদী রবে দিগন্ত কম্পিত করিতেছে। জয়ধ্বনি, উলুধ্বনি ও হরিধ্বনিতে দশদিক্ মুখরিত। যেন আনন্দের বাজার বসিয়াছে। দয়িতা পাণ্ডাগণ যথারীতি শ্রীশ্রীবলরাম, সুভদ্রা, সুদর্শন ও জগন্নাথদেবের পহণ্ডীবিজয় করাইলেন। স্নানবেদীর উপর চারিমূর্ত্তি সিংহাসন আলোকিত করিয়া বসিয়া আছেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নিত্য নূতন লীলাখেলা। বড় বাবাজী মহাশয়েরও নিত্য নূতন ভাবের নৃত্যকীর্ত্তন এবং নিত্য নবনব লীলারসাস্বাদন। আজ আবেশে গৌরাঙ্গচাঁদ জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা

মহোৎসব দেখিতেছেন। বড় বাবাজী মহাশয়ের এই অপূর্ব্ব কীর্ত্তনে সকলের মনে শ্রীগৌরাঙ্গলীলার পূর্ব্বস্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে। ইহার কৃপায় জগবাসী আজ শ্রীগৌরাঙ্গলীলারসে মগ্ন হইয়াছে। ভক্তগণেরও আনন্দের সীমা নাই, বড় বাবাজী মহাশয়ও আনন্দসাগরে মগ্ন।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানলীলা শেষ হইলে পাণ্ডাগণ তাঁহাকে গণেশের বেশে সজ্জিত করিলেন। তখন বেলা অবসান হইয়া আসিল। কাজেই সঙ্গী ভক্তগণের অনুরোধে বড় বাবাজী মহাশয় কুইলবৈকুণ্ঠ নামক স্থানে যাইয়া একটু বসিলেন। সেখানে খিচুড়ী মহাপ্রসাদ আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলে প্রসাদ পাইতে বসিলেন। এই সময় কৃষ্ণানন্দ দাস প্রশ্ন করিলেন, "শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের আজ এরূপ বেশ কেন, আমার জানিতে বড়ই ইচ্ছা হইতেছে।" বড় বাবাজী মহাশয় উত্তর করিলেন, "শুন, ইহার বড় সুন্দর ইতিহাস আছে। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব যে ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু, ইহা তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

"কর্ণাটদেশে গণপতি ভট্ট নামক জনৈক ভক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি বহু শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া সর্ব্বদাই মনে করিতেন যে, 'ব্রহ্ম নিরাকার; অতএব আমাদের ইন্দ্রিয়ের অতীত। যদি সাকারভাবে কোথাও পাইতাম, দর্শন করিয়া ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিতাম।' একদিন তিনি ব্রহ্মপুরাণে দেখিলেন যে, নীলাচলে দারুব্রহ্ম-রূপে শ্রীভগবান্ সাক্ষাৎ বিরাজ করিতেছেন। এই শাস্ত্রানুসন্ধানফলে ভট্টের মনে আনন্দের আর সীমা রহিল না। অতি অল্পদিনের মধ্যেই তিনি স্ত্রীপুত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া নীলাচলযাত্রা করিলেন।

"কিছুদিন পরে একদিন তিনি শ্রীধাম পুরীর নিকটবর্ত্তী তুলসী চট্টরা নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পথশ্রমে কাতর হইয়া বৃক্ষতলে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে দেখিলেন যে, দলে দলে যাত্রিগণ জগন্নাথদর্শন

করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে তিনি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা কোথা হইতে আসিতেছ?' শুনিয়া ভট্ট বিমর্ষভাবে বলিতে লাগিলেন, 'হায়, আমি বৃথা এত কষ্ট করিলাম! জগন্নাথ যদি ব্রহ্মই হইবেন, তবে তাঁহাকে দর্শন করিয়া লোক পুনরায় কি প্রকারে সংসারে ফিরিয়া যাইতেছে। অতএব এ সকল কথা মিথ্যা। নীলাচলে কখনই ব্রহ্ম নাই।' অন্তর্য্যামী শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে ভট্টের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার বিলাপোক্তি শ্রবণপূর্ব্বক বলিলেন, 'বিপ্র, তুমি এত দুঃখ করিতেছ কেন? জগন্নাথদেব বাঞ্ছাকল্পতরু, তাঁহার কাছে যে যাহা চাহিবে, তাহাকে তিনি তাহাই দিবেন। যিনি মুক্তি চাহিবেন, তাঁহাকে তিনি কখনও সংসারে পাঠাইবেন না। তুমি নিঃসন্দেহে দারুব্রহ্ম দর্শন করিয়া কৃতার্থ হও।' শুনিয়া ভট্ট আনন্দিতমনে যাইয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবকে দর্শন করিলেন। কিন্তু তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না; কারণ ভট্ট গাণপত্য সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তাঁহার ধারণা, গণেশই একমাত্র ব্রহ্ম। কাজেই তিনি দারুব্রহ্মে গণেশের মূর্ত্তি না দেখিয়া অতৃপ্তমনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিছুদূর যাইতে না যাইতেই দয়াময় জগবন্ধু একজন পাণ্ডার প্রতি আদেশ করিলেন, 'আমার পরমভক্ত গণপতি ভট্ট নামক এক বিপ্র আমার গজানন দেখিতে না পাইয়া দুঃখিতমনে ফিরিয়া যাইতেছে। তাহাকে লইয়া আইস। সে আমার গজানন দেখিয়া চিরশান্তি লাভ করুক।' ভাগ্যবান্ পাণ্ডা ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরুর আদেশ পাইয়া 'ওহে ভক্তপ্রবর গণপতি ভট্ট, ওহে ভক্তপ্রবর গণপতি ভট্ট' বলিয়া অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ ডাকিতে ডাকিতে তাঁহার অনুসন্ধান পাইলেন এবং সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। ভক্তপ্রবর ভট্ট অতিশয় আনন্দিতমনে ফিরিয়া আসিয়া বড়দাণ্ড হইতেই স্নানবেদীর উপর প্রভুর গজানন দর্শন করিয়া প্রেমানন্দে বহুবিধ স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীজগবন্ধুও প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বর গ্রহণ করিতে বলায় ভট্ট করযোড়ে বলিলেন, 'প্রভো ! আমি আর অন্য বর প্রার্থনা করি না। আমার এই প্রার্থনা যে, চতুর্যুগব্যাপী আপনার এই লীলায় এই স্নানপূর্ণিমাদিবসে আমার মত দীনহীন জীবাধমের প্রতি আপনি কৃপাপূর্ব্বক যে রূপটী প্রকট করিয়া আমাকে উদ্ধার করিলেন, প্রতিবর্ষ এইদিনে যেন এই গণেশ বেশটী ধারণ করেন, ইহাই এ দাসের একমাত্র প্রার্থনা। আপনার ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু নামের মহিমা প্রকাশের জন্য আমাকে এই বর দান করিয়া কৃতার্থ করিতে আজ্ঞা হউক।' শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'তথাস্তু'। আনন্দে অধীর হইয়া ভক্ত বিপ্ররাজ সেই গজবদনে নিজ নয়ন সমর্পণ করতঃ পূর্ণসমাধি লাভ করিলেন। সকলে দেখিলেন [illegible] দেহ হইতে একটী অপূর্ব্ব তেজ নির্গত হইয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীঅঙ্গে মিশিয়া গেল—ব্রাহ্মণের মৃত দেহ সেখানে পড়িয়া রহিল। ইহা দেখিয়া আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই বিস্ময়ান্বিত হইল। এই অপূর্ব্ব ঘটনাসূত্রেই শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের এই গণেশবেশের প্রচার।"

বড় বাবাজী মহাশয়ের এই সব কথা শুনিয়া সকলে আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। তদনন্তর মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়া সকলেই স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

—•—

অনবসরে অর্কতীর্থ যাত্রা

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব একণে অনবসরে রহিলেন। এবার আর আলালনাথে যাওয়া হইল না। সকলেরই এবার অর্কতীর্থে যাইবার মত হইল। দ্বিতীয়ার দিন যাইবার কথা। সব ঠিকঠাক্ হইল। তখন একজন বলিলেন, 'আজ বৃহস্পতিবার।' শুনিয়া বড় বাবাজী মহাশয় বলিলেন, 'আজ কখনও শ্রীধাম ছাড়া উচিত নয়। বৃহস্পতিবারের অপর নাম লক্ষ্মীবার। এই দিনে যে ধাম ত্যাগ করা হয়, ঐ ধামেশ্বরের নিকট হইতে লক্ষ্মী চলিয়া যান। অতএব ধামেশ্বরকে লক্ষ্মীছাড়া করা কোন মতেই উচিত নয়।' কাজেই শুক্রবার প্রভাতে বহু বহু ভক্তবৃন্দসহ কীর্ত্তন করিতে অর্কতীর্থাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বেলা দেড় প্রহরের সময় বড় বাবাজী মহাশয় কোণার্ক নবগ্রহের মূর্ত্তি দর্শন করিয়া দণ্ডবৎ প্রণতি ও স্তব করিতে লাগিলেন। ইঁহার এমনি এক স্বভাব যে, ইনি কীর্ত্তন ছাড়িয়া একদণ্ডও থাকিতে পারেন না। যেখানেই যান, কীর্ত্তন ইঁহাদের সঙ্গের সাথী। প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হওয়া পর্য্যন্ত কীর্ত্তনের আর বিরাম দিতেন না। পল্লীগ্রামের মধ্য দিয়া যাইবার সময় কীর্ত্তনধ্বনি শুনিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে লোকসমাগম হইতে লাগিল। সমবেত বহুলোকের উৎকণ্ঠা ও আগ্রহ যে কোনও বস্তুর উপর পতিত হয়, তাহার শক্তি একটু প্রবলভাবে ক্রিয়া করিবেই করিবে। কীর্ত্তন হইতেছে "নিতাই এনেছে নাম হরিবোল হরিবোল।" বালকবালিকাগণ আর কিছু উচ্চারণ করিতে না পারিয়া কেবল "হরিবোল হরিবোল" বলিতেছে, আর নৃত্য করিতেছে। কাহারও দেহস্মৃতি নাই। অর্কতীর্থ প্রকৃত পক্ষেই

অর্কতীর্থ। এখানে সূর্য্যের উত্তাপ অতিশয় প্রখর। প্রহরেক কালেরও অধিকক্ষণ এখানে কীর্ত্তন হইল। কীর্ত্তনানন্দে সকলেই মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য করিতেছেন। সকলেই ঘর্ম্মাক্তকলেবর; কিন্তু ক্লান্তিবোধ নাই। সকলেই এই সুদীর্ঘাকার মহাপুরুষটীর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া আছে। আহা মরি! কি মধুর দৃশ্য! কি অপূর্ব্ব তন্ময়তা! কি অদ্ভুত প্রেমবিহ্বলভাব! মহাপুরুষটীর একেবারে বাহ্যস্মৃতি রহিত, চরণে চরণ দিয়া ঊর্দ্ধবাহু ঊর্দ্ধনেত্রে নাচিতে নাচিতে প্রেমানন্দে কীর্ত্তন করিতেছেন, "আমার পরম দয়াল নিতাই এনেছে নাম।" সমাগত দর্শকমণ্ডলীও সকলেই সমস্বরে ইঁহার সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে বলিতেছে "হরিবোল হরিবোল"। গগনভেদী হরিধ্বনি জগৎ কাঁপাইয়া তুলিতেছে। সকলেই প্রেমানন্দে মাতোয়ারা। কে কাহাকে থামাইবে? তখন ভক্ত-প্রবর পরম কৌশলী নবদ্বীপ দাদা দেখিলেন যে, তাঁহার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম দাদার সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত এবং মুখকমল রক্তবর্ণ হইয়াছে। ইহাতে তাঁহার প্রাণে বড় ব্যথা লাগিল। তিনি দাদার কষ্ট আর সহ্য করিতে না পারিয়া নৃত্য করিতে করিতে সদলবলে ইঁহার অগ্রবর্ত্তী হইয়া কীর্ত্তনের সঙ্গে ইঁহাকে আকর্ষণপূর্ব্বক অনতিদূরবর্ত্তী একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষমূলে লইয়া গেলেন। কিন্তু সেখানেও কীর্ত্তনের বিরাম হইল না। কিছুক্ষণ পরে কীর্ত্তন সমাপ্তি করিয়া ইঁহারা সকলে সেই বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। গ্রামবাসী কয়েকজন ভদ্রলোক একত্র হইয়া বড় বাবাজী মহাশয়কে দণ্ডবৎ প্রণাম করতঃ তাঁহাদের ভাগবতগৃহে সকলে বিশ্রামাদি করেন, এই প্রার্থনা জানাইলে বড় বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "বাবা, আমি এখন তোমাদের দেশে আসিয়াছি; তোমাদেরই হইয়াছি। তোমাদের যাহা ভাল বিবেচনা হয়, তাহাই কর। তবে আমার সঙ্গে বহু লোক; তোমাদের কোন কষ্ট হইবে না ত?" তাঁহারা বলিলেন, "মহাপ্রভু,

আম্ভর চৌদ্দ পুরুষর ভাগ্য থিলা শ্রীচরণ দর্শন পাইলু, চালিবাহুঁউ।" এই কথা বলিতে না বলিতে বালকবালিকাগণ "হরিবোল বলিয়া উঠিল। প্রেমের পাগল নবদ্বীপ দাস উহাদের সঙ্গে "হরিবোল হরিবোল" বলিয়া নৃত্য করিতে করিতে চলিলেন। সকলেই উহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন।

অনতিবিলম্বে ভাগবতগৃহে পৌঁছিয়া দেখিলেন, চা'ল, ডা'ল, তরকারী, দুধ, ঘি, প্রভৃতি ভোগের দ্রব্য যথেষ্ট আয়োজন করা হইয়াছে। পূর্ব্ব-বৎসরের আলালনাথের উৎসব-ব্যাপার বলরামের মনে ছিল; তাই পূর্ব্ব হইতেই তিনি বিশেষ সাবধান হইয়া রসুইদার পূজারী সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন। বড় বাবাজী মহাশয়ের আজ্ঞা পাইয়া অতি উৎসাহের সহিত সকলে ভোগের আয়োজন করিতে লাগিলেন। ইঁহারা স্নানাদি করিয়া "জয় জয় নিত্যানন্দাদ্বৈত গৌরাঙ্গ" কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। কীর্ত্তনও শেষ হইল, ভোগরন্ধনও শেষ হইল। বলরাম, বড় বাবাজী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভোগ দিবার কিরূপ ব্যবস্থা হইবে? তখন একজন গ্রামবাসী বলিয়া উঠিলেন, "আম্ভর ঠাকুর অছন্তি।" বড় বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "কি ঠাকুর বাবা?" গ্রামবাসী উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে, জগন্নাথ আউ পঞ্চতত্ত্বর চিত্রপট।" ইহা শুনিয়া ইঁহার মনে বড়ই আনন্দ হইল। ইনি বলিলেন, "উত্তম কথা বাবা, ঠাকুর লইয়া আইস।" গ্রামবাসী লোকটী অতিশয় আনন্দের সহিত চিত্রপট দুইখানি সেখানে আনিয়া দিলেন। ঐ চিত্রপটেই ভোগ দেওয়া হইল। তখন দিবা প্রায় অবসান হইয়া আসিয়াছে। সুচতুর গ্রামবাসিগণ অগ্রেই আলোর বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। বড় বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "তোমরা সকলেই একসঙ্গে প্রসাদ পাইতে ব'স।" এ কথায় বহু আপত্তি উঠিল। সম্ভ্রান্ত গ্রামবাসিগণ কহিলেন, "মহাপ্রভু, আপন মানে বিজয় করন্ত, আপন মানে

পাইলা উত্তারু আম্মে সমস্তে বসিবা।" তাহাদিগেরই কথা রহিল। বড় বাবাজী মহাশয় অগত্যা সগণে প্রসাদ পাইতে বসিলেন। যেমন ইহাদিগের প্রসাদ পাওয়া শেষ হইল, অমনি প্রায় শতাধিক লোক প্রসাদ পাইতে বসিয়া গেল। সকলেই বলরাম বাবুর পরিচিত; কাজেই বাধ্য হইয়া তাঁহাকেও ঐ সঙ্গে বসিতে হইল। যাঁহারা রান্না করিয়াছেন, তাঁহারা বলিলেন, "বাবাজী মহারাজ, যে প্রসাদ আছে, উহাতে আন্দাজ পঁচিশ ত্রিশ জনের হইতে পারে।" এই কথা শুনিয়া মহাপুরুষ রান্নার জায়গায় গিয়া বলিলেন, "নিতাইচাঁদের ইচ্ছায় তাঁহার প্রসাদে কেহ বঞ্চিত হইবে না। তোমরা নিঃসঙ্কোচে প্রসাদ দাও।" এই বলিয়া তথায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। প্রসাদ বিতরিত হইতে লাগিল। সেই পঙ্গত গেলেও সকলে দেখিলেন, সাত আট জনের পরিমাণ প্রসাদ অবশিষ্ট রহিয়াছে। উহা মাখিয়া স্ত্রীলোকদিগকে দেওয়া হইল। বড় বাবাজী মহাশয়ের অলৌকিক শক্তি দেখিয়া সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইলেন। কেহ কেহ বলিতে লাগিল, "ইনি নিশ্চয়ই মহাপুরুষ।" কেহ কেহ বলিতে লাগিল, "ইনি কখনও মানুষ নন; সাক্ষাৎ নিত্যানন্দ।" ইত্যাদি যাহার মনে যেরূপ ভাবের উদয় হইতে লাগিল, সে তদ্রূপ বলিতে লাগিল। সে রাত্রি সেই গ্রামেই অবস্থিতি হইল। পরদিন প্রভাতে সকলে চন্দ্রভাগাস্নান করিতে গেলেন। স্নানান্তে বড় বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "দেখ বলরাম, আজ এই পুণ্য তীর্থক্ষেত্রেই থাকা যাউক। আমরা ভিক্ষা করিয়া আনি। এখানেই রান্না করিয়া ঠাকুরের ভোগ দেওয়া যাইবে।" তখন পার্শ্বস্থ গ্রামের দুইজন লোক বলিল, "অনুমতি হয়ত আমরা সকল যোগাড় করিয়া দিই।" বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "তোমাদের ইচ্ছা হইলে এই স্থানে আনিয়া দিতে পার।" তাহাই হইল। সেই বৃক্ষলতাদি-শূন্য বালুকাময় স্থানে যেন আনন্দের হাট বসিল। এইরূপে প্রত্যহ ভিন্ন

ভিন্ন গ্রাম হইতে লোক আসিয়া বিশেষ আগ্রহের সহিত ইঁহাদিগকে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে লইয়া যাইতে লাগিল। এইভাবে কয়েকদিন পরমানন্দে কাটিয়া গেল। একদিন একজন ভক্ত বলিলেন, "আজ চতুর্দ্দশী।" শুনিবামাত্র বড় বাবাজী মহাশয় বলরামকে বলিলেন, "বলরাম, কাল শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নবযৌবন, পরশ্ব গুণ্ডিচামার্জ্জন উৎসব হইবে; আর এখানে থাকা উচিত নয়। ইঁহাদিগকে বুঝাইয়া বল, আমরা অন্য সময়ে আসিয়া আনন্দ করিব।" তাহাই হইল। প্রসাদ পাইবার পর শেষ বেলায় সকলে কীর্ত্তন করিতে করিতে রওনা হইয়া সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পরে শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে আসিয়া পৌছিলেন। ভক্তগণ নিজ নিজ বাসায় গমন করিলে বড় বাবাজী মহাশয় সগণে জগন্নাথবলভে রাত্রিবাস করিলেন।

দ্বিতীয়বার নবযৌবন দর্শন

প্রভাতে স্নানাদি প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া সকলে শ্রীমন্দিরে চলিলেন। পনের দিনের পর আজ প্রভুর শ্রীমুখ দর্শন হইবে, তাই সকলের হৃদয়ে আনন্দ আর ধরে না। লোকসকল ঊর্দ্ধশ্বাসে শ্রীমন্দিরের দিকে ছুটিতেছে। সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল। জগবন্ধুর শ্রীমুখদর্শনের জন্য সকলেরই মন ব্যাকুল। যথাসময়ে মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত হইল। "জয় জগন্নাথ! জয় নীলাচলনাথ।" রবে দিগন্ত কম্পিত হইতে লাগিল। কীর্ত্তনানন্দে লোকের হৃদয় পূর্ব্ববৎ প্রেমরসে ভাসিতে লাগিল। কীর্ত্তনানন্দের সহিত নর্ত্তনানন্দ মিশিয়া এক অপূর্ব্ব ভাবতরঙ্গ উত্থিত হইল। এই ভাবতরঙ্গে সকলেই ভাসিলেন। বড় বাবাজী মহাশয় প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে করিতে পদ ধরিলেন :—

বহুদিন পরে, বঁধুয়া পাইয়া,
জুড়াইল এ হৃদয়।
দণ্ডে শত যুগ, পলকে প্রলয়,
এতে কি পরাণ রয় ॥
অবলা সরলা, গোপ গোয়ালিনী,
হাম মুগধিনী নারী।
অতি সুচতুর, রসিক নাগর,
তুঁহু সে মুরলীধারী ॥
জাতি কুল শীল, নাশিলে সকলি,
কুটিল কটাক্ষ বাণে।
অব কাহে নাথ, হও নিরদয়,
বধিতে নারীর প্রাণে ॥

ইত্যাদি শ্রীমন্মহাপ্রভুর রাধাভাবের উক্তিসকল নানারূপ অঙ্গভঙ্গি দ্বারা স্বকৃতপদে কীর্ত্তন ও অভিনয় করিয়া বড় বাবাজী মহাশয় মধুর মনোমোহন নৃত্য করিতেছেন। পনের দিন পরে আজ জগন্মোহন শ্রীশ্রীজগবন্ধুর শ্রীমুখদর্শন এবং বড় বাবাজী মহাশয়ের ভুবনমোহন কীর্ত্তন ও নর্ত্তনদর্শনে উপস্থিত লোকসকল আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইতে লাগিল। দিবাবসানে কীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে দর্শকবৃন্দ স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। অনেকেই বড় বাবাজী মহাশয়কে আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবাজী মহাশয়, কাল গুণ্ডিচা মার্জ্জনে যাওয়া হইবে ত?" ইহা শুনিয়া ইনি আনন্দভরে অতি বিনীতভাবে বলিলেন, "আপনাদের কৃপা থাকিলে নিশ্চয়ই হইবে।" এই বলিয়া সদলে কীর্ত্তন করিতে করিতে জগন্নাথবল্লভে আসিয়া বিশ্রাম করিলেন।

দ্বিতীয়বার গুণ্ডিচামার্জ্জন

এবৎসর আর কাহাকেও বিশেষভাবে উদ্যোগ আয়োজন করিতে হইল না। গতবারের গুণ্ডিচা মার্জ্জন উৎসবে পুরীবাসী যে অপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন, তাহারই লোভে এবার সকলেই উৎসাহিত হইতে লাগিলেন। রাত্রি প্রভাত হইল। এবার আর বলরামকে ঝাড়ু কলসীর কথা বলিতে হইল না। তিনি পূর্ব্ব হইতেই সকল আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রাতঃকালে শ্রীমন্দিরে বাবাজী মহাশয়ের সহিত বলরামের যেমন দেখা হইল, অমনি ইনি তাঁহাকে মহাপ্রসাদের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। ইঁহাদিগের সেদিন গঙ্গামাতামঠে মহাপ্রসাদ পাইতে যাইবার কথা। উঁহারা তথায় প্রসাদ পাইয়া বাসায় আসিয়া দেখেন, চারিদিক হইতে বহু বহু ভক্তগণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। বড় বাবাজী মহাশয় জনৈক ভক্ত পাঠাইয়া রঘুনাথ দেব গোস্বামী প্রভুকে আনাইলেন। ক্রমে গম্ভীরা এবং গঙ্গামাতামঠের কীর্ত্তনসম্প্রদায় আসিয়া পৌঁছিল। চতুর্দ্দিক হরিধ্বনিতে মুখরিত হইল। সকলে মিলিয়া মহানন্দে কীর্ত্তন করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। বড় বাবাজী মহাশয় ভাবাবেশে কীর্ত্তন ধরিলেন :—

চারিদিকে ভক্তগণ মাঝে গোরাচাঁদ।
তারকাবেষ্টিত যেন অকলঙ্ক চাঁদ॥
ভাবের আবেশে প্রভু স্বরূপেরে বলে।
শুনিয়া ভাসয়ে সবে প্রেমের হিল্লোলে॥
চলগো সজনী চল নিকুঞ্জ ভবন।
মনের মতন করি করিব মার্জ্জন॥

আসিবেন প্রাণনাথ নিশি পরভাতে।
সুসজ্জিত রথে ভাই ভগিনীর সাথে ॥
চুয়াচন্দন জল সিঞ্চ চারি পাশে।
সুবাসিত কর কুঞ্জ যতেক সুবাসে ॥

ইত্যাদি পদ গান করিয়া প্রেমাবেশে নাচিতে নাচিতে গুণ্ডিচামন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ ঝাড়ু ও কলসী লইয়া শ্রীমন্দির মার্জ্জন ও প্রক্ষালনাদি কার্য্য আরম্ভ করিলেন। সে আনন্দের কথা অনুভব ব্যতীত ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। গত বৎসর অপেক্ষা দ্বিগুণতর উৎসাহের সহিত ভক্তগণ এবার এই লীলার অভিনয় করিলেন। আনন্দও অধিকতর পাইলেন। শ্রীমন্দির উত্তমরূপে ধৌত করিয়া ইঁহারা ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে জলকেলি সমাপনপূর্ব্বক তাহার তীরবর্ত্তী বিস্তৃত ভুমিতে সকলে মিলিয়া মহাপ্রসাদ পাইলেন। বহুলোক একসঙ্গে প্রসাদ পাইলে বিশেষ গোলযোগ হইবার আশঙ্কায় পুরুষদিগকে প্রথমে বসাইয়া দেওয়া হইল। পরে উৎসব দর্শনার্থ আগতা স্ত্রীলোকদিগকে যথাযোগ্যভাবে মহাপ্রসাদ দিবার ব্যবস্থা করাইয়া বড় বাবাজী মহাশয় পুনর্ব্বার কীর্ত্তন করিতে করিতে স্বগণ সঙ্গে জগন্নাথবল্লভে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

দ্বিতীয়বার রথযাত্রা

রাত্রি প্রভাত হইলে সকলে স্নানাদি প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক অতিশয় ব্যস্ততা সহকারে শ্রীমন্দিরে চলিলেন। আজ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা। যাত্রিক সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে হইয়াছে। বড় বাবাজী মহাশয় ও ইঁহার সঙ্গিগণ কীর্ত্তন করিতে করিতে জনসংঘমধ্যে মিশিয়া গেলেন। ক্রমে কীর্ত্তন-আনন্দে লোকসকল মাতিয়া উঠিল। বেলা দ্বিপ্রহর

পর্য্যন্ত কীর্ত্তন হইতে লাগিল। তথাপি জগবন্ধুর দর্শন নাই। তাঁহার যেন বাহিরে আসিবার মন হইতেছে না। বোধ হয়, লক্ষ্মীদেবীর অনুমতির অপেক্ষায় মন্দিরমধ্যে বসিয়া আছেন। ক্রমে দ্বিপ্রহর অতীত হইতে চলিল দেখিয়া পুরীবাসী কয়েকজন ভক্ত, বড় বাবাজী মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "দেখুন, আজ কখন্ যে জগন্নাথদেবের পহণ্ডীবিজয় হইবে, তাহার ঠিক নাই। অতএব আপনারা প্রসাদ পাইয়া আসুন।" এই কথা শুনিয়া বড় বাবাজী মহাশয় সগণে লালা বাবুর ছত্রে মহাপ্রসাদ পাইবার জন্য গমন করিলেন। ছত্রটী শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের দক্ষিণ দরজার নিকটবর্ত্তী। শ্রীমন্দিরে কাঁসর ঘণ্টা বাজিলেই ছত্র হইতে শুনিতে পাওয়া যায়। বড় বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে বলরাম বাবু প্রভৃতি বিশ পঁচিশজন ভক্ত আছেন। একটি বাঙ্গালী বাবু বলরাম বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, শুনিতে পাই নাকি জগন্নাথদেবের যত সেবক পাণ্ডাগণ আছেন, তাঁহাদের বেতনস্বরূপে পিঠাপানা প্রসাদের ব্যবস্থা পূর্ব্ব হইতে নির্দ্দিষ্ট আছে এবং রথ টানিবার লোকদিগকে জায়গীর দেওয়া হইয়াছে। আজকাল ত পূর্ব্বাপেক্ষা জমাজমি ও জিনিষপত্রের মূল্য অধিকতর, তথাপি অপার সম্পত্তিশালী শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের সেবার এরূপ বেবন্দোবস্ত কেন ?" বলরাম বাবু বলিলেন, "দেখুন, এ বিষয়ে রাজার বিশেষ দৃষ্টি নাই এবং কর্ম্মচারিগণ দেবকার্য্যে শ্রদ্ধাহীন ও শিথিলপ্রযত্ন হওয়ায় জগন্নাথদেবের সেবার এইরূপ বিশৃঙ্খলতা ঘটিয়াছে। দুঃখের কথা কি বলিব ? আজ কয়েক মাস হইতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শয়নই হয় না। কোন দিন বড় শিঙ্গার হয়, কোনও দিন নাও হয়। এইজন্য আমরা বড়ই মনকষ্টে আছি। এই কথা শুনিয়া প্যারীমোহন বাবু বড় বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন, "আচ্ছা শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব ত নিত্য, চিন্ময় ও সর্ব্বশক্তিমান্। তিনি ইচ্ছা করিলেই ত এ সকল

অসুবিধা দূর করিতে পারেন। তবে তিনি নিজে কেন এত কষ্টভোগ করেন?" বড় বাবাজী মহাশয় মৃদু হাসিয়া উত্তর করিলেন, "ইহার মূল কারণ শুনুন :—

"সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় পূর্ণ পূর্ণতম শ্রীভগবান্ প্রবল পরাক্রান্ত কলিরাজকে সাময়িক অধিকার প্রদান করিলেন। কলিরাজও ভগবদ্দত্ত সাময়িক অধিকারমদে উন্মত্ত হইয়া প্রথমেই বৃষরূপী ধর্ম্ম ও গোরূপী পৃথিবীর উপর উৎপীড়ন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে ভক্তপ্রবর রাজা পরীক্ষিৎ সশস্ত্রে কলির নিগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলে শ্রীভগবান্ দেখিলেন, অভিমানী ও স্বতন্ত্র কলিরাজের ঐরূপ শাস্তি প্রদানই প্রয়োজন; ইহাতে শ্রীভগবান্ পরীক্ষিৎ মহারাজের উপর অসন্তুষ্ট হইলেন না। অতি অল্পক্ষণেই কলিরাজ পরাভূত হইয়া করযোড়ে পরীক্ষিৎ মহারাজের নিকট নিজ বাসস্থান প্রার্থনা করায় তিনি দয়াপরবশ হইয়া কলিরাজের বাসের জন্য পাঁচটী স্থান নির্দ্দেশ করিলেন। যথা,—

গণিকাশুণ্ডিকাগারং অক্ষক্রীড়াঞ্চ যোষিতঃ।
কাঞ্চনানি দদৌ পঞ্চ স্থানানি বাসহেতবে॥

তখন কলিরাজ মনে মনে বিচার করিয়া দেখিলেন যে, জগতে স্বধর্ম্ম-পরায়ণ ভগবদ্ভক্তই আমার পরম শত্রু। অতএব যাহাতে ভক্তগণকে হস্তগত করিতে পারা যায়, সর্ব্বাগ্রে সেই বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। তখন তাঁহার নিজ পরিকর কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, হিংসা, অধর্ম্ম, অবিচার, অজ্ঞান প্রভৃতিকে আদেশ করিলেন, "তোমরা অতি সূক্ষ্মভাবে যাইয়া অগ্রে কেন্দ্রস্থল, কাশী, গয়া, মথুরা, দ্বারকা, শ্রীক্ষেত্র, অযোধ্যা, মিথিলা, নবদ্বীপ, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থস্থান অধিকার কর। সাবধান! দেখিবে, যেন প্রবল পরাক্রান্ত ভগবদ্ভক্তগণের নিকট তোমরা বিদিত না হও;

কারণ ভক্তগণই তোমাদের পরম শত্রু।” এই আদেশ পাইয়া নিজ নিজ সৈন্যসামন্ত ও অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে করিয়া কলিরাজের পরিকরগণ তীর্থে তীর্থে যাইয়া অতি সূক্ষ্মভাবে সত্য, ধর্ম্ম, দয়া, দান, সেবা প্রভৃতির ভিতরে প্রবেশ পূর্ব্বক সেবক, বৈষ্ণব, সাধু, সন্ন্যাসী, বিপ্র ও রাজা ইঁহাদের অন্তঃকরণ অধিকার করিতে লাগিল। সেবকের অন্তঃকরণ অধিকার করা ও শ্রীভগবানের অন্তঃকরণ অধিকার করা একই কথা। কারণ ভক্ত ও ভগবানে প্রভেদ নাই। তথাপি পূর্ণ পূর্ণতম শ্রীভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন কোনরূপ অস্ত্রশস্ত্র ধারণ না করিয়া কলির দোষ সংশোধনের জন্য পরম কারুণিক নিতাইগৌরাঙ্গরূপে শ্রীধাম নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া নাম ও প্রেমের বন্যায় জগৎ ভাসাইলেন। ইহা দেখিয়া কলিরাজ তখন নিজ অধিকারচ্যুতির আশঙ্কায় কপট ভক্তবেশ ধারণ করিয়া শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের শ্রীচরণে কাতরভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। করুণাময় শ্রীগৌরাঙ্গদেব আদেশ করিলেন, “কলিরাজ, ভয় নাই, তোমার অধিকার নষ্ট হইবে না। এই যুগে তোমার ন্যায় কপট ভক্তবেশ ধারণ করিয়া বহুলোক নানাপ্রকার উপধর্ম্ম প্রচার করতঃ তোমার প্রজা বৃদ্ধি করিবে।’ এই সকল কথা ,‘মহাপ্রকাশ’ নামক গ্রন্থে উক্ত আছে। ইচ্ছাময় শ্রীভগবান্ নিজ সেবা-সুখের জন্য কখনও কাহারও অধিকারচ্যুতি করিতে ইচ্ছা করেন না। দেখিবেন, অল্প কালের মধ্যেই শ্রীগৌরাঙ্গদেব আমাদের সম্রাটের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া রাজনির্ব্বাচিত কর্ম্মচারী দ্বারাই এই সকল সেবার বিশৃঙ্খলা দূর করিয়া বিশেষ সুবন্দোবস্ত করিবেন।”

এই কথা বলিতে বলিতেই শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরে কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। সকলেই দ্রুতবেগে শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, বলদেবের পহণ্ডী আরম্ভ হইয়াছে। ক্রমে সকলেইরথে

বিজয় করিলেন। সেদিন আর রথের টান হইল না। বড় বাবাজী মহাশয় দুঃখিতচিত্তে সঙ্গিগণকে বলিলেন, "তোমরা বাসায় যাও, আমি আজ আর যাইব না।" ইহা শুনিয়া কেহ কেহ চলিয়া গেলেন, কেহ কেহ বা সঙ্গেই রহিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইলে সকলে নরেন্দ্রসরোবরে স্নানাদি প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে জগন্নাথবল্লভ হইয়া পুনরায় শ্রীমন্দিরে আসিলেন। ক্রমে ক্রমে বহুলোক আসিয়া মিলিত হইতে লাগিল। বেলা আন্দাজ চারি দণ্ডের সময় রথের টান আরম্ভ হইল। বলভদ্রদেব ও সুভদ্রাদেবীর রথ বলগণ্ডীর নিকটবর্ত্তী স্থানে রাখিয়া জগন্নাথদেবের রথের টান হইতে লাগিল। নৃত্য-কীর্ত্তন পূর্ব্ববৎ চলিতে লাগিল। এইভাবে ছয়দিনের দিন জগন্নাথদেব গুণ্ডিচাবাড়ী উপস্থিত হইয়া অষ্টমীর দিন গুণ্ডিচামন্দিরে শুভ বিজয় করিলেন। গুণ্ডিচাবাড়ীতে একদিন অবস্থান করিয়াই পুনর্ব্বার রথে উঠিলেন। পূর্ব্ববৎ নৃত্য-কীর্ত্তনাদি হইতে লাগিল বটে; কিন্তু বড় বাবাজী মহাশয় প্রতি কার্য্যে ও কথাতেই হতাশ ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইহার প্রাণে যেন কি একটা বিষম দুঃখের অনল জ্বলিতেছে। ইনি দুঃখিতান্তঃকরণে কেবলই হা হুতাশ করিতেছেন আর বলিতেছেন, "হা প্রভু, কতদিনে তোমার সেবার ব্যবস্থা দেখিয়া প্রাণ জুড়াইব? যে তোমার একদিনের জন্যও অন্নভোগ বন্ধ হইত না, যে তোমাকে ছাপ্পান্ন ভোগ দিয়াও সেবকের মনে তৃপ্তি হইত না, সেই তুমি আজ নিজ মন্দির ছাড়িয়া সোনার শয্যাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজভোগের পরিবর্ত্তে চিড়া মুড়কী ও ফলমূল আহার করিয়া রথোপরি বড়দাণ্ডে অতিকষ্টে কালযাপন করিতেছ! আমাদের প্রাণে যে আর সহ্য হয় না। হে দীনবন্ধো, হে পতিতপাবন, ধন্য তোমার দয়া! আজ কিনা পতিত, পাষণ্ডী, নীচ,

অস্পৃশ্য জীবকে দর্শনদানে কৃতার্থ করিবার মানসে তুমি নিজসুখৈশ্বর্য্য তুচ্ছ করিয়া এত কষ্ট স্বীকার করিতেছ; কিন্তু ভক্তের প্রাণে ইহা ত সহ্য হয় না। তুমি দয়াময়, জীবের জন্য তুমি সকলই করিতে পার। তোমার পক্ষে সকলই শোভা পায়। কিন্তু তোমার ভক্তগণ যে প্রাণে বাঁচে না। শীঘ্র ইহার একটা প্রতিবিধান কর।" এই কথা বলিতে বলিতে কাঁদিয়া আকুল হইলেন। জগন্নাথদেবের সেবার বিশৃঙ্খলতার জন্য বড় বাবাজী মহাশয়ের হৃদয়ের ব্যাকুলতা, প্রাণের আবেগ, প্রেমপূর্ণ আব্দার ও হৃদয়বিদারক আর্ত্তি দেখিয়া শুনিয়া সকলেরই হৃদয় দ্রবীভূত হইল।

কৃষ্ণগোবিন্দের বিদায় ও গৌড়দেশ যাত্রা

রথযাত্রা শেষ হইয়া গেল। একদিন বড় বাবাজী মহাশয় এমন গম্ভীরভাবে বসিয়া আছেন যে, কেহই ইঁহার মুখের দিকে চাহিতে পারিতেছে না। ইঁহার মুখ দেখিয়া যেন সকলেরই প্রাণে ভয়ের উদ্রেক হইতেছে। ইঁহার এ প্রকার গম্ভীরভাব পূর্ব্বে কেহ কখনও দেখেন নাই। কিছুক্ষণ এইভাবে থাকিয়া অন্তরঙ্গ সঙ্গী কৃষ্ণগোবিন্দ দাসকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ ভাই, তুমি অবিলম্বে পদব্রজে শ্রীবৃন্দাবন ধাম গমন কর। সময়মত আমার সঙ্গে দেখা হইবে।" এই নিদারুণ কথা বলিবামাত্র কৃষ্ণগোবিন্দ ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ইঁহার চরণতলে নিপতিত হইলেন। কেহই ইহার কারণ স্থির করিতে পারিলেন না। সকলেই বিমর্ষভাবে কাঁদিতেছেন। মহাপুরুষের কিন্তু পূর্ব্ববৎ গম্ভীরভাব।

বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো নু বিজ্ঞাতুমর্হতি।

বড় বাবাজী মহাশয়ের আজ ঠিক তদ্রূপ অবস্থা। প্রাণাধিক ভক্তের নয়নজলে ইঁহার হৃদয় গলিল না। আমরা ইঁহার এরূপ অনাসক্ত ভাবের দৃষ্টান্ত ইহার পরে অনেক দেখিতে পাইব।

কিছুক্ষণ পরে কৃষ্ণগোবিন্দ দাস বড় বাবাজী মহাশয়ের চরণধূলি লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন! অনুগত জনের আত্মসুখেচ্ছা থাকিতে পারে না। কৃষ্ণগোবিন্দ দাসকে অনেকে বলিলেন, "তুমি থাক, আমরা বাবাজী মহাশয়কে তোমায় সঙ্গে রাখিতে অনুরোধ করিতেছি।" কৃষ্ণগোবিন্দ উত্তর করিলেন, "দাদার আজ্ঞা সর্ব্বথা পালনীয়া। দাদা যাহাতে সুখী হইবেন, তাহাতেই আমার পরম সুখ।" এমন আদর্শ প্রেম, এরূপ অকৃত্রিম ভালবাসা জগতে অতি বিরল। যেমন দাদা, তেমনি ভাই। 'যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ।' যেমন কৃষ্ণগোবিন্দদাস চলিয়া গেল, অমনি বড় বাবাজী মহাশয় উপস্থিত ভক্তগণের নিকট তাহার গুণ শতমুখে ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে, বড় বাবাজী মহাশয় একদিন পুরীবাসী ভক্তগণের নিকট বিদায় লইয়া গৌড়দেশ প্রত্যাগমন মানসে পদব্রজে রওয়ানা হইলেন। চারি পাঁচ জন মাত্র সঙ্গী সঙ্গে লইলেন। গোবিন্দদাস, কৃষ্ণানন্দদাস, শীতলদাস প্রভৃতি চারি পাঁচ জনকে প্রত্যহ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরে কীর্ত্তন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্ম সেবার জন্য শ্রীক্ষেত্রে রাখিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইঁহারা সকলেই নিঃস্বার্থ প্রেমের প্রেমিক, অনাসক্তভাবের ভাবুক। যদিও সঙ্গে থাকিতে সকলেরই ইচ্ছা, তথাপি যখন ইনি গোবিন্দদাস, কৃষ্ণানন্দদাস, শীতলদাস প্রভৃতিকে নিকটে ডাকিয়া স্নেহভরে বলিলেন, "ভাই, তোমরা এখানে কিছুকাল থাক, আমি সত্বরই ফিরিয়া আসিতেছি।" তখন এরূপ স্নেহ-ভালবাসা-পূর্ণ মধুর বাক্য শুনিয়া কেহই কোন প্রতিবাদ করিতে পারিলেন

না। বড় বাবাজী মহাশয় বিদায়কালে একে একে তাঁহাদিগকে দৃঢ় প্রেমালিঙ্গনদানে কৃতার্থ করিলেন। তাঁহাদিগের তখনকার সেই করুণ দৃশ্য দেখিয়া সকলেই কাঁদিয়া আকুল হইলেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের শ্রীচরণে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক ইঁহারা সজল নয়নে বিদায় গ্রহণ করিলেন। পথে সাক্ষিগোপাল দর্শন করতঃ সেখানে একরাত্রি বাস করিয়া পরদিবস সকলে কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীশ্রীভুবনেশ্বর যাত্রা করিলেন।

ভুবনেশ্বরের পথে রাম বেহারা

সাক্ষিগোপাল হইতে ভুবনেশ্বর প্রায় এগার বার ক্রোশ পথ হইবে। পাঁচ ছয় ক্রোশ পথ যাইয়া ইঁহারা একটী অতি দরিদ্র গৃহস্থের বিশেষ আগ্রহে তাহার গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। এই দরিদ্র গৃহস্থটীর নাম রামচন্দ্র বেহারা—জাতিতে গোয়ালা। উহার একটি মাত্র পুত্র অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। রামচন্দ্রের পরিবার-মধ্যে নিজে এবং বিধবা পুত্রবধূ ও পুত্রশোকাতুরা ভার্য্যা। উহাদের সকলেরই হৃদয় আজ আনন্দে পরিপূর্ণ। কিন্তু সাংসারিক অবস্থা বড়ই শোচনীয়। এমন কি, দু'বেলা অন্নসংস্থান হয় না। অতি কষ্টে দিনপাত হয়। কিন্তু উহাদের মুখকমল সর্ব্বদা প্রফুল্ল। উহাদিগকে দেখিবামাত্রই বড় বাবাজী মহাশয়ের হৃদয় দয়ার্দ্র হইল—নয়নে জল আসিল—কি যেন কি ভাবিতে লাগিলেন।

এদিকে রামচন্দ্র স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, "ঘরে কিছি অছি কি? আজি মোহর কেতে ভাগ্য যে এমতি মহাপুরুষ মো ঘরে বিজয় করিছন্তি, যেবে এমানঙ্কু খাইবাকু দেই ন পারিব, তেবে নিচ্চয় মু ্নইরে ঝাঁপ দেই বুড়ি

মরিবি!" বুদ্ধিমতী পতিব্রতা স্ত্রী স্বামীর এইরূপ দুঃখপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া গদগদকণ্ঠে বলিল, "চিন্তা নাহি, তেক্সে এমানঙ্কর রাহ্বিবা জায়গা ঠিকানা করি দিঅ, মু টিকিএ বুলি আসে; প্রভুঙ্ক ইচ্ছারে অঁডি এই মহাপুরুষঙ্কর কৃপারে সবু ঠিকানা হোই যিব" এই কথা বলিয়া ভক্তিমতী বেহারাপত্নী পাড়ায় বাহির হইলেন। এই ঘটনাটী কিন্তু বড় বাবাজী মহাশয়ের নিকট গোপন রহিল না। তিনি রামচন্দ্রকে ডাকাইয়া বলিলেন, "বাবা, আমাদের আহারাদির জন্য তোমার বিশেষ কোনও কষ্ট করিতে হইবে না। আমি তোমার মুখ দেখিয়াই বুঝিয়াছি যে, তোমার ঘরে আজ অন্নের সংস্থান নাই। তোমার ভক্তিমতী স্ত্রী বোধ হয় প্রতিবেশীর বাড়ী হইতে আমাদেরই জন্য আহারীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে গিয়াছে। তোমার স্ত্রীকে ডাকিয়া আন, ধার করিয়া কোন বস্তু আনিবার প্রয়োজন নাই। শ্রীগৌর বিশ্বম্ভর যদি কৃপা করেন, তবে তোমার গৃহে বসিয়াই আজ তোমাদের গ্রামবাসী বহুলোক পরমানন্দে মহাপ্রসাদ পাইবে।" এই কথা বলিয়া ইনি নীরব হইলেন। রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল "মহাপ্রভু, মু ত জাতিরে গৌড় (গোয়ালা) নিতান্ত মূর্খ এবং ভক্তিহীন। কে বিশ্বম্ভর, কে জগন্নাথ মু কিছি জানে না; আপনঙ্কু দর্শন করি মো মনরে হঠাৎ এপরি ভাব উদয় হোই অছি যে এত্তে দিন পরে মোহর কর্ম্মবন্ধন টুটিলা। যেবে অনুগ্রহ হোই অছি তেবে মোহর কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট করি মোতে দীক্ষা প্রদান করিবাকু আজ্ঞা হেউ।" সরলপ্রাণ রামচন্দ্রের আর্ত্তিপূর্ণ আত্মনিবেদন শুনিয়া সকলেরই হৃদয় দ্রবীভূত হইল। নবদ্বীপ দাস কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "হা নিতাই, এমন সরলবিশ্বাসী জীবের প্রতি কি তোমার কৃপা হইবে না?" বলিতে বলিতে "হা নিতাই" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে

ডাকিতে লাগিলেন। নিতাইচাঁদের নাম লইবামাত্র সকলের হৃদয়েই কি যেন একটা অনির্ব্বচনীয় শক্তি সঞ্চার হইল। সকলেই "হা নিতাই, জয় নিতাই" বলিয়া ক্রন্দন এবং উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন। নৃত্য যে কিরূপ রামচন্দ্র তাহা জানে না। কখনও সে নৃত্য দেখে নাই। এরূপ প্রেমনৃত্য তাহার ভাগ্যে এই প্রথম দর্শন। সে করযোড়ে একপাশে দাঁড়াইয়া আছে, আর অঝোর নয়নে ঝুরিতেছে। রামচন্দ্রের গৃহে আজ কিসের গোলযোগ, ইহা দেখিতে গ্রামবাসী স্ত্রী-পুরুষ এক এক করিয়া তাহার বাড়ীতে আসিতে আরম্ভ করিল। কিছুক্ষণ পরে রামচন্দ্রের ভক্তিমতী স্ত্রী কিছু চা'ল, ডা'ল, তিন চারিটী বেগুন এবং কয়েকটী ভেণ্ডী লইয়া অতি হৃষ্টচিত্তে গৃহে ফিরিয়া আসিল এবং স্বামীর তাৎকালিক অবস্থা ও উপস্থিত মহাপুরুষগণের ভাবগতিক দেখিয়া একেবারে অবাক্ হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে সে বিধবা পুত্রবধূটিকে জিজ্ঞাসা করিল "এমানঙ্কর রান্ধিবার যোগাড় হোই অছি ?" উত্তরে পুত্রবধূটী বলিল, "মহাপ্রভু মনা করিবা হেলে।" ইহা শুনিয়া রামচন্দ্রের পত্নী চা'ল, ডা'ল প্রভৃতি যাহা কিছু আনিয়াছিল, সে সকল পিঁড়ায় রাখিয়া স্বামীর নিকট গমনপূর্ব্বক তাহার মত করযোড়ে দাঁড়াইয়া রহিল। বড় বাবাজী মহাশয় প্রেমোন্মত্তভাবে উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে রামচন্দ্রকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার কর্ণে মন্ত্র প্রদান করিবামাত্র সে ছিন্নমূল ক্রমের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে ইঁহার চরণতলে নিপতিত হইল। তখন গ্রামবাসী প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ জন লোক সেখানে উপস্থিত হইয়াছে। সকলেই রামচন্দ্র বেহারার অবস্থা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। গ্রামের মধ্যে নগণ্য এবং ঘোর নাস্তিক, পাষণ্ড রামচন্দ্র বেহারার অঙ্গ আজ অশ্রু, কম্প, পুলকাদি সাত্ত্বিক ভূষণে ভূষিত। ইহা তাহারা প্রত্যক্ষ দেখিয়াও বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। রামচন্দ্রের আজ

নবজীবন লাভ হইল। তাহার কাতর প্রার্থনায় বড় বাবাজী মহাশয় রামচন্দ্রের পত্নী এবং বিধবা পুত্রবধূকেও মন্ত্র প্রদান করিয়া কৃতকৃতার্থ করিলেন। তখন তিনজনেই উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। উহাদিগের মুখে আজ অন্য কোন কথা নাই, কেবল "হা মহাপ্রভু! আম্মার গতি কি হেব?" এই একমাত্র বুলি। তখন বড় বাবাজী মহাশয় রামচন্দ্রকে প্রেমালিঙ্গনদানে এবং তাহার পত্নী ও পুত্রবধূকে চরণধূলি দিয়া সস্নেহে প্রেম-গদগদকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "স্থির হও, তোমাদের কোনও ভয় নাই। ধন্য কলিযুগ! নাম আশ্রয় কর। কলিযুগে নাম ভিন্ন জীবের অন্য কোন গতি নাই।" মহাপ্রভুর শ্রীমুখের বাক্য :—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

তিনি আরও বলিয়াছেন :—

হর্ষে প্রভু কহে শুন স্বরূপ রামরায়।
নামসংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়॥
সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে করে কৃষ্ণ আরাধন।
সেই সে সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥"—চৈঃ চঃ।

শুনিয়া রামচন্দ্র কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "মু ত ঘোর পতিত পাতকী, মোহর ত পাপর অবধি নাহি, এহি পাপর প্রায়শ্চিত্ত কি এ জীবনে হোই পারিব? বড় বাবাজী মহাশয় রামচন্দ্রকে আশ্বাসবাক্যে কহিলেন, "বাবা, কোন চিন্তা নাই।

"একবার কৃষ্ণ নামে যত পাপ হরে।
পাতকীর সাধ্য নাই তত পাপ করে॥"

নাম লইতে শুচি, অশুচি বা দেশকালপাত্রের বিচার নাই। হেলায় শ্রদ্ধায় এমন কি ব্যঙ্গচ্ছলেও যদি কেহ শ্রীভগবানের নাম উচ্চারণ

করে, তাহারও সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হইবে, সন্দেহ নাই। সত্যযুগে ধ্যান-ধারণা, ত্রেতায় যাগযজ্ঞ, দ্বাপরে সেবাপরিচর্য্যাদি করিয়া জীব যে ফল লাভ করিত, কলিযুগে একমাত্র নামসংকীর্ত্তনে বিনাক্লেশে তদধিক ফল পাইবে। ইহা শাস্ত্রবাক্য। তাই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন, "ধন্ত ধন্ত কলিযুগ সর্ব্বযুগসার। হরিনাম সংকীর্ত্তন যাহাতে প্রচার॥" রামবেহারা আর কিছু বলিতে পারিল না, কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন অন্তরে কি একটা সন্দেহ রহিয়া গেল। তখন একটী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আসিয়া বড় বাবাজী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি যে নামের এতে শক্তি ব্যাখ্যা করিবা হেলে, এ কোউ নাম?" বড় বাবাজী মহাশয় উত্তর করিলেন, "বাবা, শ্রীভগবানের মহামহিমময় নামের কোনই নির্দ্দিষ্টতা নাই। শ্রীভগবান্ ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু। তিনি নামী, অর্থাৎ যতরূপ নাম হইতে পারে, তাহারই মূলে একমাত্র তিনি। নিজ নিজ শ্রদ্ধা, ভক্তি, অনুরাগ এবং রুচি অনুসারে শ্রীভগবানের যে নামে এবং যে রূপে জীবের যেরূপ প্রীতি হইবে, সর্ব্বান্তর্য্যামী ভাবগ্রাহী ভগবান্ সেই নামে এবং সেই রূপেই তাহাকে কৃপা করিবেন।" ব্রাহ্মণ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "হেলেমধ্য শাস্ত্র কৌনসি নামর প্রাধান্ত করি নাহাস্তি কি?" বড় বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "আছে বৈকি মহাশয়, শাস্ত্র বলিয়াছেন, তিনবার সহস্রনাম পাঠ করিলে যে ফল হইবে, একবার কৃষ্ণনাম করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হইবে। তিনবার কৃষ্ণনাম করিলে যে ফল হইবে, কৃষ্ণমনোমোহিনী বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধানাম একবার করিলে সেই ফল হইবে। তিনবার শ্রীরাধানাম করিলে যে ফল হইবে, শ্রীরাধাগোবিন্দ যুগল নাম একবার করিলে সেই ফল হইবে। ফলতঃ এই সকল নামে অপরাধের বিচার আছে এবং অপরাধের বিচারানুসারে

প্রেমরূপ ফলপ্রাপ্তির তারতম্য হইয়া থাকে। কিন্তু কলিপাবনাবতার পরম দয়াল নিতাইগৌরাঙ্গনামে অপরাধের বিচার নাই। যে কোন প্রকারে নিতাইগৌরাঙ্গ নাম লইলেই পুলকাশ্রু, কম্প প্রভৃতি সাত্ত্বিক বিকার সকল পরিলক্ষিত হইয়া থাকে এবং জীব পরমানন্দরসে নিমগ্ন হইয়া ব্রহ্মানন্দকেও তুচ্ছবোধ করে। পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই সকল সিদ্ধান্তের সুমীমাংসা করিয়া গিয়াছেন :—

"নিতাই চৈতন্যে নাহি এ সব বিচার।
নাম লইতে প্রেম হয় বহে অশ্রুধার॥"—চৈঃ চঃ।

বড় বাবাজী মহাশয়ের মুখে নিতাইগৌরাঙ্গনামের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া কহিলেন, "মহাশয়, আম্ভে বহুদিন বহু সাধুলোকের সঙ্গ করি অছু, কিন্তু এপরি সরল ভাষারে প্রকৃত নামতত্ত্ব মু কাহারি মুখে শুনি নাহি। আজি আম্ভর এ ক্ষুদ্র গ্রামটী ধন্য হেলা, এই পাষণ্ড বেহারার চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার হোই গলা।" এই কথা শুনিবামাত্র রামবেহারা সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের চরণ ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "গোসাই মহাপ্রভু, এত্তেদিন মু ন বুঝি করি ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব নিন্দা এবং পরদ্রোহ প্রভৃতি করি অছি। আপন মানে মোহর অপরাধ ক্ষমা করি আশীর্ব্বাদ করন্তু যে পরি গুরু বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ পাদপদ্মরে মোহর অচলা ভক্তি রহে।"

এই সময়ে ঐ গ্রামবাসী একজন ভক্ত আসিয়া বড় বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন, "মহাপ্রভু, আম্ভ ঘরে যাই সমস্তে রোষেই করি ঠাকুরঙ্কর ভোগ দেই প্রসাদ পাইবাকু হুকুম হেউ!" এইরূপে তিন চারিজন আসিয়া অনুরোধ করিতে লাগিলেন। মহাপুরুষ একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "দেখ বাবা, আমি যখন প্রথম এই দরিদ্রের কুটীরে আতিথ্য

স্বীকার করিয়াছি, তখন ঠাকুরের ভোগের ব্যবস্থা এস্থানে না হইলে আমি অন্যত্র যাইতে ইচ্ছা করি না। আর এক কথা—তোমরা যখন সকলেই আমাদিগকে নিজগৃহে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ করিতেছ, তখন আমি কাহারই বা অনুরোধ রক্ষা করি, কাহাকেই বা মনঃক্ষুণ্ণ করি? আমরা আজ এখানেই থাকিব। তোমরা দুঃখিত হইও না।" এই কথা শুনিয়া পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সকলকে বলিলেন, "দেখ, মোহর মন হোয় তুম্ভে সমস্তে মিলি কিছি কিছি দেই এহি থানরে ভোগর যোগাড় করি দিঅ।" এই প্রস্তাবে সকলেই সম্মত হইলেন এবং আনন্দে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র বেহারা সপরিবারে বড় বাবাজী মহাশয়ের শ্রীচরণে চিরজীবনের মত আত্মসমর্পণ করিয়া ধন্য হইল। আজ দরিদ্র গোয়ালার গৃহে মহামহোৎসব। গ্রামবাসী সকলেই যথাসাধ্য চা'ল, ডা'ল, শাকসবজি সংগ্রহ করিয়া রামচন্দ্রের বাড়ীতে আনিয়া দিতে লাগিল। প্রায় চল্লিশ জনের আহারোপযোগী দ্রব্যাদি আসিয়া উপস্থিত হইল। বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গিগণ রন্ধনের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ঠাকুরের ভোগরাগ প্রস্তুত হইল। শ্রীনিতাইগৌরাঙ্গের ভোগ হইবার পর বড় বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "বাবা, তোমরা সকলেই মহাপ্রসাদ পাইতে ব'স।" এই কথা শুনিয়া সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল "হে মহাপ্রভু, আপন পাই সারিলে আম্ভে সবু আপনঙ্কর অধরামৃত পাইবু।" বড় বাবাজী মহাশয় আর আপত্তি করিতে না পারিয়া সঙ্গিগণ সঙ্গে অগত্যা প্রসাদ পাইতে বসিলেন। বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ সকলেরই লক্ষ্য মহাপুরুষের প্রতি। সকলেই একদৃষ্টে ইঁহার প্রতি অঙ্গের শোভা সন্দর্শন করিতেছে। আজ তাহাদের প্রাণ যেন আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে যেমন ইঁহাদের

প্রসাদ পাওয়া শেষ হইল, অমনি সুচতুর নবদ্বীপ দাস আদরপূর্ব্বক সকলকে একসঙ্গে বসাইয়া দিলেন। সকলেই অবিচারে প্রসাদ পাইতে বসিয়া গেল। জাতি, কুল, মানমর্য্যাদা বা স্থান-অস্থানের কথা কাহারও মনে স্থান পাইল না। অপূর্ব্ব ব্যাপার! ব্রাহ্মণ-গোয়ালা একত্র বসিয়া প্রসাদ পাইতেছে। আমরা ইহাকে কি বলিব? বস্তুশক্তি না ভক্তিশক্তি? কিংবা এই মহাপুরুষের মোহিনী শক্তি? পরিবেশন আরম্ভ হইলে সব একাকার হইল। এক এক পাতায় মহাপ্রসাদ পড়িতেছে, আর "জয় নিতাই" বলিয়া গগনভেদী উচ্চধ্বনি উঠিতেছে। সকলেরই আন্তরিক বাসনা, বড় বাবাজী মহাশয়ের অধরামৃত পায়। তাহাদিগের মনস্তুষ্টির জন্য নবদ্বীপ দাস বড় বাবাজী মহাশয়ের অধরামৃত একত্রে মাখিয়া সকলের পাতায় কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দিবামাত্র সকলেই পরমানন্দে মহাপ্রসাদ পাইতে লাগিল। চল্লিশ জনের উপযোগী প্রসাদে প্রায় একশত পঁচিশ জন লোকের উদরপূর্ণ হইল দেখিয়া উপস্থিত লোক সকল একেবারে অবাক্ হইল। সকলেই পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, "এহি মহাপুরুষ কেভে মনিষ নুহে, মনিষে এপরি প্রেম, এপরি অলৌকিক শক্তি হেবা সম্পূর্ণ অসম্ভব।"

এইরূপ পরমানন্দে মহোৎসব ব্যাপার সুসম্পন্ন হইল। ইহারা সে রাত্রি তথায় বাস করিলেন! পরদিবস গ্রামস্থ লোকসকল একত্র হইয়া ইঁহাদিগকে দুই একদিন রাখিবার জন্য অনেক পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। কিন্তু ইঁহারা তাহাদিগকে নানারূপ সান্ত্বনাবাক্যে বুঝাইয়া রওনা হইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তখন রামচন্দ্র বেহারা সপরিবারে আসিয়া বড় বাবাজী মহাশয়ের চরণতলে নিপতিত হইয়া তাঁহাদিগকে এক্ষণে কিরূপভাবে চলিতে হইবে, কিরূপ আহারাদি

করিতে হইবে, এই সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। ইনি কৃপাপরবশ হইয়া বলিলেন, "অনিন্দুকভাবে নাম লইবে। অভ্যাগত ব্যক্তিকে শক্তি অনুসারে যথাযোগ্য সেবা করিবে। আহারীয় যে কিছু বস্তুই হউক, তুলসীপত্র দ্বারা ভগবান্‌কে নিবেদন করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিবে। কায়মনোবাক্যে হিংসাদ্বেষ পরিত্যাগ করিবে। স্থাবর-জঙ্গম, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ প্রভৃতি দৃশ্যাদৃশ্য যাবতীয় পদার্থ হইতে আপনাকে নীচ মনে করিয়া জগদ্‌গুরু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর দাসভাব অঙ্গীকারপূর্ব্বক দীনভাবে জীবন যাপন করিবে। প্রভু যখন যে ভাবে রাখিবেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা কর্ত্তব্য। যথালাভে সন্তুষ্ট হইবে।"

রামচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া বড় বাবাজী মহাশয় এইভাবে গ্রামস্থ লোকদিগকে সদুপদেশ প্রদানপূর্ব্বক নামকীর্ত্তন করিতে করিতে রওনা হইলেন। গ্রামবাসী অনেকলোক ইঁহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে বহুদূর পর্য্যন্ত আসিলে, বড় বাবাজী মহাশয় তাহাদিগকে নানাবিধ মধুর বাক্যে প্রবোধ দিয়া গৃহে গমন করিতে বলিলেন। কিন্তু তাহাদের মন যেন ইঁহার সঙ্গে সঙ্গেই চলিল। কেবল শূন্য দেহ লইয়া তাহারা বাড়ী ফিরিল। মহাপুরুষের সঙ্গগুণে একদিনের জন্য তাহারা সকলে যেন দেহ, গেহ, পুত্র পরিজনাদি সমস্ত ভুলিয়া গিয়া কি এক আনন্দময় রাজ্যে বাস করিতেছিল। এক্ষণে ইঁহার বিরহে বড়ই কাতর হইয়া পড়িল। আজ রাম বেহারার মনে বিন্দুমাত্র সুখ নাই। মুখে গুরুদেবের কথা ভিন্ন অন্য কথা নাই। ইঁহার সঙ্গিগণের মধুর ব্যবহার এবং অপূর্ব্ব প্রেমভাবের কথাই আজ তাহাদের আলোচ্য বিষয়। সগোষ্ঠী রামচন্দ্র আজ পরম দুর্লভ প্রেমধনলাভে নবজীবন প্রাপ্ত হইয়াছে। যে সকল লোক রামচন্দ্রকে পূর্ব্বে অবজ্ঞার চোখে দেখিত, তাহারাও একে একে রামচন্দ্রের বাড়ীতে আসিয়া তাহাকে দেখিয়া

আশ্চর্য্য হইতে লাগিল। আজ আর রামচন্দ্র সে রামচন্দ্র নাই। পরম নৈষ্ঠিক ও ভক্তিমান্ রামচন্দ্রকে দেখিয়া আজ সকলেই নিজেকে ধন্য বোধ করিতেছে। গ্রামবাসী সকলেই আজ মহাপুরুষের জয় জয়কার করিতেছে।

রামচন্দ্র ও তাহার পরিবারবর্গ গুরুবাক্যে দৃঢ়ভাবে নিষ্ঠা স্থাপন করিয়া পরমানন্দ ভজন করিতে লাগিল। সকলেই নিরামিষভোজী হইল। তুলসীপত্র দ্বারা ঠাকুরকে নিবেদন না করিয়া কোন দ্রব্যই গ্রহণ করে না। একদিন গ্রামবাসী একজন [illegible]ান্ত ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাম, তোমার পূর্ব্বাবস্থা বড়ই খারাপ ছিল, এবং অন্নচিন্তায় তোমার মুখ সর্ব্বদা ম্লান থাকিত। আজকাল দেখিতেছি, তুমি বেশ আনন্দে আছ, তোমার কিরূপে চলে বল দেখি ?" রাম বলিল, "কি আর বলিব ? যেদিন হইতে পরম করুণাময় সর্ব্বৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ শ্রীগুরুদেব এ জীবাধমের পর্ণকুটীরে পদার্পণ করিয়া কৃপা প্রদর্শনপূর্ব্বক এই দরিদ্র পরিবারটীকে নিজগুণে আত্মসাৎ করিয়াছেন, সেই দিন হইতেই আমার ঐহিক পারত্রিক সকল প্রকার দুঃখ দূর হইয়া গিয়াছে। বলিলে হয়ত আপনারা বিশ্বাস করিবেন না, এখন প্রায় প্রতিদিনই শ্রীগুরুদেবের কৃপায় এই জীবাধমের পর্ণকুটীরে দুই এক জন অতিথি পদার্পণ করিয়া থাকেন।"

রামচন্দ্র বেহারার পর্ণকুটীর বাস্তবিকই আনন্দভবন হইল। শ্রীগুরু-দেবের অপার কৃপাবলে সকলই সম্ভবপর হয়। রামচন্দ্র গোয়ালা জাতি হইলেও সে আজ শ্রীগুরু-কৃপাবলে বলীয়ান্। গ্রামবাসী সকলেই এক্ষণে তাহার কুটীরে আসিতে লাগিল। এমন কি, কোন লোকের গৃহে বিবাদ-বিসম্বাদজনিত কোনরূপ অশান্তি ঘটিলে, তাহারা বলিয়া থাকে, "আর সংসার ভাল লাগে না, তাই একবার রাম বেহারার শান্তিকুটীরে যাইয়া

মনটা সুস্থির করিয়া আসি।” ‘গুরুকৃপায় অসম্ভবও সম্ভব হয়।’ এই দরিদ্র গোয়ালা রামচন্দ্রের দৃষ্টান্তই একথার প্রকৃত প্রমাণ। যে রামচন্দ্রের কেহ নামও করিত না, যাহার বাড়ীতে ভ্রমেও কেহ যাইত না, আজ প্রত্যেকের মুখেই তাহার নাম। তাহার পর্ণকুটীরখানি আজ শান্তিনিকেতন। ধন্য গুরুভক্তি! ধন্য রামচন্দ্র!

ভুবনেশ্বরদর্শন

বড় বাবাজী মহাশয় সগণে “আবার বল হরিনাম আবার বল” এই নাম ধরিয়া প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে করিতে দিবা দ্বিপ্রহরের সময় একাম্রকাননে উপস্থিত হইলেন। শ্রীভুবনেশ্বর দর্শন ও প্রণাম বন্দনাদি করতঃ শ্রীমন্দিরের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, সিংহদ্বারের নিকট তিন মূর্ত্তি বৈষ্ণব ও কয়েক মূর্ত্তি ব্রাহ্মণ একত্রে বসিয়া কি কথোপকথন করিতেছেন। ইঁহাদিগকে দেখিবামাত্রই একজন পরিণতবয়স্ক বাবাজী বলিয়া উঠিলেন, “এই যে বড় বাবাজী মহাশয় আসিয়াছেন, এই মহাপুরুষকে জিজ্ঞাসা করিলেই সকল সন্দেহ মিটিয়া যাইবে।” এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণগণ ও বাবাজীগণ বিশেষ আগ্রহসহকারে ইঁহাদিগকে সেখানে বসাইলেন। বড় বাবাজী মহাশয় বিনীতবচনে বৈষ্ণবগণের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহাদের মধ্যে একজন বাঙ্গালী বাবাজী ছিলেন, তিনি বলিলেন, “আমি বাঙ্গালী, গৌড়ীয় সম্প্রদায়। শ্রীঅদ্বৈতপরিবার। আমার নাম মাধব দাস। এই দুই মূর্ত্তি উড়িষ্যাবাসী। একজন গঙ্গামাতামঠের শিষ্য, নাম রসিক দাস। অপর একজন শ্যামানন্দী; নাম দীনবন্ধু দাস। মহাশয় ইঁহারা উড়িয়া। ইঁহাদের কোনরূপ শাস্ত্রজ্ঞান নাই; মিছামিছি মূর্খের মত বৃথা তর্ক করিয়া আমাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। আপনি বলুন দেখি, কোন বৈষ্ণব কি কখন শিবের

প্রসাদ পাইয়া থাকে ? নরোত্তম ঠাকুর লিখিয়াছেন, "না করিবে অন্য দেবের নিন্দন বন্দন। না করিবে অন্য দেবের প্রসাদ ভক্ষণ ॥" সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পূর্ণ পূর্ণতম ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন অংশী এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি দেবদেবীগণ তাঁহার অংশকলাস্বরূপ। 'এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।' শিবপুরাণেও লিখিত আছে, 'অগ্রাহ্যং শিবনির্ম্মাল্যং।' ইঁহারা বলে যে, ভুবনেশ্বরের প্রসাদ শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব সকলেই পাইয়া থাকেন। এ কথা সত্য কিনা, আপনি সুমীমাংসা করিয়া সকলের সন্দেহ ভঞ্জন করুন।" বড় বাবাজী মহাশয় অতি বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, "মহাশয়, আমি মূর্খ, আমার কোন শাস্ত্রজ্ঞান বা বিচারশক্তি নাই। শুনিয়াছি ভুবনেশ্বরের নাকি গোপালমন্ত্রে ভোগ হয়। সত্য কিনা, পাণ্ডা ঠাকুরগণ বলিতে পারেন।" পাণ্ডাগণ এতক্ষণ নীরবে ছিলেন। বড় বাবাজী মহাশয়ের কথা শুনিয়া আনন্দে বলিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁ, তাত বটে ; এখানে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমুখের আদেশ অনুসারে গোপালমন্ত্রেই ভুবনেশ্বরদেবের ভোগ হইয়া থাকে।"

ইহা শুনিয়া মাধবদাস বাবাজী, বলিলেন, 'তবে ত আর আমাদের মহাপ্রসাদ পাইতে কোন আপত্তিই হইতে পারে না! এ কথা পূর্ব্বে কেহ আমাকে বলেন নাই।" বড় বাবাজী মহাশয় তখন হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "যা হউক, এখন ত আমাদের প্রসাদ পাইবার ব্যবস্থা হইল!' মাধবদাস বাবাজী তখন ইঁহাদিগকে স্নানাদি কার্য্য সমাপন করিতে অনুরোধ করিলে বড় বাবাজী মহাশয় পুনর্ব্বার বিনীতভাবে কহিলেন, "আচ্ছা, স্নানাদির পর সুস্থ হইয়া এ কথার যথাশক্তি আলোচনা করা যাইবে। এই বলিয়া সকলে স্নান করিতে গেলেন। ইঁহাদের স্নান-আহ্নিক যেমন শেষ হইল, অমনি একটী

পাণ্ডা ব্রাহ্মণ আসিয়া বলিলেন, "তোমরা কি প্রসাদ পাইবে বাবা? তবে আমার সঙ্গে শ্রীমন্দিরে আইস। ইঁহারা বলিলেন, "আমরা ত কিছু পয়সা কড়ি দিতে পারিব না। আমরা কাঙ্গাল।" তদুত্তরে তিনি হাসিয়া বলিলেন, "যিনি কাঙ্গালের ঠাকুর আশুতোষ, তিনিই তোমাদের জন্য প্রসাদের ব্যবস্থা করিয়াছেন। নতুবা হঠাৎ এমন সময় একটী বৃদ্ধা সধবা স্ত্রীলোক কোথা হইতে আসিবেন? কি আশ্চর্য্য! আসিয়াই আমার হাতে দুইটী টাকা দিয়া বলিলেন, দেখ, কয়েকজন নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব শ্রীমন্দিরের দ্বারে বসিয়া আছে। ওই টাকা নিয়া তুমি তাহাদিগকে পরিতৃপ্তভাবে ভোজন করাও। আমি আর দাঁড়াইতে পারিতেছি না।" এই বলিয়া তিনি বিদ্যুৎগতিতে চলিয়া গেলেন। কি বলিব বাবা, আমি ভজনহীন নরাধম। আমি তখন কিছু বুঝিতে পারিলাম না। মা আমার যখন অন্তর্হিতা হইলেন, তখন আমার চৈতন্য হইল! তখন বুঝিলাম ইনি ত সামান্যা রমণী নহেন। সাক্ষাৎ মা অন্নপূর্ণা আসিয়াছিলেন। আমি বড় দুর্ভাগ্য, তাঁহার দর্শন পাইয়াও চিনিতে পারিলাম না। হায় কি দুরদৃষ্ট! ধিক্ আমার জীবনে! বাবা, ধন্য তোমাদের ভজনবল। ধন্য তোমাদের মনুষ্যজন্ম। ধন্য তোমাদের সৌভাগ্য। নতুবা মা অন্নপূর্ণা তোমাদের জন্য এত ব্যস্ত হইবেন কেন?"

ব্রাহ্মণের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া বড় বাবাজী মহাশয়ের সর্ব্বাঙ্গ পুলকে পূর্ণ হইল। চোখের জলে বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। তখন গদগদকণ্ঠে বলিলেন, "বাবা, মা আমার পরম দয়াময়ী। তিনি ত চিরদিনই তাঁহার অধম সন্তানের জন্য ব্যাকুলা। কিন্তু আমরা তাঁহার এমনই অকৃতজ্ঞ সন্তান যে, ভ্রমেও একবার মায়ের দয়ার কথা মনে করি না। শীঘ্র চলুন বাবা, মায়ের কৃপাদত্ত মহাপ্রসাদ পাইয়া জীবন ধন্য করি।" এই বলিয়া সদলবলে শ্রীমন্দিরে প্রবেশ

পূর্ব্বক পরমানন্দে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করতঃ বিন্দু সরোবরের তীরে যাইয়া উপবেশন করিলেন। ক্রমে ঐ স্থানেই দুই একটী করিয়া প্রায় আট দশজন ব্রাহ্মণ এবং দশ পনের জন অন্যান্য ভদ্রলোক আসিয়া জুটিলেন। তখন পুনরায় সেই পূর্ব্ব কথার প্রসঙ্গ উঠিল। বড় বাবাজী মহাশয় মাধব দাস বাবাজী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবাজী মহাশয়, আপনার প্রশ্নের উত্তরে আপনি কি শাস্ত্রপ্রমাণ শুনিতে চান, না যুক্তি শুনিতে চান?

মাধব দাস। আমি শাস্ত্রপ্রমাণও চাই, যুক্তিসিদ্ধান্তও চাই। উভয় প্রকারেই আপনি আমার প্রশ্নের মীমাংসা করুন।

বড় বাবাজী। আচ্ছা, আপনি শিবকে কি মনে করেন?

মাধব দাস। আমি তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করি।

বড় বাবাজী। জগন্নাথদেবকে আপনি কি মনে করেন?

মাধব দাস। জগদীশ্বর—বৈকুণ্ঠনাথ—নারায়ণ।

বড় বাবাজী। তবে একটু স্থিরচিত্তে বুঝিয়া দেখুন দেখি, ঈশ্বরে এবং জগদীশ্বরে অর্থাৎ অংশে আর অংশীতে কখনও কি ভেদ হইতে পারে? তবে তাঁহার প্রসাদ পাইতে বাধা কি?

এই কথা শুনিয়া হরিদেব মিশ্র নামক জনৈক ব্রাহ্মণ বলিলেন, "মহাশয়, বহুদিন পূর্ব্বে এই কথা লইয়া একবার এইস্থানে বিচার হইয়াছিল। তখন বৈষ্ণবস্মৃতি হরিভক্তিবিলাস অনুসন্ধান করিয়া এ বিষয়ে বহু বহু প্রমাণ সংগ্রহ করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে দুই একটী আমার মনে আছে।

চতুর্দ্দশ বিলাসে, যথা :—

"মদ্ভক্তঃ শঙ্করদ্বেষী মদ্দ্বেষী শঙ্করপ্রিয়ঃ।
উভৌ তৌ নরকং যাতৌ যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥"

হয়শীর্ষে :—

"যঃ শিবঃ সোঽহমেবেহ যোঽহং স ভগবান্ শিবঃ।
নাবয়োরন্তরং কিঞ্চিদাকাশানিলয়োরিব॥" ইত্যাদি।

বড় বাবাজী। অন্যত্র কথিত আছে, "বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ" যখন তিনি বৈষ্ণবাগ্রগণ্য, তখন তাঁহার সম্বন্ধে আর বিচার করিবার শক্তি আমাদের রহিল কোথায়? শ্বপচও বৈষ্ণব হইলে তাঁহার উচ্ছিষ্ট যদি দেবদুর্লভ হয়, তবে বৈষ্ণব-শিরোমণি মহাদেবের উপর আমাদের এত কটাক্ষ কেন?

মাধব দাস। শ্রীশঙ্করদেব ভগবৎ-প্রসাদ পাইলে আর কোন আপত্তি নাই। তিনি যখন অনিবেদিত বস্তু গ্রহণ করেন, তখন কি করা যাইবে?

বড় বাবাজী। এ কথা কোন প্রকারেই যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। কারণ যিনি বৈষ্ণবপদবাচ্য, তিনি কখনই অনিবেদিত বস্তু গ্রহণ করিতে পারেন না। এ কথা ধ্রুব নিশ্চিত। যদিও তিনি আপনার আমার মত তুলসীপত্র-দ্বারা যথাবিধি বাহ্য প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন না, তাই বলিয়া কি বুঝিতে হইবে, বৈষ্ণবাগ্রগণ্য দেবদেব মহাদেব ভগবৎ-অনিবেদিত বস্তু গ্রহণ করেন? শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্য খণ্ডে ষোড়শ পরিচ্ছেদে কালিদাস ও ঝড়ু ঠাকুরের কথাটি ভাবিয়া দেখুন দেখি :—

"ভুমিমালী জাতি বৈষ্ণব ঝড়ু তাঁর নাম।
আম্রফল লইয়া তিঁহো গেলা তাঁর স্থান॥
আম্রভেট দিয়া তাঁর চরণ বন্দিল।
তাঁহার পত্নীকে তবে নমস্কার কৈল॥"

* * *

"ঝড়ুঠাকুর ঘর যাঞা দেখি আম্রফল।
মানসেই কৃষ্ণচন্দ্রে অর্পিলা সকল॥
কলা পাটুয়া ডোঙ্গা হইতে আম্র নিকষিয়া।
তাঁর পত্নী তাঁরে দেন, খায়েন চুষিয়া॥
চুষি চুষি চোকা আঁঠি ফেলেন পাটুয়াতে।
তাঁরে খাওয়াইয়া পত্নী খাইলা পশ্চাতে॥
আঁঠি চোকা সেই পাটুয়া ডোঙ্গাতে ভরিয়া।
বাহির উচ্ছিষ্ট গর্ত্তে ফেলাইল লইয়া॥
সেই খোলার আঁঠি চোকা চুষে কালিদাস।
চুষিতে চুষিতে হয় প্রেমের উল্লাস॥"—চৈঃ চঃ।

এখানে কি বলিবেন? পূজ্যপাদ গ্রন্থকর্ত্তা "মানসেই কৃষ্ণচন্দ্রে অর্পিলা সকল" এই কথাটি অনুমান করিয়া লিখিলেন। যেহেতু ঝড়ুঠাকুর বৈষ্ণব; অনিবেদিত বস্তু খাইবেন না। কিন্তু তুলসীও দিলেন না; কাজে কাজেই শ্রীভগবান্‌কে আম্রফল মানসেই অর্পণ করিলেন, ইহাই স্থির হইল। তাহা না হইলে তাঁহার উচ্ছিষ্ট খাইয়া কালিদাসের প্রেম কোথা হইতে আসিল? ভগবদধরামৃত ভিন্ন কখনও জীবের হৃদয়ে প্রেমসঞ্চার হইতে পারে না। তখন হরি মিশ্র বলিলেন, "ঐ হরিভক্তি-বিলাসেই এ বিষয়েরও প্রমাণ আছে। যথা :—

"কার্য্যং গুণাবতারত্বৈনৈক্যাক্রুদ্রস্য বৈষ্ণবৈঃ।
বৈষ্ণবাগ্র্যতয়া শ্রৈষ্ঠ্যাৎ সদাচারাচ্চ তস্য তৎ॥"

বড় বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "অগ্রাহ্যং শিবনির্ম্মাল্যং" যাহা আপনি বলিলেন, একথা বৈষ্ণব বলিয়া নয়, শৈব পর্য্যন্তও মানিতে বাধ্য। কারণ স্বয়ং শঙ্করদেব শঙ্করাচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া বেদান্তসূত্রের ভাষ্যে নিত্য চিন্ময় স্বরূপ শ্রীভগবানের আকারকে ক্ষণভঙ্গুর বলিয়া

ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। যদিও শঙ্কর এই কার্য্যটী "জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু" এই ভগবদাজ্ঞায় করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি আপনাকে ইহাতে অপরাধী মনে করিয়া যে মুখে বিষ্ণুনিন্দা করিয়াছিলেন, সেই ঊর্দ্ধমুখের প্রতি অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, "যেজন আমার ঊর্দ্ধমুখের নির্ম্মাল্য পর্য্যন্তও গ্রহণ করিবে, সে আমায় ভজিলেও পাষণ্ডী হইবে।" কোনও বাক্যের একদেশ গ্রহণ করা বড়ই দোষের। আমার বিশ্বাস, যতদিন দেব-দেবী কেন, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গাদিতেও দ্বেষভাব থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত সনাতন ধর্ম্ম যাজন হইতে পারে না। মহাজনবাক্যেও ইহা দেখিতে পাই :—

"ব্রাহ্মণ আচণ্ডাল কুক্কুরান্ত করি।
দণ্ডবৎ করিবেক বহুমান্য করি॥
এই সে বৈষ্ণবধর্ম্ম সবারে প্রণতি।
সেই ধর্ম্মধ্বজী যার ইথে নাহি মতি॥"

আমাদের একটি প্রধান দোষ এই যে, আমরা উড়িষ্যাবাসিগণকে অশ্রদ্ধা করিয়া থাকি। কিন্তু আমরা ভাবিয়া দেখি না যে, তাহারা আমাদের অপেক্ষা কোন্ অংশে হীন। যদি তাহাই হইবে, তবে এত দেশ থাকিতে জগন্নাথদেব উড়িষ্যাদেশে কেন অবতীর্ণ হইলেন? শ্রীভগবান্ কাহারও বা কোন বস্তুর বশীভূত নহেন; তিনি স্বতন্ত্র। তিনি ধনের বশীভূত নহেন; কারণ তিনি লক্ষ্মীপতি। তিনি বিদ্যার বশীভূত নহেন; কারণ তিনি সরস্বতীপতি। তিনি রূপের বাধ্য নহেন; কারণ তিনি মদনমোহন! তিনি গুণেরও বাধ্য নহেন; কারণ ত্রিগুণাধীশ্বরগণ তাঁহার দাস। তিনি গুণাতীত, অথচ গুণময়। তিনি জ্ঞানের বশীভূত নহেন; কারণ তিনি জ্ঞানাতীত সচ্চিদানন্দময়। তবে তিনি কিসের বশীভূত? "ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ।" তিনি একমাত্র প্রেমভক্তির

অধীন ; অতএব ভক্তের বশীভূত। তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন, "অহং ভক্তপরাধীনঃ।" বৎসসকল যেমন গাভীর পশ্চাদ্ধাবিত হয়, তিনিও তদ্রূপ সর্ব্বদা ভক্তের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। ভক্ত তাঁহাকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যাহা অর্পণ করে, তিনি প্রীতির সহিত তাহাই গ্রহণ করেন। অধিক আর কি বলিব? ভগবান্ সম্পূর্ণ ভক্তের অধীন। মানবজাতি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিসে? একমাত্র ভক্তিবলে। উড়িষ্যাবাসীদের ভক্তিবল অধিক। ভক্তিবলে তাহারা ভগবানকে বশীভূত করিয়া নিজদেশে রাখিয়াছে। উহাদিগকে আমাদের সম্মান করা উচিত; কারণ উহারা ভক্তিবলে আমাদের অপেক্ষা অধিক বলবান্। আর একটি কথা আমাদের ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য—আমাদের যাঁহাকে লইয়া এত গরব, যাঁহার কৃপাকটাক্ষে আমরা নিকৃষ্ট হইয়াও জগৎপূজ্য হইয়াছি, যাঁহার আবির্ভাবমাত্রেই বিলুপ্তপ্রায় সনাতন বৈষ্ণব ধর্ম্ম পুনরুজ্জীবিত হইয়া জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে, সেই পরম করুণাময়, মঙ্গল স্বরূপ, সর্ব্বাবতারসার, পূর্ণ পূর্ণতম, নদীয়াবিহারী শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আমার চব্বিশ বৎসর কাল এই উড়িষ্যাদেশে অবস্থান করিয়া লীলারঙ্গে কত না ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন; তাঁহার নীলাচললীলা মধুর হইতেও সুমধুর। লীলাময় শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর নীলাচলে বসিয়া প্রেমভক্তির বন্যায় ত্রিজগৎ ভাসাইয়াছিলেন। একটু ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি ভাই, আমাদের হৃদয় অভিমানে ভরা। অভিমানীর হৃদয় সর্ব্বদা অশান্তিপূর্ণ; অভিমানীর সঙ্গ দুঃখপ্রদ। তাই বোধ হয়, সুখময় গোরাচাঁদ আমাদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক নীলাচলে আসিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন। অভিমানই সকল অনর্থের মূল। আমরা যদি জগদ্বাসী আপামর সাধারণকে শ্রেষ্ঠজ্ঞানে প্রীতির চোখে দেখিয়া নিজেকে হীন মনে করিতে পারিতাম, আমরা যদি ভক্তিডোরে আমাদিগের ঘরের

ঠাকুরকে বাঁধিতে পারিতাম, তবে কি এমন সাধের সুরধুনীতীর,— এমন সোণার নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া রসময় গৌরাঙ্গ আমার, মুণ্ডিত-মস্তকে ডোর কৌপীন ধারণ করিয়া লবণ সমুদ্রের তীরে বালুকাময় ভূমিতে আসিয়া বাস করিতে পারিতেন? কখনই না। তবে আমরা কি লইয়া এত গরব করি? ধিক্ আমাদের অভিমানে! ধিক্ আমাদের জীবনে! আমাদের এই অভিমানভরা বুদ্ধিকেও ধিক্! আমাদের যদি বিন্দুমাত্র বুদ্ধি বা অনুভবশক্তি থাকে, তাহা হইলে এখনও আমাদের চৈতন্য হওয়া উচিত। ভাগ্যবান্ উড়িষ্যাবাসীদিগকে আমাদের ত্রিসন্ধ্যা প্রণাম ও বন্দনা করা কর্ত্তব্য। ইহাতে কেহ যেন আমাকে পক্ষপাতিত্ব দোষে দোষী মনে করিবেন না! আমি এই উড়িষ্যাদেশের অনেক পল্লীগ্রামে ভ্রমণ করিয়া আপামর সাধারণ বালক বৃদ্ধ এবং স্ত্রীজাতির মধ্যে যতদূর ধর্ম্মভাব এবং জগন্নাথৈকনিষ্ঠতা দেখিলাম, বাঙ্গালী ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যেও তাহার শতাংশের একাংশ আছে কিনা সন্দেহ। যাহা হউক, আমি আজ আপনার অনেক সময় নষ্ট করিলাম, ক্ষমা করিবেন।

এই বলিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিবামাত্র পাণ্ডা পূজারী প্রভৃতি উপস্থিত ব্যক্তিগণ সকলেই প্রতি নমস্কার করার পর মাধব দাস বাবাজী অতি বিনীতভাবে বলিলেন, "বাবাজী মহাশয়, আজ আপনার শ্রীমুখের উপদেশপূর্ণ তত্ত্বমীমাংসা শ্রবণে আমার চিত্তের অনেক ভ্রম সংশোধন হইল। আমি আজ ধন্য হইলাম।" তখন অপরাপর সকলেই বলিয়া উঠিলেন, "আমরা এইস্থানে বহু সাধু, সন্ন্যাসী, বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণের দর্শন ও সঙ্গলাভ করিয়া থাকি; কিন্তু এ পর্য্যন্ত আমাদের ভাগ্যে আপনার ন্যায় গুণগ্রাহী তত্ত্বজ্ঞ মহাত্মার দর্শনলাভ ঘটে নাই। এক্ষণে আমাদের একান্ত ইচ্ছা, আপনি কয়েকদিন ভুবনেশ্বরে অবস্থান করিয়া

আমাদিগকে কৃতার্থ করুন।" বড় বাবাজী মহাশয় বিনীতভাবে কহিলেন, "ইহা ত আমার পরম সৌভাগ্যের কথা। তবে এ যাত্রায় বোধ হয় আমাদিগকে বহুদিন এখানে রাখা প্রভুর ইচ্ছা নয়; নতুবা গৌড়দেশে যাইবার জন্য মনপ্রাণ এত উৎকণ্ঠিত হইবে কেন?" ইত্যাদি নানা প্রকার কথোপকথনে সায়ংকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন সকলেই ভুবনেশ্বরের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সন্ধ্যাআরতি আরম্ভ হইল। ইহারা সকলেই একতানে "গৌরহরিবোল" বলিয়া গগনভেদী ধ্বনিতে উপস্থিত দর্শকবৃন্দের মনপ্রাণ মাতাইয়া তুলিলেন। সমবেত পাণ্ডাগণ ও দর্শকবৃন্দ আজ এক অভিনব আনন্দস্রোতে ভাসমান হইয়া একবাক্যে বলিতে লাগিলেন, "আমরা এরূপ অনির্ব্বচনীয় আনন্দ কখনও অনুভব করি নাই; কখন করিব বলিয়াও মনে হয় না।"

রাত্রি প্রায় এক প্রহরের সময় মহাপুরুষের মনে কি এক অভিনব ভাবের উদয় হইল। তিনি করযোড়ে শ্রীভুবনেশ্বর দেবের নিকট দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ মনে মনে প্রার্থনা করতঃ প্রেমানন্দে উচ্চকণ্ঠে কীর্ত্তন ধরিলেন:—

"জয় শিব শঙ্কর বৈষ্ণবাগ্রগণ্য।
কৃষ্ণভক্তি দিয়া জগজীবে কর ধন্য॥
জ্ঞানদাতা বলি তোমায় বলে সর্ব্বজন।
অতএব তব পদে এই নিবেদন॥
রমণী মাত্রেতে দেহ মাতৃসম জ্ঞান।
নরমাত্রে ভ্রাতৃসম জ্ঞান কর দান॥
প্রাণিমাত্রে গুরুর প্রকাশ জ্ঞান দেহ।
আমা হ'তে দুঃখ যেন নাহি পায় কেহ॥

সখী আনুগত্যে রাধাদাসী অভিমান।
ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণে ঔপপত্য জ্ঞান ॥
তে নিত্যত্ব মহাপ্রসাদে বিশ্বাস।
ব-গুরু অভিন্ন প্রকাশ ॥
যেই নাম সেই নামী এক করি মানি।
এই সব জ্ঞান মোরে দেহ শূলপাণি ॥
যদি বল অপাত্রেতে দান দিতে মানা।
তুমি আশুতোষ তাই করি এ প্রার্থনা ॥
কলিহত মায়ামুগ্ধ দেখি জীবগণে।
অবতীর্ণ করাইলে শচীর নন্দনে ॥
অবিচারে নাম প্রেম জীবে বিলাইতে।
আনিলে দয়াল নিতাই এই পৃথিবীতে ॥
অতএব তোমা সম দাতা কেবা আছে।
অধম পতিত দাঁড়াইবে কার কাছে ॥"

এইরূপে কিছুক্ষণ কীর্ত্তনের পর পাণ্ডাগণ অতি যত্নসহকারে ইঁহাদের মহাপ্রসাদ পাইবার বন্দোবস্ত এবং থাকিবার সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পরদিবস প্রভাতে ইঁহারা গৌড়দেশ-গমনোন্মুখ হইলে হরিদেব মিশ্র বলিলেন, "যদি আপনাদের একান্তই যাওয়া স্থির হইয়া থাকে, তবে আমরা তাহাতে বাধা দিতে ইচ্ছা করি না। তবে বাবা, আমাদের একান্ত অনুরোধ, আপনারা একাম্রকাননবাসী অপরাপর দেবদেবীগণকে একবার দর্শন করিয়া যান।" সরলহৃদয় মিশ্র মহোদয়ের প্রস্তাব শুনিয়া অতি প্রফুল্লচিত্তে তাঁহাকেই অগ্রবর্ত্তী করিয়া সকলে দর্শনার্থ চলিলেন। শ্রীঅনন্তবাসুদেব, শ্রীকেদারগৌরী, শ্রীস্বপ্নেশ্বর প্রভৃতি সকল দেবদেবীগণকে দর্শন এবং যথাযোগ্য প্রণামবন্দনাদি করিলেন।

তদনন্তর করযোড়ে প্রণতিপূর্ব্বক উপস্থিত লোকদিগের নিকট ক্ষমা এবং বিদায় গ্রহণ করিয়া 'গৌর হরিবোল' বলিতে বলিতে পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

খণ্ডগিরিদর্শন

শ্রীভুবনেশ্বর হইতে অনুমান তিন মাইল দূরে খণ্ডগিরি অবস্থিত। বড় বাবাজী মহাশয় সগণে ঐ স্থানে গমন করিয়া অভূতপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করিলেন। ইনি এক এক গৌফার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া "হে মহাপুরুষগণ, আপনারা একবার আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টে চাহিয়া আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমরা নির্ব্বিরোধে শ্রীশ্রীগুরুবাক্য পালন করতঃ আত্মসুখবিবর্জ্জিত হইয়া জগজ্জীবের মঙ্গল উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ করিতে পারি। যেন আমরা নিষ্কাম ভাব হৃদয়ে জাগাইতে পারি। যেন আমরা জীবনে মরণে অহৈতুকী বিশুদ্ধা প্রেমভক্তি লাভের যোগ্যতা লাভ করিতে পারি" করযোড়ে সাশ্রুনয়নে গদগদকণ্ঠে এইরূপ কত যে প্রার্থনা ও আত্মনিবেদন করিতে লাগিলেন, তাহার ইয়ত্তা করা সুকঠিন। ইহার সেই আর্ত্তিপূর্ণ আত্মনিবেদন শুনিলে পাষাণ হৃদয়ও দ্রব হইয়া যায়। সেই সকল করুণ বিলাপ যাহারা একবার শুনিয়াছেন, তাঁহারা জীবনে কখনও ভুলিতে পারিবেন না।

এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে যেস্থানে বিকলাঙ্গ দেবদেবীমূর্ত্তি সকল রহিয়াছেন, সেইস্থানে যাইবামাত্র বড় বাবাজী মহাশয়ের হৃদয়ে যেন কি এক ভাবের উদয় হইল। দুইটী চোখের জল শ্রাবণের ধারার ন্যায় বহিয়া যাইতে লাগিল। বিষধর সর্পদষ্ট ব্যক্তির ন্যায় বুকে হাত দিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। সে আকুল আর্ত্তনাদ শুনিলে পাষাণ হৃদয়ও গলিয়া যায়· "উঃ, জ্ব'লে গেল, প্রাণ যায়, আর যে সহ্য হয়

না" এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে ভূতলে নিপতিত হইলেন। ইহাতেও কি শান্তি আছে? ভূমিতলে পড়িয়া দুই হস্তে সজোরে নিজ বক্ষে আঘাত করিতে লাগিলেন। যদি ইঁহার সঙ্গিগণ হাত ধরিয়া রাখেন, তবে ইনি সেই উন্নতাবনত কঠিন পার্ব্বত্যভূমিতে মাথা কুটিতে থাকেন। কি উপায়ে ইঁহাকে প্রকৃতিস্থ করা যাইবে, এই ভাবিয়া সহচরগণ বড়ই বিচলিত হইয়া পড়িলেন। এমন কেহই নিকটে নাই যে, এ বিষয়ে সদ্যুক্তি প্রদান করিয়া উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা করেন। ইঁহাদিগের সম্বলের মধ্যে "হা নিতাই, জয় নিতাই, গৌরহরি বোল" এই বুলি। তাহাতে স্থির হওয়া দূরে থাকুক, মহাপুরুষ আরও অধীর হইতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া সকলেই মর্ম্মাহত হইলেন, সকলেরই চোখে জল—মুখে হাহাকার শব্দ। অন্যান্য ভক্তগণ তাঁহাদের শ্রীগুরুদেবের দেহে কোনরূপ সাত্ত্বিক বিকার কিংবা ঐশ্বর্য্যাদির বিকাশ দেখিলে আনন্দে আত্মহারা হন; ইঁহারা কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইঁহারা চান, ইঁহাদের প্রাণের প্রাণ, সর্ব্বস্বধন দাদা ঐশ্বর্য্যাদি-ভাববিহীন সাদা মানুষটী থাকেন। তাই আজ সকলেই চিন্তান্বিত—সকলেরই চোখে জল—সকলেরই মুখ ম্লান। ইঁহাদের তাৎকালিক অবস্থাদর্শনে বোধ হইতে লাগিল, যেন ইঁহারা প্রাণশূন্যদেহে হাহুতাশ করিতেছেন; ইঁহাদের প্রাণটী সেই উন্নতাবনত উত্তপ্ত পার্ব্বত্য ভূমিতে গড়াগড়ি যাইতেছে।

ইঁহাদের অত্যন্ত ব্যাকুলতা দেখিয়াই যেন পক্কশ্মশ্রু, পক্ককেশ, সুদীর্ঘকায় একটী মহাপুরুষ তথায় উপস্থিত হইয়া ঈষৎ হাসিতে হাসিতে ইঁহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা এত বিষণ্ণ কেন? কি হইয়াছে, বাবা?" শুনিয়া সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "বাবা, আমাদের সর্ব্বস্বধন, ঐহিক ও পারত্রিক জীবনের একমাত্র সম্বল প্রাণাধিক

পরাণপুতলীটি এই সকল বিকলাঙ্গ শ্রীমূর্ত্তি[illegible] মর্ম্মাহত হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছেন। বাবা! আমরা একান্ত অসহায়; আমাদের বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, ভক্তি যাহা কিছু সবই ইনি। আমরা সকলে আপনার চরণে সবিনয়ে প্রার্থনা করিতেছি, আপনি দয়া করিয়া আমাদের প্রাণের দাদাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া দিন।" বৃদ্ধ মহাপুরুষটী মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ভয় কি বাবা? তোমরা স্থির হও। আমি একবার দেখি।" এই বলিয়া সেই শোকসন্তপ্ত ধূল্যবলুণ্ঠিত, অশ্রুজল-সিক্ত, পুলকাদি-পরিব্যাপ্ত-কলেবর বাবাজী মহাশয়ের অঙ্গে পদ্মহস্ত বুলাইয়া বলিতে লাগিলেন, "বাবা, এত অধীর কেন? তুমি সুবোধ এবং তত্ত্বগ্রাহী; সামান্য কারণে এত অস্থির হওয়া তোমার মত জ্ঞানবান্ ভক্তের উচিত হয় না। উঠ, স্থির হও। আমাকে বুঝাইয়া বল, তুমি কি জন্য এত মানসিক কষ্ট পাইতেছ।" অভিনব কণ্ঠস্বর শ্রবণে এবং নূতন করস্পর্শে বড় বাবাজী মহাশয় চমকিতভাবে উঠিয়া বসিলেন এবং দুই হস্তে উভয় চক্ষু মার্জ্জন করিতে করিতে অভ্যাগত বৃদ্ধ মহাপুরুষটীকে প্রণাম করিলেন। কিন্তু আবেগাতিশয্যে কোন কথা বলিতে পারিলেন না। মহাপুরুষ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, তোমার এত দুঃখের কারণ কি? এই সকল শ্রীবিগ্রহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভগ্ন দেখিয়া তুমি কি মনে করিতেছ যে, মহামহিমময় দেব-দেবীগণের বাস্তবিকই অঙ্গহীনতা ঘটিয়াছে?" বড় বাবাজী মহাশয় করযোড়ে কাতরস্বরে বলিলেন, "বাবা, বাস্তবিক আমার ঐরূপ ধারণাই হইয়াছে; কারণ ভগবৎস্বরূপের অঙ্গাঙ্গিভেদ নাই এবং ভেদ বুদ্ধি করিলেও নাকি অপরাধ হয়, শুনা আছে।" মহাপুরুষ ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "তোমাকে শাস্ত্রপ্রমাণ আমি পরে দেখাইব। তুমি যেমন যুক্তি ভালবাস, আমিও তোমাকে প্রথমে এসম্বন্ধে কয়েকটী যুক্তি

দেখাইতেছি। মনে কর, একটী চতুর্ভুজ নারায়ণমূর্ত্তির দুইখানি চরণ ভগ্ন হইল। ইহা অবশ্য সাময়িক গ্রহবৈগুণ্য ব্যতীত আর কিছুই নয়। এখন ভাবিয়া দেখ, যদি নারায়ণবিগ্রহে গ্রহগণ পীড়ন করিতে সমর্থ হয়, তবে তাঁহার ভগবত্তায় হানি হইল না কি? যদি বা কোন দেবদেবীর মূর্ত্তি কোন কারণে একেবারে ভগ্ন হইয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে কি মৃত কল্পনা করিতে হইবে? দেবদেবীগণের যদি মৃত্যু কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে তাঁহাদিগের অমরত্ব কোথায় রহিল? বেদের কর্ম্মকাণ্ডে এবং বৈষ্ণবস্মৃতি হরিভক্তিবিলাসে উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীমূর্ত্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা আবাহনাদি করণীয়। ইহাতেই বুঝা যায়, যতদিন পর্য্যন্ত শ্রীমূর্ত্তিতে তত্তদ্দেবদেবীর অধিষ্ঠান আরোপ করিয়া সেবাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান না হইবে, ততদিন সে সকল দেবমূর্ত্তির দেবত্ব লইয়া আলোচনা করাই বৃথা।

একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা একথা আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতেছি। একটী দোকানে তুমি এবং একজন ময়রা কিছু ময়দা, ঘৃত, সুজি, চিনি কিনিতে গিয়াছ। দোকানী তোমাকেও যে ময়দা ঘৃত প্রভৃতি দিল, অপর ব্যক্তিকেও তাহাই দিল। বাড়ীতে আসিয়া তুমিও তদ্দ্বারা পুরীমোহনভোগ প্রস্তুত করিলে, ময়রাও তাহাই করিল। তোমার প্রস্তুতী পুরীমোহনভোগ ঠাকুরের ভোগ হইলে, তাহার মহাপ্রসাদ সংজ্ঞা হইল। স্পর্শদোষে উহা দূষিত হইবে না। এমন কি, কুক্কুরোচ্ছিষ্ট হইলেও উহা সর্ব্বথা গ্রহণীয়; কারণ মহাপ্রসাদের অপবিত্রতা নাই। কিন্তু সেই দ্রব্যাদিদ্বারা ময়রা কর্ত্তৃক প্রস্তুতী পুরীমোহনভোগ যদি কুক্কুরস্পৃষ্ট হয়, তাহা কি তুমি গ্রহণ করিতে পার?

বড় বাবাজী মহাশয় অতি মনোযোগপূর্ব্বক মহাপুরুষের মুখে তত্ত্বকথা শুনিতেছিলেন। তাঁহার শেষ প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, 'কখনই না।

মহাপুরুষ। কেন, তোমার পুরীমোহনভোগ আর সেই ময়রার পুরীমোহনভোগে আকারগত কোন বিভিন্নতা আছে কি?

বাবাজী। না, তা কিছুই নাই।

মহাপুরুষ। যখন আকারে এক, তখন ক্রিয়া কেন ভিন্ন হইবে?

বাবাজী। আমার পুরীমোহনভোগ শ্রীভগবানের ভোগ লাগায়, ইহাতে তাঁহার অধরামৃত সঞ্চার হইয়াছে। কাজেই ইহা নিত্য চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে; আর ঐ ময়রার পুরীমোহনভোগ ভগবানের ভোগ লাগে নাই; কাজেই উহা প্রাকৃত বস্তু। উহাতে স্পর্শদোষ ঘটিবে বৈ কি?

মহাপুরুষ। তবেই বুঝিতে হইবে যে, সেবাদি অনুষ্ঠান দ্বারা শ্রীমূর্ত্তিতে নিত্যত্ব স্থাপিত হইলে সেই শ্রীমূর্ত্তিই নিত্য সত্য পূর্ণ চিন্ময় বস্তু হইলেন। নতুবা উহা যে প্রাকৃত সেই প্রাকৃত বস্তুই রহিলেন। মনে কর, কোন দেবতার একখানি প্রতিমূর্ত্তি কোন স্থানে অতি সমাদরে পূজিত হইতেছে, তাঁহার ভোগরাগ ও আরতি শয়নাদি সকলই হইতেছে। সেবকগণ তাঁহার স্তুতি বন্দনাও করিতেছেন। সেই প্রতিমূর্ত্তির সেবা-পূজা ব্যতিক্রমে ফলাফলও উপলব্ধি হইতেছে। অপরদিকে তাঁহারই আর একখানি প্রতিমূর্ত্তি কেহ পথের ধূলায় ফেলিয়া দিয়াছে। শত সহস্র লোক তাহা পদদলিত করিতেছে। এমন কি, তাহার উপর দিয়া শকটাদিও চলিয়া যাইতেছে। কেন, যিনি সেবাপূজার ব্যতিক্রমে সেবককে শাস্তি দিতে পারেন, তিনি রাস্তার লোককে বা শকটচালককে কিছু বলিতে পারেন না কি? অতএব সেই সেবিত শ্রীবিগ্রহে এবং দোকানে বিক্রয়ার্থ রক্ষিত বা গৃহে সজ্জিত দেবমূর্ত্তিতে প্রভূত বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। শ্রীবিগ্রহ সেবানুযায়ী ফলদানে সমর্থ, এবং সেবকের সর্ব্বস্বধন। বাজারে বিক্রীত ও গৃহে সজ্জিত দেবমূর্ত্তির দুর্দ্দশা চিরকালই হইয়া থাকে। উহা দেখিয়া মনে দুঃখ করিলে চলিবে কেন? এই সকল

বিকলাঙ্গ বিগ্রহাদি যাহা দেখিতেছ, ইহাও তাই। ইহাতে দেবত্ব আরোপিত হয় নাই; সুতরাং ইহা দেখিয়া দুঃখ করিবার কোনই প্রয়োজন নাই।

বড় বাবাজী মহাশয় ধীরভাবে উত্তর দিলেন, "বাবা, আপনি যে সকল কথা বলিলেন, তাহা খণ্ডন করিবার শক্তি আমার নাই। আমি শাস্ত্রজ্ঞান-বর্জ্জিত, কিন্তু আমার মন এ কথায় সন্তুষ্ট হইল না। কোন ভগবদ্‌বিগ্রহের চিত্র বা শ্রীমূর্ত্তি দেখিলেই তাহাতে তদবয়ব-বিশিষ্ট দেবদেবীর সাক্ষাৎ অধিষ্ঠান বলিয়াই প্রতীতি হয়। আরোপিত দেবত্বে, শ্রীবিগ্রহসেবকের ফলাফলের তারতম্য হইতে পারে। তাই বলিয়া শ্রীভগবানের অস্তিত্ব বা নাস্তিত্বের প্রতি ভগবদ্ভক্তের আরোপ কারণ হইতে পারে না। শ্রীভক্তমালে লিখিত আছে, মাংসবিক্রয়ীর তুলাদণ্ডস্থ শালগ্রামশিলা ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক পূজিত হইয়াও ব্রাহ্মণকে আদেশ দিয়াছিলেন, 'আমাকে পুনরায় মাংসবিক্রেতার নিকট রাখিয়া আইস।' তবেই বুঝিতে হইবে, সেইখানেই তাঁহার সুখ ছিল। ব্রাহ্মণগৃহে পূজিত হইয়াও তিনি অসুখী ছিলেন। সেই মাংসবিক্রেতা তাঁহাকে শালগ্রামশিলা বলিয়া জানিত না। অতএব বস্তুশক্তি কখনও বুদ্ধির অপেক্ষা করে না। অমৃত, জ্ঞাত অজ্ঞাত যে কোনরূপেই হউক, একবার উদরস্থ হইলেই অমরত্ব লাভের ন্যায় যে কোনরূপেই হউক, দেবদেবী, গুরু-বৈষ্ণব প্রভৃতির চিত্র বা শ্রীমূর্ত্তি দর্শনমাত্রেই তাঁহাদিগের সান্নিধ্যলাভ হইবেই হইবে তবে এইরূপ বৈপরীত্যের কারণ একমাত্র ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? দ্বারকা লীলাবসানে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানই এবিষয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।"

মহাপুরুষ বাবাজী মহাশয়ের সারগর্ভ ও ভক্তিমূলক তত্ত্বকথা শ্রবণে নিরতিশয় আনন্দলাভ করিলেন। তাঁহার সকল যুক্তিতর্ক ভক্তে

ভক্তিতরঙ্গে ভাসিয়া গেল। তিনি প্রেমানন্দে অধীর হইয়া বাবাজী মহাশয়কে প্রেমালিঙ্গন দিলেন। কিছুক্ষণ পরে অশ্রুপূর্ণলোচনে গদগদ-ভাবে বলিতে লাগিলেন, "বাবা! তোমার এইরূপ অপূর্ব্ব ভক্তিভাব দেখিয়া এবং তোমার মুখে ভক্তিতত্ত্বের সুন্দর মীমাংসা শুনিয়া আমি যে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করিলাম, তাহা একমুখে বলিয়া শেষ হয় না। আমি তোমায় একান্তমনে আশীর্ব্বাদ করি, তুমি দীর্ঘায়ু লাভ কর এবং এইরূপ সুমীমাংসিত বিশুদ্ধ ভক্তিতত্ত্বের আলোচনা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর মতানুযায়ী নির্ম্মল ভগবদুপাসনা প্রচার দ্বারা জগদ্বাসী নরনারীগণকে কল্পিত নানারূপ উপধর্ম্মের কবল হইতে রক্ষা কর। তোমার দ্বারাই এই দুরূহ কার্য্য সাধিত হইবে। নিতাইচাঁদ তোমাকে পূর্ণ শক্তি দান করিয়াছেন। তাঁহার কৃপায় তুমি জগজ্জয়ী হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু তোমাকে যে কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছেন, আর কালবিলম্ব না করিয়া সেই কার্য্যসাধনে যত্নবান্ হও। ভগবান্ তোমার সহায়তা করিবেন; কোনই চিন্তা নাই।" এই বলিয়া মহাপুরুষ দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন। প্রকাশ যে, এই মহাপুরুষই বড় বাবাজী মহাশয়কে আর একবার শ্রীগুরুদেবের দর্শনার্থে সরযূতীরে যাইতে বলিয়াছিলেন।

মহাপুরুষ চলিয়া গেলে, বাবাজী মহাশয় ও ইঁহার সঙ্গিগণ মহাপুরুষের কথাপ্রসঙ্গ লইয়া অনেকক্ষণ আলোচনা করার পর সেস্থান হইতে কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলেন, জনৈক ভক্ত কিছু চিড়া, মুড়কী, ফলমূল প্রভৃতি আহারীয় দ্রব্য লইয়া ইঁহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। ইঁহাদিগকে দর্শন করিবামাত্র তিনি অতি আগ্রহের সহিত ফলমূলাদি গ্রহণ করিতে বিশেষ অনুরোধ করায় ইঁহারা ঠাকুরের ভোগ লাগাইয়া কিছু কিছু প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। তৎপরে তথায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

যাজপুরে বিরজাদর্শন

ইঁহারা প্রেমানন্দে দিক্‌বিদিক্-জ্ঞান-শূন্য হইয়া চলিতেছেন। পথ চলিবার কোন পরিমাণ নাই। কোন দিন আট বা দশ ক্রোশ, কোনদিন বা চারি পাঁচ ক্রোশ চলিয়াই বিশ্রাম করিতেছেন। যেদিন যে গ্রামে উপস্থিত হইতেছেন, সেদিন সেই গ্রামেই যেন আনন্দের বাজার বসিতেছে। মহামহোৎসব ব্যাপারের ত কথাই নাই। গ্রামবাসিগণ সকলেই ইঁহাদের সঙ্গলাভে আনন্দসাগরে ভাসিতেছে। দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। এইরূপ ভাবে চলিতে চলিতে একদিন বেলা আন্দাজ দেড় প্রহরের সময় বিরজাক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বড় বাবাজী মহাশয় বিরজাদেবীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া নানাপ্রকার স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে শিশু সন্তান মায়ের নিকট যেরূপ আব্দার করে, ঠিক সেইরূপ ইনি বিরজাদেবীর নিকটে আব্দার করিতে লাগিলেন। ক্রমে সপ্তকুণ্ড, যমের সাত ভগিনী প্রভৃতি তীর্থ ও দেবাদি দর্শন পূর্ব্বক একটী বৃক্ষতলে বসিয়া বলিলেন, "দেখ, বহুদিন যাবৎ মুষ্টিভিক্ষা করা হয় নাই। আজ সকলে মিলিয়া ভিক্ষায় বাহির হওয়া যাক্।" ইহা শুনিয়া সকলেই আনন্দিত হইলেন। নবদ্বীপদাদা বলিলেন, "আমি এবং আর একজন ভিক্ষায় যাই। আপনারা এইস্থানে থাকুন; বেলা অতিরিক্ত হইয়াছে।" কে তাঁহার কথা শুনে? বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "আমিত যাইবই, আর কেহ যাও বা না যাও।" এই বলিয়া নাম করিতে করিতে রওনা হইলেন। কাজে কাজে সকলেই ইঁহার সঙ্গে চলিলেন। বড় বাবাজী মহাশয়ের ভিক্ষা করিবার নিয়ম—নাম করিতে করিতে গ্রামের ভিতর দিয়া চলিয়া যাওয়া। কাহারও কাছে

কিছু চাওয়া বা কাহারও দরজার নিকট দাঁড়াইয়া বহুক্ষণ অপেক্ষা করা ইহার রীতিবিরুদ্ধ। সুতরাং এক এক বাড়ী অতিক্রম করিতেছেন, আর একটু দাঁড়াইতেছেন। চলিয়া যাইবার সময় সেই স্থানের একটু রজ লইয়া যাইতেছেন। ইহাদিগের এরূপ অপরূপ ব্যাপার দেখিয়া সকলেই অবাক্। দলে দলে লোক সঙ্গে যাইতেছে। কেহ কেহ কীর্ত্তনেও যোগ দিতেছে। এইরূপে বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইল। কেন যে ইহারা এরূপ করিতেছেন, কি জন্য যে ইহারা দ্বারে দ্বারে রজ সংগ্রহ করিতেছেন, তাহা কেহই জানে না। ঐ দেশে এরূপ ভিক্ষার রীতি না থাকায় কেহই ইহাদের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিতেছে না। এই ভাবে প্রায় ত্রিশ চল্লিশ জন গৃহস্থের বাড়ীর দ্বার দিয়া নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। ইনি ও ইহার সঙ্গিগণ কাহাকেও কিছু বলিবেন না, ইহাতে কিছু ভিক্ষা সংগ্রহ হউক, আর নাই হউক।

এতক্ষণে নিতাইচাঁদের পরীক্ষার শেষ হইল। ইহাদের মুখ দেখিয়াই যেন তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইল। একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক তাহার গাছের সাত আটটী পেয়ারা আনিয়া ইহাদের সম্মুখে ধরিল। বড় বাবাজী মহাশয় একটু হাসিয়া ফলকয়টী নিজ ভিক্ষার ঝুলিতে লইলেন। ইহা দেখিয়া অন্যান্য লোকদিগের চমক ভাঙ্গিল। তাহারা তখন বুঝিল, ইঁহারা ভিক্ষায় বাহির হইয়াছেন। কেহ চা'ল, কেহ ডা'ল, কেহ বা চিড়ামুড়কী ইত্যাদি যাহার গৃহে যাহা ছিল, তাড়াতাড়ি তাহাই আনিয়া ইঁহার ভিক্ষার ঝুলিতে দিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে তিন চারি বাড়ী যাইতে না যাইতেই ঝুলি ভরিয়া গেল। তখন ইঁহারা পরমানন্দে আসিয়া একটী পুষ্করিণীর তীরে বৃক্ষমূলে ঝুলি নামাইয়া বসিলেন। নবদ্বীপ দাদার উদ্যোগে অতি শীঘ্রই রান্না আরম্ভ হইল। বড় বাবাজী মহাশয়ের

আদেশ যে, যাহা কিছু ভিক্ষাদ্রব্য সংগ্রহ হইয়াছে, সকলই রন্ধন করিতে হইবে। কাজে কাজেই অন্ন, ডা'ল, ব্যঞ্জন সকলই প্রস্তুত হইল এবং সকল দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া একটা জগা খিচুড়ীও হইল। যথাকালে ঠাকুরের ভোগের পর গ্রামবাসী অনেক বালকবালিকা আসিয়া জুটিল। বৃক্ষতলে আজ আনন্দোৎসব। সকলে প্রসাদ পাইয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলেন। সন্ধ্যার সময় ঐ গ্রামবাসী একটী লোক আসিয়া বলিল, "আজ্ঞে, অদ্য রাত্রিতে আপনারা আমাদের ঐ ভাগবতগৃহে থাকিলে ভাল হয়; কারণ এই বৃক্ষতলে বড়ই কষ্ট হইবে।" সকলে ইহাতে সম্মত হইলেন। সন্ধ্যার পর আর একবার বিরজাদেবীকে দর্শন করিয়া সে রাত্রি পূর্ব্বোক্ত ভাগবতগৃহেই যাপন করতঃ পরদিন প্রাতে যাজপুর হইতে রওনা হইলেন।

মদ্যপের উদ্ধার

একদিন বড় বাবাজী মহাশয় সঙ্গিগণসঙ্গে চলিতে চলিতে ক্লান্ত হইয়া বেলা অনুমান দেড় প্রহরের সময় কোনও গ্রামের সন্নিকটে পথিপার্শ্বে একটী প্রকাণ্ড বটবৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এমন সময় একটী বাবু সেখানে আসিয়া অতিশয় তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের বাড়ী কোথায়?" বাবাজী মহাশয় ধীর-ভাবে কহিলেন, "বাবা, আমাদের বাড়ী ঘর কিছুই নাই।"

বাবু। তবে কি তোমরা গাছে থাক?

বাবাজী। আজ্ঞে, তাহারও কোন স্থিরতা নাই।

বাবু। তবে কি তোমরা চোর?

বাবাজী। আজ্ঞে, চোর না হইলেও চোরের সঙ্গী বটি।

বাবু। তবে তোমাদিগকে থানায় চালান দেওয়া যাইবে।

বাবাজী। আজ্ঞে, চালান দেওয়াটা আমরাও চাই, তবে একেবারে বড় হাকিমের নিকট চালান দিলেই ভাল হয়। কারণ আবার যেন আপীলেও খালাস হইতে না পারি।

এই কথা শুনিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিলেন। বাবুটী আর কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে ইঁহাদের নিকট যাইয়া বসিলেন। বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কোথায় যাইবেন?" বাবুটী উত্তর করিলেন, "আমি বালেশ্বর যাইব।" ইঁহারা প্রশ্ন করিলেন, "বালেশ্বর এখান হইতে কতদূর হইবে?" বাবুটী উত্তর দিলেন "প্রায় দশ এগার ক্রোশ হইবে।" কথাবার্ত্তায় এবং ভাবভঙ্গিতে সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে, বাবুটী ঘোর মাতাল। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার সহিত ইঁহারা কথাবার্ত্তা বন্ধ করিলেন না।

এই সময়ে সেখানে জনৈক ভক্ত আসিয়া অতিশয় আগ্রহ সহকারে বলিল, "বাবা, আপনারা অনুগ্রহ করিয়া যদি আমায় আদেশ করেন, তবে আমি কিছু ভোগের যোগাড় করিয়া দিই।" বাবাজী মহাশয় বিনীতভাবে বলিলেন, "বাবা, তোমার ইচ্ছা হয়, আনিতে পার, আমাদের কোনই আপত্তি নাই।" ইহা শুনিয়া ভক্তটী হৃষ্টচিত্তে কিছু চা'ল, ডাল ও শাকসবজি আনিয়া সেখানে উপস্থিত করিল। বাবাজী মহাশয়ের প্রিয় অনুচর পরম কার্য্যদক্ষ নবদ্বীপদাস তৎক্ষণাৎ রন্ধনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। বাবাজী মহাশয় কিন্তু সেই বাবুটীর সঙ্গেই কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। ক্রমে বাবুটীর নেশা একটু কমিয়া আসিলে, তিনি বুঝিতে পারিলেন, ইঁহারা নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব। তখন তিনি বাবাজী মহাশয়ের কথার মর্ম্ম বুঝিতে সমর্থ হইয়া প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। ইনিও ঈষৎ হাসিতে হাসিতে উত্তর করিতে লাগিলেন—

বাবু। আপনারা কোথয় যাইবেন ?

বাবাজী। ভগবান্ জানেন।

বাবু। ভগবান্ আবার কে ?

বাবাজী। তিনি নিত্যশুদ্ধ, চিন্ময়বপু জগদীশ্বর। তাঁহার কটাক্ষ-মাত্রে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।

বাবু। অণু, পরমাণু, ত্রশরেণু প্রভৃতির সংযোগ বিয়োগে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কার্য্য ত আপনা আপনিই সম্পন্ন হইতেছে। চন্দ্রসূর্য্য, গ্রহতারা প্রভৃতি স্বাভাবিক নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া আপনা আপনিই চলিতেছে। আমাদের যখন যাহা প্রয়োজন, তাহা আমাদের নিজ নিজ বুদ্ধি-বৃত্তি-কৌশলেই সংগৃহীত হইতেছে। এই সকল কার্য্যের জন্য কি একজনকে ঈশ্বর বলিয়া মানিতে হইবে ? মাতাপিতার সংযোগে জীবের সৃষ্টি হইয়া থাকে। ঈশ্বর তাহা হইলে কি করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তা হইলেন ? যদি মাতাপিতার সংযোগ ব্যতীত জীবের সৃষ্টি হইত, তবুও না হয় স্বীকার করিতাম, ভগবান্ বলিয়া কেহ একজন আছেন।

বাবাজী। আমার মতে জগতের কোন একটী কার্য্যও ঈশ্বর-শক্তি-ব্যতীত সম্পন্ন হইতে পারে না। আপনি এক একটী করিয়া বলুন, আমি দেখাইয়া দিই। বেশ বলিয়াছেন, "মাতপিতার সংযোগে জীবের সৃষ্টি হয়।" তবে বহু চেষ্টা করিয়াও কোন কোন লোকের সন্তান জন্মে না কেন ? ইহার উত্তরে আপনি কি বলিতে চান ?

বাবু। স্বাভাবিক নিয়ম অর্থে দ্রব্যগুণ বুঝিতে হইবে। দ্রব্যগুণেই সকল কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। দ্রব্যগুণের অপর নাম বস্তুশক্তি। যাহার সন্তান হয় না, সেখানে বুঝিতে হইবে, স্বামী কিংবা স্ত্রীর শরীরে কোনও একটী বস্তুশক্তির অভাব হইয়াছে। সেই শক্তির অভাবই নিঃসন্তান হইবার কারণ।

বাবাজী। মহাশয়, সেই বস্তুর সংযোগ ও বিয়োগের কর্ত্তা কে? দেখা যায়, বহুচেষ্টা করিয়াও কোন লোকের সন্তান-সম্ভাবনা হইল না; আবার কেহ কেহ বা সন্তান না হইবার জন্য কতরূপ চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই সফলমনোরথ হইতে পারিতেছে না। এই সকল যদি মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত হইত, তাহা হইলে ভাবনা ছিল না। এ ত দূরের কথা। আপনি ভাবিয়া দেখুন, আপনার এই দেহটার উপর আপনার কিছু কর্তৃত্ব আছে কি? আপনি যখন বালক ছিলেন, তখন কোন বৈজ্ঞানিক ক্রিয়া কিংবা পার্থিব ঔষধের দ্বারা অকস্মাৎ যুবক হইতে পারিতেন কি? অথবা যখন আপনার মুখে দন্তের উদ্গম হয় নাই, তখন বহু চেষ্টা করিয়া বা ঔষধাদি প্রক্রিয়া দ্বারা আপনি দন্তের উদ্গম করাইতে পারিতেন কি? আবার যখন দন্তসকল উদ্গম হইতেছে, তখন কি কোনরূপ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা তাহা বন্ধ করিতে পারেন? সুন্দর কৃষ্ণবর্ণ সুদীর্ঘ কেশকলাপ কালক্রমে যখন শুভ্রবর্ণ ধারণ করে, সুন্দর মুক্তাফল-নিন্দিত দন্তপংক্তির এক একটী যখন পড়িয়া যায়, তখন কোন দ্রব্যগুণে তাহা রক্ষিত হয় কি? আমরা কি অকৃতজ্ঞ! কি ভ্রমান্ধ! যাঁহার অপার করুণাবলে—যাঁহার অসীম দয়াগুণে আমরা জগতে আসিয়া পরমসুখে কালযাপন করিতেছি, বুদ্ধিমান্ কিংবা বিদ্বান্ হইয়া আগেই সেই সর্ব্বনিয়ন্তা পরমদয়াল পরমেশ্বরের মাথায় লাঠি মারিতে উদ্যত হই। আমার কথায় দুঃখিত হইও না, বাবা! আচ্ছা বল দেখি, মাতৃগর্ভে তোমাকে বাঁচাইবার জন্য কে তোমার হাতে অমৃত নাড়ী ধরাইয়া দিয়াছিল? তুমি ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তোমার জীবনধারণের একমাত্র উপায় মাতৃস্তনের রক্তকে কে ক্ষীররূপে পরিণত করিয়া তোমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল? বিদ্যাবলে বা বুদ্ধিকৌশলে এরূপ হইতে পারে কি?

বাবু। আপনি যাহা বলিলেন, সকলই সত্য ; কিন্তু দেখুন, অপ্রত্যক্ষ বিষয়টা সহজে আমাদের বিশ্বাস হয় না। যদিও আপনার কথায় আমার মনের অনেকটা পরিবর্ত্তন হইল বটে ; কিন্তু এখনও সমস্ত বিষয়টি ঠিক্ হৃদয়ে ধারণা করিতে পারিতেছি না।

বাবাজী। বাবা ! তুমি যে কথাটি বলিলে, তাহা সম্পূর্ণ বিপরীত ; কারণ অনেক অপ্রত্যক্ষ বিষয়ও আমরা বিশ্বাস করিয়া থাকি। কিন্তু জগতে দৃশ্যাদৃশ্য প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে বিরাজমান চিন্ময় ভগবচ্ছক্তিকে দেখিয়া বা অনুভব করিয়াও আমরা তাঁহার সত্তা স্বীকার করিতে চাহি না, এটী আমাদের বিশেষ ভ্রম। আচ্ছা, বল দেখি বাবা, তোমার পিতামহ, প্রপিতামহ প্রভৃতি ইহজগতে বর্ত্তমান ছিলেন কি না, তুমি কি করিয়া তাহা জানিলে ? তুমি যে বশিষ্ঠ বা কশ্যপ প্রভৃতি ঋষিগণের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তাহার কি কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে, না পুরুষ-পরম্পরাগত সংস্কারের বশীভূত হইয়া অন্ধবিশ্বাস করিতেছ ?

বাবুটী এবার একটু ব্যাকুলভাবে বলিলেন, "আচ্ছা ঈশ্বর আছেন" একথা না হয় আমি স্বকার করিলাম ; কিন্তু জীবে আর ঈশ্বরে প্রভেদ কি ?

বাবাজী। ভগবান্ পূর্ণপূর্ণতম, জীব তাঁহার অংশবিশেষ। তিনি চালক, জীব চাল্য। তিনি সচ্চিদানন্দময় পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ; জীব সেই সচ্চিদানন্দের কণা অংশবিশেষ। তিনি মায়াতীত, জীব মায়ামুগ্ধ। তিনি সূত্রধর,, জীব পুত্তলিকা। সার কথা—তিনি প্রভু, জীব তাঁহার নিত্য দাস। তাঁহার কৃপাকটাক্ষ ভিন্ন জীবের কোন বিষয়ে বিন্দুমাত্র ক্ষমতা বা অধিকার নাই। জীব বৃথা অভিমানে মত্ত হইয়া ঈশ্বরের সত্তা লোপ করিতে প্রবৃত্ত হয়।

এতক্ষণে বাবুটীর হৃদয় দ্রবিল—চোখে জল আসিল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তুর্বৃত্তের চূড়ামণি, কুতর্কপরায়ণ, ঘোর নাস্তিকভাবাপন্ন বাবুটী অভিমানের অত্যুচ্চ মঞ্চোপরি বসিয়াছিলেন, কে যেন হঠাৎ তাঁহাকে ধাক্কা দিয়া একেবারে ভূতলে ফেলিয়া দিল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বাবাজী মহাশয়ের চরণতলে নিপতিত হইয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। বাবাজী মহাশয় পরমসাদরে তুটী হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক তাহাকে উঠাইয়া প্রেমালিঙ্গন দান করতঃ সস্নেহ মধুর বাক্যে বলিতে লাগিলেন, "বাবা স্থির হও, ভয় কি? পরম দয়াল পতিতপাবন নিতাইচাঁদ অযাচিতভাবে প্রতি ঘরে ঘরে প্রেমধন যাচিয়া যাচিয়া বিতরণ করিতেছেন। তাঁহার শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ কর, সকল অভাব অশান্তি দূরে যাইবে—তাঁহার কৃপাবলে সর্ব্বদা প্রেমানন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইবে।" বাবুটী করযোড়ে বলিলেন, "প্রভো, আপনি আমাকে কৃপা করিয়া ঘোর নরককুণ্ড হইতে উদ্ধার করিলেন। আমার কোন সুকৃতি নাই; আমি নরাধম পাষণ্ড তুরাচার। করুণাময়! আমি কিছুই বলিতে জানি না। আমি আপনার শ্রীচরণ ছাড়িব না। আমাকে ঘোর মদ্যপায়ী, অসচ্চরিত্র, প্রবঞ্চক জানিয়াও যে নিজমহত্ত্ব ও কৃপা-গুণে আপনার অভয় চরণস্পর্শের অধিকার দিয়াছেন, ইহাই আমার পরম লাভ ও সৌভাগ্য মনে করি। আপনার কৃপায় আমি এখন বলিতে সাহস করিতেছি যে, এ দাস চিরজীবনের মত আপনার শ্রীচরণে বিক্রীত রহিল। জীবাধমকে পাষণ্ডী বলিয়া চরণছাড়া করিবেন না। এই আমার একমাত্র প্রার্থনা।"

এই বলিয়া বাবুটী সাষ্টাঙ্গে প্রণতিপূর্ব্বক বাবাজী মহাশয়ের চরণ তু'খানি ধরিয়া পুনরায় কাতরভাবে বলিতে লাগিলেন,—"প্রভো! আমি ঘোর নারকী, মহাপাপী, তুরাচারী; আমার গতি কি হইবে?" স্বামীর

যাঁহারা তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা বাবুটীর তাৎকালিক অবস্থা দর্শনে সবিস্ময়ে পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, "কি আশ্চর্য্য! যে মণ্ডপের অত্যাচারে গ্রামবাসী লোকের ত কথাই নাই, পথের পথিক পর্য্যন্ত অস্থির হইত, যাহার সহিত দৈবযোগে যদি কোন দিন কোন সাধু সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ হইত, তবে তাঁহাদের দুর্গতির সীমা থাকিত না; সেই ঘোর অত্যাচারীর আজ এই অবস্থা! ইহা বাস্তবিকই অতি আশ্চর্য্যের বিষয় এবং সম্পূর্ণ ধারণার অতীত। মহৎকৃপার কি অপূর্ব্ব শক্তি! এই মহাপুরুষের আকার দেখিয়া এবং কথাবার্ত্তা শুনিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, ইনি একজন সামান্য সাধু নহেন। ইনি অসাধারণ শক্তিশালী মহাত্মা এবং সিদ্ধ পুরুষ।" এই বলিয়া সকলেই বড় বাবাজী মহাশয়ের শ্রীচরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে ইনি তাঁহাদিগকে প্রতিনমস্কার করিলেন।

এই সময়ে প্রিয় নবদ্বীপ দাদা আসিয়া বলিলেন, "দাদা! ভোগরাগ সকলই প্রস্তুত, বেলা অতিরিক্ত হইয়াছে। এখন প্রসাদ পাইবার ব্যবস্থা হউক।" ইহা শুনিয়া বাবাজী মহাশয় বাবুটীকে বলিলেন, আপনার আহারাদির কিরূপ ব্যবস্থা হইবে? আমার সঙ্গে যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের জাতির ঠিক নাই। তবে ভগবানের ভোগ হইয়াছে, আপনার কিরূপ অনুমতি হয়, জানিতে ইচ্ছা করি।" বাবাজী মহাশয়ের এইরূপ কথা শুনিয়া বাবুটী কাতরকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "কৃপাময়! এখনও আমি আপনার কৃপার যোগ্য হইতে পারি নাই? এখনও কি আমাকে আপনার শ্রীচরণ হইতে দূরে ফেলিবার ইচ্ছা আছে? আবার কি আমাকে বিদ্যা, কুল ও অভিমান-পাশে বাঁধিয়া পুনরায় দুস্তর মোহগর্ত্তে ফেলিতে চান? দয়াময় প্রভো! অধম পতিতের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করুন। আমার আজ পরম সৌভাগ্য যে, আপনার

অনুগৃহীত সঙ্গী এই সকল সিদ্ধ মহাপুরুষদিগের হস্তে ভগবৎ-অধরামৃত পাইব। এতকাল মোহমদে মত্ত হইয়া কত কুৎসিত জীবের যে উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়াছি তাহার আর ইয়ত্তা নাই। আমার পরম সৌভাগ্য বলে, আপনার কৃপাপ্রভাবে এবং পূর্ব্বপুরুষের পুণ্যফলে নিবৃত্তিমার্গের একমাত্র অবলম্বন, মানবজীবনের একমাত্র সম্বল, ভক্তের একমাত্র ভরসা, ভগবৎ-অধরামৃত পাইয়া এ জীবাধম যাহাতে কৃতার্থ হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে আজ্ঞা হউক।" এই বলিয়া বাবুটী পুনরায় বাবাজী মহাশয়ের চরণ ধারণপূর্ব্বক কাঁদিতে লাগিলেন। কৃপাময় বাবাজী মহাশয়ের কোমল হৃদয় একেবারে গলিয়া গেল। অবিলম্বে বাবুটীর হস্ত ধারণপূর্ব্বক লইয়া গিয়া নিজের সম্মুখে একখানি পাতা করাইয়া মহাপ্রসাদ দেওয়াইলেন। বাবুটী প্রসাদ পাইতেছেন, আর ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছেন। তিনি ভগৎ-অধরামৃত পাইয়া পুনর্জ্জীবন লাভ করিলেন।

প্রসাদ পাওয়া শেষ হইলে সকলে একত্রে সেই বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতে বসিলেন। তখন যে ভক্তটী ভিক্ষার উদ্যোগ করিয়াছিল, সে যাহা কিছু মহাপ্রসাদ অবশিষ্ট ছিল, তাহা একত্র করিয়া আগন্তুক লোকদিগকে বাঁটিয়া দিল এবং নিজেও কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিল। সেদিন ইহাদের সেইখানেই থাকিবার প্রস্তাব হইলে একটী দোকানী অতি আগ্রহের সহিত তাহার একটী ঘরে রাত্রিবাসের জন্য বিনীতভাবে প্রার্থনা করিলে, দয়ার্দ্রহৃদয় বাবাজী মহাশয় ভক্তের প্রার্থনা উপেক্ষা করিতে না পারিয়া অনতিদূরবর্ত্তী সেই দোকানদারের নির্দ্দিষ্ট গৃহে গমন করিলেন। নবজীবনপ্রাপ্ত অনুরাগী বাবুটী এরূপ সুখময় সঙ্গ ছাড়িয়া যাইতে না পারিয়া ইহাদের সঙ্গেই রহিলেন সন্ধ্যা হইলে নবদ্বীপ দাদা দোকানীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের এখানে খোল

পাওয়া যাইবে কি?” দোকানী বলিল, আমাদের ত খোল নাই; তবে পাখোয়াজ আছে। আজ্ঞা করেন ত আনিয়া দিই।” অগত্যা তাহাই হইল। দোকানী পাখোয়াজ আনিয়া দিলে ইঁহারা সেই পাখোয়াজ বাজাইয়া আরতি কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে বাজারের লোক আসিয়া সেইস্থানে মিলিত হইতে লাগিল। ছোট ঘরে একটু অসুবিধা হইবে মনে করিয়া সকলে বাহিরে আসিয়া বসিলেন। আরতি কীর্ত্তন সমাপ্তির পর সকলে মিলিয়া “নিতাই এনেছে নাম হরিবোল হরিবোল” এই নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে উদ্দণ্ডনৃত্য করিতে লাগিলেন।

জ্যোৎস্না রাত্রি। মৃদুমন্দ পবনহিল্লোলে বৃক্ষলতা দুলিতেছে। তাহারাও যেন কীর্ত্তনানন্দে নাচিতেছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। দোকানী, পসারী, ছোট, বড় কেহই ঘরে নাই। সকলেই সেই প্রেমতরঙ্গে ভাসিতেছে। রাত্রি প্রায় দ্বিতীয় প্রহর পর্য্যন্ত উচ্চ নামকীর্ত্তন হইল। হরির লুটের বাতাসার যেন বৃষ্টি হইতে লাগিল। যে আসিতেছে সেই কিছু বাতাসা ছড়াইয়া দুহাত তুলিয়া নাচিতেছে। কেহ কেহ বা কীর্ত্তনের রঙ্গে গড়াগড়ি দিতেছে। উপস্থিত ভক্ত অভক্ত সর্ব্বসাধারণে বিস্মিতভাবে প্রেমোন্মত্ত মহাপুরুষের নৃত্য-কীর্ত্তন এবং ভাবাবেশ দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। সকলেই মহাপুরুষের জয় জয়কার করিতে লাগিল। কীর্ত্তন শেষ হইলে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর পূর্ব্বোক্ত দোকানী কিছু জলযোগের ব্যবস্থা করার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে নবদ্বীপ দাদা বলিলেন, “বাবা, দোকানের কোন দ্রব্য আমাদের ঠাকুরের ভোগে লাগিবে না এবং আজ আমাদের প্রসাদ পাইবার বিশেষ কোন প্রয়োজনও নাই।” দোকানী কাতর ভাবে বলিল, “বাবা, আমার দোকানে দেশী চিনির মিষ্টান্ন আছে। আপনারা

কৃপা করিয়া ঠাকুরের ভোগ দিয়া কিঞ্চিৎ প্রসাদ পাইলে আমি সবংশে কৃতকৃতার্থ হইব।" দোকানীর সেই ভক্তিপূর্ণ প্রার্থনা ইঁহারা এড়াইতে পারিলেন না। ঠাকুরকে মিষ্টান্ন ভোগ দেওয়া হইলে ইঁহারা কিছু প্রসাদ গ্রহণ করিলেন এবং অবশিষ্ট প্রসাদ সকলকে বাঁটিয়া দিতে বলিলেন। তাহাই হইল। সকলে মহানন্দে প্রসাদ পাইয়া স্ব স্ব গৃহে গমন করিল। ইঁহারাও সে রাত্রি সেইখানেই বিশ্রাম করিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে সকলেই উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিলেন। পূর্ব্বোক্ত দোকানী এবং তথাকার ভদ্রলোক ও ভদ্রমণ্ডলী আসিয়া দুই একদিন সেইখানে থাকিবার জন্য ইঁহাদিগকে বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ইঁহারা সকলকে মধুরবাক্যে প্রবোধ দিয়া "গৌর হরিবোল" বলিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে সেস্থান হইতে রওনা হইলেন। গ্রামবাসী ভক্তগণ সঙ্গে সঙ্গে কিছুদূর অগ্রসর হইলে বাবাজী মহাশয় তাহাদিগকে নানারূপ মিষ্টবাক্যে বিদায় দিয়া নৃত্য করিতে করিতে বালেশ্বর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

রেমুনায় গোপীনাথদর্শন

বড় বাবাজী মহাশয় সগণে যে গ্রামটীতে গত রাত্রি অবস্থিতি করিয়াছিলেন, উহার নাম সোরো। ঐস্থানে বহু ভদ্রলোকের বসতি। পূর্ব্বোক্ত নবজীবনপ্রাপ্ত বাবুটী কিন্তু ইঁহাদের সঙ্গে সঙ্গেই আছেন! উঁহার নাম রামধন গঙ্গোপাধ্যায়। বড় বাবাজী মহাশয়ের কৃপায় তাঁহার কুলের অভিমান ও বিদ্যার গৌরব একেবারে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তিনি এখন দীনহীনের মত অতিশয় নম্রভাবে ইঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছেন। সাত ক্রোশ পথ যাইয়া কোনও একটী ক্ষুদ্রগ্রামে ইঁহারা সেদিন অবস্থান করিতে বাধ্য হইলেন। গ্রামবাসীদিগের আন্তরিক

চেষ্টা ও উৎসাহে সেদিন সেইগ্রামে একটী ক্ষুদ্র মহোৎসব হইল। গ্রামবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই আনন্দে মত্ত হইয়া এই উৎসবে যোগ দিল। সন্ধ্যার পরে বড়বাবাজী মহাশয় কীর্ত্তন আরম্ভ করিলে সঙ্গিগণ প্রেমানন্দে উন্মত্ত হইয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন। গ্রামবাসিগণও এই অভিনব কীর্ত্তনানন্দ-রসে নিমগ্ন হইয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিতে লাগিল।

পরদিবস প্রাতঃকালে সেস্থান হইতে রওনা হইয়া বেলা আন্দাজ দেড় প্রহরের সময় ইঁহারা রেমুনায় শ্রীশ্রীগোপীনাথ জিউর শ্রীমন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখনও ঠাকুরের ভোগ হয় নাই। ইঁহারা সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। ক্রমে অনেক লোকসংঘট্ট হইতে লাগিল। সকলেই যেন নূতন ভাবে বিভাবিত—সকলই যেন নূতন। নব নব ভাবের নৃত্য ও কীর্ত্তন, নব নব ভাবোদ্দীপক পদাবলী শ্রবণে সকলেই বিমোহিত হইল। সকলেই আজ নূতন ভাবের নূতনত্ব অনুভব করিয়া নূতন আনন্দ লাভ করিতে লাগিল। বাবাজীগণেরও যেন নিত্যই নূতন ভাব। এরূপ নবভাব গ্রামবাসিগণ আর কখনও অনুভব করে নাই। গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা বাবাজীগণকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত। কিছুক্ষণ পরে ইঁহারা কীর্ত্তন শেষ করিয়া উপবেশন করিলে শ্রীগোপীনাথ জিউর একটী বৃদ্ধ সেবক আসিয়া ইঁহাদিগকে মহাপ্রসাদ পাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন। বড় বাবাজী মহাশয় ও ইঁহার সঙ্গিগণ অতিশয় কৃতজ্ঞতাসহকারে হৃষ্টচিত্তে বৃদ্ধের বাক্য শিরোধারণ পূর্ব্বক স্নানান্তে গোপীনাথ জিউর মহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলেন। অপরাহ্নে তথায় বহু লোকসমাগম হইল। বড় বাবাজী মহাশয় তাঁহাদের সহিত নানাবিধ ভক্তিমূলক কথার আলোচনা করিতে লাগিলেন।

ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে সকলেই আরতি দর্শনের জন্য চলিলেন। আরতির পর বাবাজী মহাশয় আনন্দে মাতিয়া শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণে আরতি কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে সেস্থান লোকে লোকারণ্য হইল। সংকীর্ত্তনও জমাট বাঁধিল বাবাজী মহাশয় স্বকৃত পদ গাহিতে লাগিলেন! রূপ, অভিসার, মিলন ও নিবেদন গান সকলই ইঁহার স্বরচিত। কার সাধ্য যে, সেই সকল পদাবলী পূর্ব্বমহাজনকৃত নয় বলিবে? কিছুক্ষণ কীর্ত্তনের পর অপূর্ব্ব রঙ্গের তরঙ্গ উঠিল! বাবাজী মহাশয় পদ ধরিলেন :—

"রসপুষ্টি হেতু সখী দু'দল হইল।
কেহ 'রাধে জয়' কেহ 'শ্যামজয়' দিল॥
ললিতা বিশাখা দোঁহে দুই দলপতি।
দুঁহু গুণ গাওত সখীর সংহতি॥"

এই বলিয়া 'শ্যাম জয় জয় রাধে রাধে' ধুয়া ধরিলেন। কাজেই ইঁহার প্রিয় নর্ম্মসহচর নবদ্বীপ দাদা প্রতিপক্ষ হইয়া "রাই জয় জয় রাধে রাধে" গাহিতে লাগিলেন। উপস্থিত ভক্তগণের মধ্যে সকলেই প্রায় নবদ্বীপ দাদার পক্ষ হইলেন। অতি অল্পসংখ্যক লোকই বাবাজী মহাশয়ের দলে যোগ দিল॥ সকলেই যেন কি এক অননুভূতপূর্ব্ব ভাবে উন্মত্ত—সকলেই যেন আনন্দ-সাগরে ভাসিতেছেন। দুই দলের লোক, এই আনন্দ-উৎসবে পরস্পর পরস্পরকে পরাস্ত করার চেষ্টায় বদ্ধপরিকর হইয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেছেন। এই আনন্দকীর্ত্তনে লঘুগুরু-ভেদাভেদ নাই। উভয় দলেরই জিগীষাপ্রবৃত্তি ক্রমশঃ প্রবল হইতে লাগিল। হঠাৎ শ্রীরাধা-রাণীর পক্ষাবলম্বী ললিতার আনুগত্যাভিমানী, প্রেমিকপ্রবর নবদ্বীপ দাদা নিজপদে রাধারাণীর প্রাধান্য বর্ণনা আরম্ভ করিলেন :—

" শুনগো-বিশাখা, রাই রসবতী, বৃন্দাবন-পাটরাণী।

বাবাজী মহাশয় তখনই প্রেমোন্মত্তভাবে উত্তর দিলেন :—

শ্যামরূপলাগি, দিবস রজনী, ভিখারিণী মোরা জানি ॥

নবদ্বীপ। শ্যাম সোহাগিনী, রাধিকা রঙ্গিণী, রমণী মুকুটমণি ।

বাবাজী। শ্যাম সুনাগর, নব নটবর, রসিকেন্দ্র চূড়ামণি ॥

নবদ্বীপ। সর্ব্বগুণযুতা, বৃষভানুসুতা, রাই রাসরসেশ্বরী ।

বাবাজী। শোন্‌গো ললিতা, রাস থাকে কোথা, বিনে শ্যাম বংশীধারী ।

নবদ্বীপ। নাই কি স্মরণ, সে দিনের কথা, মানিনী যবহুঁ ধনি ।
চরণে পড়িয়া, কত না সাধিল, তোর শ্যাম গুণমণি ॥

বাবাজী। শোন্ গো ললিতা কি লাজের কথা, রমণী হইয়া নিজে ।
অকারণ মানে, কত কাঁদাইল, রসিক নাগররাজে ॥

নবদ্বীপ। রমণীসমাজে, আবীর কুঙ্কুম, পাশা জল কেলি আদি ।
সে সব সমরে, নাগর শেখরে, হারি গেও নিরবধি ॥

বাবাজী। শুনগো সজনী, হাম ভাল জানি, একেলা নাগর রায় ।
শতেক রমণী, রাইয়ের সঙ্গিনী, কি আর পৌরুষ তায় ॥

নবদ্বীপ। বরজ রমণী, গণ শিরোমণি, শ্যাম কণ্ঠ হেমমণি ।
শ্যাম জলধরে, নব সৌদামিনী, মহাভাবস্বরূপিণী ॥

এইরূপ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমরসকলহ চলিতে লাগিল। কেহই পরাজয় মানিবার নহেন। রাত্রি প্রায় দেড় প্রহর অতীত হইতে চলিল, তবু কেহ এই প্রেমকীর্ত্তন হইতে নিবৃত্ত হইতেছেন না। হঠাৎ বাবাজী মহাশয় সমতাসূচক পদ ধরিলেন :—

কানন দেবতী, আসি বৃন্দা তথি, বলে সহচরীগণে ।
সম রাই কানু, কেহ নহে ঊন, দুহুঁদুহুঁ রূপে গুণে ॥
বৃন্দাদেবী বাণী, শুনিয়া তখনি, সকলে একত্র হইল ।
জয় রাধা রাধা রমণ বলিয়া, প্রেমে উনমত্ত ভেল ॥

আর দলাদলি নাই; সকলের মুখেই কেবল "জয় রাধা রাধারমণ" এই এক বুলি। উপস্থিত সকলেই সেই উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তনের ভাবতরঙ্গে একেবারে ডুবিলেন। সে আনন্দ—সে প্রেমবিহ্বল ভাব—সে অপূর্ব্ব দৃশ্য ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।" ভাগ্যবান দর্শকবৃন্দ জানিলেন এবং বুঝিলেন, সে আনন্দ কিরূপ।

ক্রমে কীর্ত্তনের তরঙ্গ থামিল। দর্শকবৃন্দ স্থির হইলেন। কীর্ত্তন-বীরগণ একটু বিশ্রাম করিতে বসিলে, একজন সেবক আসিয়া বলিলেন, "বাবাজী মহাশয়, আপনারা কৃপা করিয়া কিছুদিন শ্রীশ্রীগোপীনাথ জিউর শ্রীমন্দিরে অবস্থিতি করিলে আমরা কৃতার্থ হইব। আমরা শ্রীবিগ্রহসেবা করিতেছি বটে; কিন্তু শ্রীশ্রীগোপীনাথ জিউর প্রকৃত তত্ত্ব কিছুই জানি না। আপনাকে দেখিয়া এবং আপনার মধুর কীর্ত্তন শুনিয়া আমাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, আপনি মহাপুরুষ এবং ভগবৎ-লীলা-তত্ত্বজ্ঞ। কৃপা করিয়া কয়েকদিন এই স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক আমাদিগকে শ্রীশ্রীগোপীনাথ জিউর লীলাতত্ত্ব বুঝাইয়া দিন।" বড় বাবাজী মহাশয় বিনীতভাবে কহিলেন, "বাবা, ইহা ত আমার পরম সৌভাগ্যের কথা। আপনারা শ্রীশ্রীগোপীনাথ জিউর চরণকমলে আপনাদের মনোভাব নিবেদন করুন। তাঁহার ইচ্ছা হইলেই আপনাদের বাসনা পূর্ণ হইবে। সম্প্রতি গৌড়দেশ হইয়া শ্রীগুরুদেবের চরণ-দর্শন-মানসে গয়যুতীরে যাইবার জন্য আমার মন বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। যদি প্রভুর কৃপা হয় এবং এ দাসের উপর আপনাদের সকলের আকর্ষণ থাকে, তবে শীঘ্রই পুনরায় শ্রীশ্রীগোপীনাথ জিউ দর্শন এবং আপনাদের সঙ্গসুখ লাভ করিয়া জীবন সার্থক করিব। আপনারা মহৎ, সদ্বংশ-জাত এবং ভগবৎ-সেবাপরায়ণ। আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন, যেন নিতাই চাঁদের দাসানুদাস হইয়া আপনাদের কৃপাদেশ পালন করিতে

সমর্থ হই। তখন পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধ পাণ্ডাজী বলিলেন, "বাবা, গোপীনাথজিউ ভক্তের জন্য যে ক্ষীর চুরি করিয়াছিলেন, সেই ক্ষীর মহাপ্রসাদ কিঞ্চিৎ গ্রহণ করুন।" শুনিবামাত্র বাবাজী মহাশয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, "এ সকলেই আপনাদের কৃপা।" তখন সকলেই হাত মুখ ধুইয়া গোপীনাথ জিউর ক্ষীর এবং অন্যান্য মহাপ্রসাদ কিছু কিছু পাইয়া পরমানন্দে সে রাত্রি সেইখানেই বিশ্রাম করিলেন।

ময়ুরভঞ্জ গমন

রাত্রি প্রভাতে বড় বাবাজী মহাশয় সঙ্গিগণসহ প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া সকলের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক যাত্রা করিবেন, এমন সময় একটী ভক্ত বলিলেন, "বাবা, ময়ুরভঞ্জ অতি সুন্দর স্থান এবং তথায় অতি সুন্দরভাবে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবা হইয়া থাকে। রাজার খুল্লতাত ব্রন্দাবন ভঞ্জ একজন অনুরাগী ভক্ত। যদি অনুগ্রহ করিয়া আপনারা সেখানে যান, আমার বিশ্বাস, বড়ই আনন্দ পাইবেন।"

এই কথা শুনিয়া বড় বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "প্রভু যে কোথায় লইয়া যাইবেন, তিনিই জানেন। বোধ হইতেছে, তিনি আপনার দ্বারাই তাঁহার ইচ্ছা জানাইয়াছেন। তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক।" এই বলিয়া সকলে ময়ুরভঞ্জ যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। সেই ভক্তটীও সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। এই সময়ে নব-জীবন প্রাপ্ত পূর্ব্বোক্ত রামধন গাঙ্গুলি আসিয়া বাবাজী মহাশয়ের চরণতলে পতিত হইলে, ইনি তাঁহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিলেন। রামধন বাবু যেন কি বলিবেন বলিবেন মনে করিতেছেন; কিন্তু বলিতে সাহস পাইতেছেন না। বড় বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "বাবা! বিশুদ্ধভাবে জীবন যাপন কর, পরম দয়াল নিতাইচাঁদ অচিরাৎ কৃপা করিবেন।"

গাঙ্গুলি মহাশয়ের আর ধৈর্য্য রহিল না। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "বাবা, যখন একবার নরক হইতে তুলিয়াছেন, তখন পুনরায় যাহাতে পতন না হয়, তাহার বিধান করুন। প্রভো! কৃপা করিয়া এ জীবাধমকে যদি এবার উদ্ধার না করেন, তবে আর আমার উপায় নাই। আমি ঘোর নারকী; বহুভাগ্যবলে আপনার শ্রীচরণ দর্শনলাভের সুযোগ পাইয়াছি। আর আমি আপনার চরণ ছাড়িরব না। আপনি আমাকে ত্যাগ করিতে পারিবেন না। আমি আপনার অনুগত দাস। আপনাকে কর্ণধার করিয়া সুদুস্তর ভবসমুদ্র পার হইব আশা করিয়াছি। অতএব এই শুভক্ষণে আমাকে মন্ত্র প্রদান করিয়া কৃতার্থ করুন।" এই বলিতে বলিতে পুনরায় বড় বাবাজী মহাশয়ের চরণতলে নিপতিত হইলেন। ইনি ভাবে গরগর হইয়া তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন দিলেন এবং তাঁহার প্রার্থনানুসারে কর্ণে মন্ত্র প্রদান করিবামাত্র পরম সৌভাগ্যবান্ রামধন বাবুর দেহে অশ্রু, কম্প, পুলকাদি সাত্ত্বিক ভাবের বিকার-সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া উপস্থিত লোকসকল স্তম্ভিত হইয়া গেল।

সেইদিন হইতে রামধন বাবু যেন একটী সত্ত্বগুণের মূর্ত্তি হইলেন। মদ্যমাংস ত দূরের কথা; মাদক দ্রব্যমাত্রও আর স্পর্শ করিতেন না। এক বেলা দু'টি আতপচাউলের অন্ন ঠাকুরের ভোগ দিয়া প্রসাদ পান। তাঁহার এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখিয়া সকলেই মনে মনে তাঁহাকে সাক্ষাৎ ধর্ম্মের মূর্ত্তি বলিয়া সম্মান করিতে লাগিল। এমন কি, গাঙ্গুলি মহাশয়ের নাম স্মরণ হইলে সেদিন সকলে সুপ্রভাত বলিয়া মনে করিয়া থাকে। মহতের কৃপায় সকলই সম্ভব হইতে পারে। বড় বাবাজী মহাশয়ের কৃপা-কটাক্ষপাতে এই মত্তপ বিপ্র সত্ত্বগুণের মূর্ত্তি ঋষিতুল্য হইলেন। সকলেই তাঁহাকে ভক্তির চোখে দেখিতে লাগিল।

বড় বাবাজী মহাশয় এই মন্তপ বিপ্রকে উদ্ধার করতঃ "বোল শ্রীনিত্যানন্দ" বলিয়া নাচিতে নাচিতে সঙ্গিগণসহ সে স্থান হইতে রওনা হইলেন। ইনি প্রেমোন্মত্তভাবে দিক্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া চলিতেছেন। যে ভক্তটী ময়ূরভঞ্জের কথা বলিয়াছিলেন, তিনি সঙ্গেই আছেন। বড় বাবাজী মহাশয় অন্তপথে চলিতেছেন দেখিয়া তিনি বলিলেন, "বাবা, যদি ময়ূরভঞ্জ যাওয়াই মত হয়, তাহা হইলে ও পথে না গিয়া এই দিকে যাইতে হইবে।" তখন সকলে সেই ভক্তের প্রদর্শিত পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। কিছুদূর গিয়া বড় বাবাজী মহাশয় সঙ্গিগণকে বলিলেন, "দেখ, আজ দশ বার ক্রোশ পথ না হাঁটিয়া কোথাও থাকা হইবে না।" এই বলিয়া কীর্ত্তন-রঙ্গে নাচিতে নাচিতে চলিলেন।

অনুমান সাড়ে তিন ক্রোশ পথ যাইতে না যাইতেই একটী ভক্ত আসিয়া অতিশয় কাতরভাবে বলিল, "বাবা, আমি নিতান্ত দরিদ্র; আজ আমার এই পর্ণকুটীরে আতিথ্য স্বীকার পূর্ব্বক আমি ভিক্ষা করিয়া যাহা সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাই তোমাদের ঠাকুরকে ভোগ দিতে হইবে।" সঙ্গিগণ মনে মনে বলিলেন, "এইবার বুঝা যাইবে, কাহার ক্ষমতা অধিক।" বড় বাবাজী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ভিক্ষা করিয়া কি রাখিয়াছ?" ভক্তটী উত্তর করিল, "আমার যেমন অদৃষ্ট! দু'টী মোটা চা'ল, আর আকাঁড়া কলাইয়ের ডা'ল রাখিয়াছি। এখন আবার ভিক্ষায় গেলে প্রভু যাহা দেন। আর আমার বাড়ীতে বেগুন, কলা, থোড় এবং ভেণ্ডী আছে। আমি চারিদিন পূর্ব্বে স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম যে, একটী মহাপুরুষ কীর্ত্তন করিতে করিতে কয়েকজন ভক্তসঙ্গে আমার বাড়ীতে আসিয়া আমার কাছে খাইতে চাহিলেন। আমি বলিলাম, 'আমি নিজের পরিবার পোষণ করিতে পারি না; আবার তোমাদিগকে কোথা হইতে খাওয়াইব?' মহাপুরুষ বলিলেন, 'আমার নিতাইচাঁদ

ভিক্ষার চা'ল বড় ভালবাসেন। তুই ভিক্ষা করিয়া যাহা পাইবি, তাহাতেই আমাদের ঠাকুরের যথেষ্ট হইবে।' আমি তোমাদেরই কথামত ভিক্ষা করিয়াছি। তুমিই সেই মহাপুরুষ; এখন ধরা পড়িয়াছ; আর যাবে কোথায়?" এই বলিয়া ভক্তটী বড় বাবাজী মহাশয়ের চরণ ধারণপূর্ব্বক কাঁদিতে লাগিল। ইনি ভক্তের অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না। ভক্তের জন্য ভগবান্ কতবার নিজ প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিয়াছেন; তাঁহার পরিকরগণের আর কথা কি? বড় বাবাজী মহাশয় ভক্তের ভক্তিডোরে বাঁধা পড়িয়া সেদিন সেখানে থাকিতে বাধ্য হইলেন। সঙ্গিগণ ইঁহার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিলেন।

নবদ্বীপ দাদা প্রধান উদ্যোগী হইয়া রান্না আরম্ভ করিলেন। ভক্তটী ভিক্ষায় বাহির হইল। কিছুদূর গিয়া যেমন কোন গৃহস্থের বাড়ীতে দু'টী মুগের ডা'ল ভিক্ষা পাইল, তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়া আসিয়া বলিল, "বাবা, এই মুগের ডা'ল দু'টী রাঁধিতেই হইবে। এইরূপে একটীর পর আর একটী করিয়া বেলা প্রায় আড়াই প্রহরের সময় রন্ধন শেষ হইল। ঠাকুরের ভোগের পর মহাপ্রসাদ পাইতে বসিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন। প্রসাদের এমন অপূর্ব্ব আস্বাদ আর কখনও কেহ পাইয়াছেন কিনা সন্দেহ। সকলেরই হৃদয় আনন্দে পরিপ্লুত হইল। সেদিন সেই অনুরাগী ভক্তটী ইঁহাদিগকে ছাড়িল না।

পরদিন প্রভাতে ইঁহারা যাত্রা করিয়া সাত দিন পর ময়ূরভঞ্জ পৌঁছিলেন। সেখানে পৌঁছিবামাত্রই সহরের সর্ব্বত্র প্রচার হইয়া গেল— "গৌড়দেশ হইতে এক মহাপুরুষ আসিয়াছেন; তিনি পরম প্রেমিক এবং প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়া।" রাজা রামচন্দ্র ভঞ্জের খুল্লতাত বৃন্দাবন ভঞ্জ একথা শুনিবামাত্র লোকদ্বারা ইঁহাদিগকে পরমসমাদরে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরে লইয়া গেলেন এবং অতিশয় যত্নসহকারে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া

ইঁহাদের মহাপ্রসাদ পাইবার ও থাকিবার সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন। মহাপ্রসাদ পাইয়া ইঁহারা সকলে সেখানে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া সন্ধ্যা-আরতির সময় শ্রীমন্দিরে আরতি দেখিতে গেলেন। আরতি শেষ হইলে বড় বাবাজী মহাশয় ও ইঁহার সঙ্গিগণ নিজ ইচ্ছামতই আরতি কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ক্রমে বৃন্দাবন বাবু এবং অনেক সম্ভ্রান্ত রাজকর্ম্মচারিগণ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলেরই কীর্ত্তন শুনিবার ইচ্ছা; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই উড়িষ্যাবাসী। কিরূপ কীর্ত্তন হইবে, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন কি না, তাহাই সকলে ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের অন্তরের ভাব বুঝিতে পারিয়াই যেন বড় বাবাজী মহাশয় নামকীর্ত্তন ধরিলেন, "নিতাই এনেছে নাম, হরিবোল হরিবোল।" সকলেই নামগানে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। বড় বাবাজী মহাশয় এই নাম অবলম্বন করিয়াই নিতাইচাঁদের গুণ গাহিতে লাগিলেন। লোকসকল আনন্দে বিভোর। বালক, বৃদ্ধ, যুবা সকলেই নামকীর্ত্তনে যোগ দিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেছে। রাত্রি প্রায় দেড় প্রহরের সময় এই মহাসংকীর্ত্তন-যজ্ঞের সমাপ্তি হইল। তখন সকলে বসিয়া নানারূপ তত্ত্ব আলোচনা করিতে লাগিলেন। এদিকে শ্রীশ্রী-জগন্নাথদেবের ভোগ লাগিল। বৃন্দাবন বাবু নানারূপ পিঠাপানা প্রভৃতি মহাপ্রসাদ ইঁহাদের জন্য ব্যবস্থা করিলেন। শ্রোতা ভক্তবৃন্দ মহানন্দে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। বড় বাবাজী মহাশয় ও ইঁহার অনুগত সঙ্গিগণ মহাপ্রসাদ পাইয়া যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে বিশ্রাম করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইলে ইঁহারা শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মঙ্গল আরতি দর্শন করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক রওনা হইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় বৃন্দাবন বাবু আসিয়া সেদিন সেখানে থাকিবার জন্য ইঁহাদিগকে বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ইঁহারা তাঁহার এই অনুরোধ

এড়াইতে পারিলেন না। বৃন্দাবন বাবুর সহিত নানাবিধ ভক্তিতত্ত্বের আলোচনায় এবং কীর্ত্তনানন্দে দিবারাত্র কাটিয়া গেল। বড় বাবাজী মহাশয় ও ইঁহার সঙ্গিগণের প্রতি বৃন্দাবন বাবুর মন বড়ই আকৃষ্ট হইল। তিনি ইঁহাদিগকে আর ছাড়িয়া দিতে চাহেন না। তাঁহার বড়ই ইচ্ছা যে, ইঁহারা কিছুদিন ময়ূরভঞ্জে থাকেন। কিন্তু তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল না; কারণ বড় বাবাজী মহাশয় শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণদর্শন-লালসায় বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। তজ্জন্য এ যাত্রায় বৃন্দাবন বাবুর অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না। তৎপর দিবস প্রভাতে কীর্ত্তন করিতে করিতে রওনা হইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে বৃন্দাবন বাবু আসিয়া অতি বিনীতভাবে ইঁহাদিগকে কিছু পথখরচ দিবার জন্য আগ্রহপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। বড় বাবাজী মহাশয় ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া হৃষ্টচিত্তে সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

কিছুদূর যাইয়া ইঁহারা দেখিতে পাইলেন, একটী অল্পবয়স্ক যুবক একটী দ্বিতল গৃহের উন্মুক্ত বারান্দায় চেয়ারে বসিয়া গর্ব্বিতভাবে পদদ্বয় ঝুলাইয়া দিয়াছে। বড় বাবাজী মহাশয় যখন কীর্ত্তন করিতে করিতে সদলবলে এই গৃহের নিকট দিয়া গমন করিতেছিলেন, তখন সেই ধনযৌবনমদোন্মত্ত যুবক ইঁহাদিগকে দেখিয়া অবজ্ঞার ভাবে পদদ্বয় আরও বেশী করিয়া দোলাইতে লাগিল। ইঁহারা কিন্তু কোনরূপ লক্ষ্য না করিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। যুবকের ঐ বৈষ্ণবদ্বেষসূচক অবজ্ঞাভাবটি যেন দর্পহারী নিতাইচাঁদের প্রাণে সহিল না। হঠাৎ চেয়ারখানি উল্টাইয়া যুবকটী একেবারে "পপাত ধরণীতলে।" তখন সেখানে মহা হুলুস্থূল পড়িয়া গেল।

এই যুবকটী নীলগিরির রাজকুমার। নীলগিরির রাজকুমার রাস্তার ধারের দোতলা হইতে পড়িয়া গিয়াছেন, এই কথা চারিদিক রাষ্ট্র হইয়া

পড়িল। শুনিয়া বৃন্দাবন বাবু শশব্যস্তে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, রাজকুমার ধূলিধূসরিতগাত্রে রাস্তার উপর বসিয়া আছেন। তাঁহার চতুর্দ্দিক লোকে লোকারণ্য। বৃন্দাবনবাবু রাজকুমারকে বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "আমি ঐ বারান্দার উপর চেয়ারে বসিয়াছিলাম। কয়েকজন বৈষ্ণব এই পথ দিয়া 'গৌরহরিবোল' বলিয়া নৃত্য করিতে করিতে চলিয়া গেল। উহাদিগকে দেখিয়া এবং উহাদের কীর্ত্তন শুনিয়া আমার চিত্ত চঞ্চল হইল—মাথা ঘুরিতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ আমার চেয়ারখানা কে যেন উল্টাইয়া দিল। আমিও সেইসঙ্গে ভূতলে পতিত হইলাম। পড়িবার সময় "গৌরহরিবোল" ধ্বনিটি, যাহা আমার কর্ণে লাগিয়াছিল, উহা একবার মুখে উচ্চারিত হইল। এই অপূর্ব্ব বাক্য উচ্চারিত হইবামাত্রই দেখিলাম, যেন সেই কীর্ত্তনদলস্থ দীর্ঘাকার পুরুষটী দুইখানি হাত পাতিয়া আমাকে ধরিলেন এবং অতি ধীরে ধীরে আমাকে ভূমিতলে শয়ন করাইয়া দিলেন। তাঁহার অঙ্গস্পর্শে আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইল। আমার কিছু কষ্টবোধ হয় নাই এবং শরীরে কোনই আঘাত লাগে নাই। এখন একবার সেই নামকীর্ত্তনকারী সাধুদিগকে দেখিতে আমার বড়ই ইচ্ছা হইতেছে।" এই অপূর্ব্ব কথা শ্রবণমাত্র বৃন্দাবন বাবু চারপাঁচ জন লোক পাঠাইলেন এবং তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন, "তোমরা শীঘ্র যাও, সেই মহাপুরুষকে আমার বহু বহু প্রণামপূর্ব্বক সবিনয় নিবেদন জানাইয়া কহিবে, যেন আর একটীবার দর্শন দিয়া আমাকে কৃতার্থ করেন।"

এদিকে ইঁহারা কীর্ত্তনরঙ্গে বিভোর হইয়া নাচিতে নাচিতে চলিয়াছেন কাজেই অনেকটা দূর, গিয়া পড়িয়াছেন। লোক কয়টী সবেগে ছুটিয়া গিয়া ইঁহাদের নিকট পৌঁছিলে বড় বাবাজী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "খবর কি বাবা? এমন ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়াছ কেন?" তাহাদের

মধ্যে একজন হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "আজ্ঞে, ছোট্‌রা সাহেব (বৃন্দাবন বাবু) বহু বহু দণ্ডবৎ প্রণাম জানাইয়া একবার আপনার দর্শন মাগিয়াছেন। আপনাকে অবশ্যই একবার যাইতে হইবে।" বড় বাবাজী মহাশয় তাহাদিগকে আশ্বাস দিয়া মধুরস্বরে বলিলেন, "বাবা, বল দেখি, কি হইয়াছে। কি জন্য তিনি আমাকে পুনরায় আহ্বান করিয়াছেন?" তখন লোকটি বলিল, "নীলগিরির রাজাবাবু দোতলার বারান্দা হইতে পড়িয়া গিয়াছেন। তিনি আপনাদিগকে একবার দেখিতে ইচ্ছা করিতেছেন। তাই বৃন্দাবন বাবু আপনাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন।" ইতিমধ্যে আরও দুইটী ভদ্র কর্ম্মচারী ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া বলিলেন, "আপনাদের বিলম্ব দেখিয়া ছোট্‌রা সাহেব আবার আমাদিগকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমাদের রাজা সাহেবও আপনাদের জন্য সেই রাস্তায় বসিয়া অপেক্ষা করিতেছেন।"

বড় বাবাজী মহাশয় ঈষৎ হাসিয়া উচ্চ কণ্ঠে নামকীর্ত্তন ও নৃত্য করিতে করিতে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সেই স্থানে আসিয়া পৌঁছিলেন। দূর হইতে ইহাদিগকে দেখিবামাত্র নীলগিরির অধিপতি সেই ঐশ্বর্য্যমদমত্ত যুবক সসম্ভ্রমে অগ্রসর হইয়া উঁহাদিগকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। ক্রমে সকলেই দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া ইহাদিগকে বসিতে আসন দিলেন। বড় বাবাজী মহাশয়ের ও ইঁহার সঙ্গিগণের চিরাভ্যস্ত রীতি এই যে, যিনিই দণ্ডবৎ প্রণাম করুন না কেন, ইঁহারা তাঁহাকেই প্রতিদণ্ডবৎ করিবেন। অতএব এখানেও ইঁহারা সকলকে প্রতিদণ্ডবৎ করিয়া বিনীতভাবে আসন গ্রহণ করিলেন। নীলগিরির রাজকুমার করযোড়ে দাঁড়াইয়া আছেন দেখিয়া বড় বাবাজী মহাশয় হাতে ধরিয়া তাঁহাকে কাছে বসাইলেন। তখন বৃন্দাবন বাবু

আমূল বৃত্তান্ত উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "বাবা, আমার বিশ্বাস— আপনাদের নিকট এই নবীন রাজকুমারের কোনরূপ অপরাধ হইয়াছিল। তাই প্রভু ইহাকে গুরুতর শাস্তি দিয়াছেন। কিন্তু আপনারা ক্ষমাশীল পরমদয়াল এবং উদারচেতা বৈষ্ণব। আপনাদের ক্ষমাগুণে যুবকের প্রাণহানি হইতে পারে নাই।"

বড় বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "নিতাই, নিতাই! বাবা, এরূপ কথা বলিয়া আমাদিগকে তিরস্কার করিবেন না; কারণ আমরা যাঁহার দাসানুদাস, সেই অক্রোধপরমানন্দ, প্রেমদাতা নিতাইচাঁদ স্বয়ং মা'র খাইয়াও প্রেমদান করিয়াছেন। তিনি কাহারও অপরাধ গ্রহণ করিতে জানেন না। নিতাইচাঁদের প্রেমরাজ্যে অপরাধ বলিয়া কোন বস্তু নাই। আপনারা ও কথা মুখে আনিবেন না। তিনি যদি জীবের অপরাধ লইবেন, তবে জীব উদ্ধার হইবে কি করিয়া? তিনি অপরাধীকে আদর পূর্ব্বক কোলে ধরিয়া প্রেমদান করেন।" এই কথা বলিতে বলিতে বড় বাবাজী মহাশয়ের চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া গেল। তখন সকলে একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন, "ঠিক কথা, ঠিক কথা! আমাদেরই ভুল হইয়াছে।"

নীলগিরির রাজকুমার এতক্ষণ অঝোরনয়নে ঝুরিতেছিলেন। বড় বাবাজী মহাশয় তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গনদানে আশ্বস্ত করতঃ নিকটে টানিয়া লইলেন। রাজকুমার অপরাধীর ন্যায় অপ্রস্তুতভাবে অধোমুখে বসিয়া রহিলেন। আহা মরি কি অপরূপ দৃশ্য! কি মধুময় মিলন!

"সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥"

ক্ষণকাল পূর্ব্বে যে ব্যক্তি ঔদ্ধত্যের চূড়ামণি, ঐশ্বর্য্যমদবিমুগ্ধ ও আত্মাভিমানপূর্ণ ছিল, ঐ দেখ, মহতের কৃপায় সেই ব্যক্তি এক্ষণে ধূলিধূসরিতদেহ, অভিমানশূন্য, মূর্ত্তিমান্ দৈন্যস্বরূপ বলিয়া বোধ হইতেছে ন।

যে ব্যক্তি বৈষ্ণব দেখিলে নাসিকা কুঞ্চিত করিত, আজ সেই ব্যক্তি বড় বাবাজী মহাশয়ের উপদেশপূর্ণ কথাশ্রবণে বৈষ্ণবচরণে লুণ্ঠিত হইয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেছে। মহতের কৃপাই ইহার মূল। সাধুসঙ্গই ইহার প্রকৃত কারণ।

এইভাবে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইলে বড় বাবাজী মহাশয় সকলের অনুরোধে অগত্যা সেদিন সেখানে থাকিতে বাধ্য হইলেন। সকলেরই মনে পূর্ব্ববৎ আনন্দ-উৎস ছুটিল। ভক্তপ্রবর বৃন্দাবন বাবু বলিলেন, "বাবা, আমার জগন্নাথ আপনাকে ছাড়িতে চান না; আপনি যাইবার জন্য ব্যস্ত হইলে কি হইবে?" বড় বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "বাবা, আমার ইচ্ছায় ত কিছুই হইবে না। ইচ্ছাময় প্রভু যখন যে ভাবে নাচাইবেন, ইচ্ছায় হউক, আর অনিচ্ছায় হউক, আমাদের সেই ভাবেই নাচিতে হইবে। আপনার জগন্নাথদেবের নিকট প্রার্থনা করুন, তিনি কৃপা করিয়া পুনরায় আকর্ষণ করিলেই আসিব, রাখিলেই থাকিব।" এইরূপ নানাবিধ ভক্তিপ্রসঙ্গীয় কথাবার্ত্তায় দিবারাত্র পরমানন্দে কাটিয়া গেল।

পরদিবস প্রভাতে বড় বাবাজী মহাশয় সকলের নিকট বিদায় লইয়া রওনা হইবেন, এই সময়ে বৃন্দাবন বাবু বলিলেন, "বাবা, আমাদের রাজাবাবুর বিশেষ অনুরোধ যে, আপনারা অনুগ্রহ করিয়া অন্তত একখানি করিয়া কম্বল গ্রহণ করেন।" বড় বাবাজী মহাশয় করযোড়ে বলিলেন, "বাবা, আপনারা হয় ত মনে করিতে পারেন যে, বৈরাগ্যবশতঃ আপনাদের নিকট আমি কিছু গ্রহণ করিতেছি না; কিন্তু তাহা নহে। আমার লোভ যথেষ্ট আছে। কিন্তু বহিতে পারিব না বলিয়াই গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতেছি।" এইরূপ নানাপ্রকার বিনয়বাক্যে তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবা বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। ইঁহাদের বিদায়কালে বৃন্দাবন বাবু প্রভৃতির মুখের ভাব দেখিয়া মনে হইল, যেন

তাঁহারা আজ একজন চিরপরিচিত পরমোপকারী বন্ধুহারা হইলেন। ময়ূরভঞ্জনিবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই আজ এই বাবাজীগণের অদ্ভুত প্রেমভক্তি সম্বন্ধে আলোচনা লইয়া ব্যস্ত এবং সকলেরই মুখে আজ কেবল ইহাদিগের কথা। কেহ বলিতেছেন, "বড় বাবাজী মহাশয় নিশ্চয়ই সিদ্ধ মহাপুরুষ।" কেহ বলিতেছেন, "ইহারা সকলেই শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর বিশেষ অন্তরঙ্গ ভক্ত।" কেহ বা বলিতেছেন, "আমার বিশ্বাস, ইনি সাক্ষাৎ নিত্যানন্দ প্রভু" ইত্যাদি যাঁহার যেরূপ ধারণা বলিতে লাগিলে।

গোপীবল্লভপুর আগমন

বড় বাবাজী মহাশয় সগণে কীর্ত্তন করিতে করিতে জগন্নাথ-সড়ক ধরিয়া দাঁতন আসিলেন। তথায় একরাত্রি বাস করিয়া পুনরায় পথ চলিতে লাগিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু নীলাচল হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে যে ভাবে গৌড়দেশে আগমন করিয়াছিলেন, সেইভাবে বিভাবিত হইয়া বড় বাবাজী মহাশয় বহু লোক সঙ্গে গৌড়ে আগমন করিতেছেন। ক্রমে ইহারা গোপীবল্লভপুরে আসিয়া পৌঁছিলেন। তথায় শ্রীগোবিন্দদেব দর্শন করতঃ স্তুতি ও প্রণতিপূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। একটী ভদ্রলোক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, আপনাদের কোথায় থাকা হয়?" বড় বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "বাবা, আমাদের বাসস্থানের কোন নির্দ্দিষ্টতা নাই। প্রভু যেদিন যেখানে রাখেন, সেদিন সেইখানেই থাকি। সম্প্রতি গৌড়দেশে যাইবার জন্য প্রভুর আদেশ হইয়াছে। একবার

শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর স্থাপিত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ জীউকে দর্শন করিতে বড়ই ইচ্ছা হইল, তাই বুঝি রাধারাণী কৃপাপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া এই স্থানে আনিয়াছেন।"

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এই সময় অতিবৃদ্ধ একটী ভক্ত সেখানে আসিয়া ভক্তি-গদগদকণ্ঠে বলিলেন, "এই যে, বাঞ্ছাকল্পতরু আমার মনোবাসনা পূর্ণ করিয়াছেন। আমি মনে করিতেছিলাম যে, আজ আমার শিক্ষাগুরুর অপ্রকট দিন; বেলা প্রায় দেড় প্রহর অতীত হইতে চলিল; কিন্তু এখন পর্য্যন্ত একমূর্ত্তি বৈষ্ণবও শুভাগমন করিলেন না। তবে কি গোবিন্দজী আমার আশা পূরাইবেন না? বাঞ্ছাকল্পতরু গুরুদেবের কৃপায় কোন বাসনাই অপূর্ণ থাকে না।" এই বলিয়া বৃদ্ধ সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক করযোড়ে অতি বিনীতভাবে ইঁহাদিগকে বলিলেন, "বাবা, আপনারা স্নানাদি করুন, বেলা অধিক হইয়াছে।" বৃদ্ধের করুণ বচনে বড় বাবাজী মহাশয় একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "বাবা, স্নান করিব বৈ কি! প্রভুর কৃপা অপার। আমাদের সৌভাগ্যের পরিসীমা নাই। নবদ্বীপ, চল।" এই বলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। সকলে স্নানাহ্নিকাদি ক্রিয়া সমাপনপূর্ব্বক আসিতে আসিতেই গোবিন্দ জীউর ভোগ হইয়া গেল। ঐ বৃদ্ধ ভক্তটীই সে দিবস ঠাকুরের ভোগের বিশেষরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি ব্যস্তভাবে সর্ব্বাগ্রে ইঁহাদের মহাপ্রসাদ পাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ইঁহারাও পরমানন্দে মহাপ্রসাদ পাইয়া বিশ্রাম করিলেন।

অপরাহ্নসময়ে সেস্থানে বহু লোকের সমাগম হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া বড় বাবাজী মহাশয় সঙ্গিগণকে বলিলেন, "দেখ, এস্থানে জনতা অধিক হইবে, চল, আমরা একটু নির্জ্জন স্থানে যাইয়া বসি।" তাহাই হইল, সকলে নিকটস্থ একটী গাছতলায় গিয়া বসিলেন। বনের একপ্রান্তে

সুগন্ধি ফুল ফুটিলে, উহার সৌরভ যেমন দশদিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং ভ্রমরগণও মধুলোভে উধাও হইয়া সেইদিকে ছুটিয়া যায়, সেইরূপ আজ ভক্ত-ভ্রমরগণ বড় বাবাজী মহাশয়ের অপূর্ব্ব প্রেমভক্তি ও যশঃসৌরভে আকৃষ্ট হইয়া সেই বৃক্ষতলে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। সুতরাং মহাপুরুষ যে উদ্দেশ্যে নির্জ্জনস্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা বিফল হইল। ক্রমে তথায় বহুলোক আসিয়া জুটিতে লাগিল। আজ বড় বাবাজী মহাশয় প্রতিষ্ঠার ভয়ে নির্জ্জন বৃক্ষমূলে আশ্রয় লইলেও প্রতিষ্ঠা তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল।

"প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত।
যে না বাঞ্ছে তার হয় বিধাতানিৰ্ম্মিত॥"

ইনি প্রেমানন্দে বসিয়া আছেন। আগন্তুকমাত্রেই ইঁহার নিকট বিশেষ আদর পাইতেছে। সকলেই ইঁহার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। কেহ কেহ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছে। একজন ভক্ত বলিলেন, "বাবা, এখানকার শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের বিবরণ এবং শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর পুণ্যচরিত-কাহিনী একবার আপনার মুখে শুনিবার জন্য আমাদের বড়ই অভিলাষ হইয়াছে; আপনি কৃপা করিয়া আমাদের বাসনা পূর্ণ করিলে কৃতকৃতার্থ হইব। আমি অনেকের নিকট এ বিষয় প্রশ্ন করিয়াছি; কিন্তু প্রকৃত উত্তর পাই নাই।" বড় বাবাজী মহাশয় আনন্দিতমনে বলিলেন, "বাবা, এ ত উত্তম কথা! ভক্তচরিত-কাহিনী শ্রবণ-কীর্ত্তনই আত্ম শোধনের একমাত্র উপায়। শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর গুরুনিষ্ঠা এবং গুরুবাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাস জগতে অতুলনীয়।

এই মহাপুরুষ সদ্গোপকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার জন্মস্থান ধারেন্দাবাহাদুরপুর; ইঁহার সৌভাগ্যবান্ পিতার নাম শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল। কালক্রমে ইঁহার পিতা ধারেন্দাবাহাদুরপুর হইতে দণ্ডেশ্বরে আসিয়া বসতি

করেন। শ্যামানন্দ প্রভুর অগ্রজাত কয়েকটী ভ্রাতা ও ভগিনী অকালে কালগ্রাসে পতিত হওয়ায়, তাঁহার মাতাপিতা ও গ্রামবাসী সকলেই উঁহাকে 'দুঃখী' বলিয়া ডাকিতেন। দুখী অল্প বয়সেই বিদ্যাশিক্ষায় মনোনিবেশ করিল। তৎকালে সংস্কৃতশিক্ষাই জ্ঞানলাভের সোপান ছিল। দুখীর তীক্ষবুদ্ধি ও অসাধারণ মেধাশক্তির পরিচয় পাইয়া উঁহার পিতা উঁহাকে ব্যাকরণ পড়িতে দিলেন। সেও অতি অল্পদিনের মধ্যেই নিজ তীক্ষবুদ্ধি-প্রভাবে ব্যাকরণে উত্তম ব্যুৎপত্তি লাভ করায় সকলেরই প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল এবং সকলেই তাহার প্রশংসা করিতে লাগিল। কিন্তু দুখীর বাল্য-কাল হইতেই সংসারে কোন আসক্তি ছিল না। সে সাংসারিক কার্য্যে একেবারেই মন দিত না। ইহা তাহার মাতাপিতার ভাল লাগিত না। দুখী দিবারাত্র কেবল নিতাইগৌরাঙ্গের গুণগানে মত্ত থাকিত। লেখা পড়ায়ও তাহার বেশ মনোযোগ ছিল। কিন্তু তাহার প্রাণে সর্ব্বদা যেন কি একটা অশান্তি বোধ হইত। একথা সে কাহারও কাছে প্রকাশ করিয়া বলিত না। তাহার মাতাপিতা পুত্রের ভাবগতিক দেখিয়া বিশেষ চিন্তিত হইলেন।

একদিন দুখীর পিতা পুত্রকে সাদরে নিকটে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা দুখী! তোমার মন সর্ব্বদা এমন উচাটন কেন বল দেখি!" দুখী অবনতমস্তকে বলিল, "বাবা, আমার সর্ব্বদাই মনে হয়, দীক্ষা গ্রহণ করি। অদীক্ষিত জীবন পশুজীবন তুল্য। অদীক্ষিত ব্যক্তির অন্নজল অস্পৃশ্য। অদীক্ষিত অবস্থায় মৃত্যু হইলে অপমৃত্যু হয়। প্রভাতে উঠিয়া অদীক্ষিত ব্যক্তির মুখ দেখিলে সেদিন বিফলে যায়। অদীক্ষিত ব্যক্তির মুখ দেখিয়া যাত্রা করিলে কার্য্যসিদ্ধি হয় না। অদীক্ষিত লোকের যখন এতই দুরবস্থা, তখন বৃথা সময় নষ্ট করিয়া ফল কি? এইজন্য সর্ব্বদাই আমার মন অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছে। আপনারা যদি কৃপা

করিয়া আদেশ করেন, তবে আমি কৃষ্ণমন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করতঃ জীবন ধন্য করি।" এই বলিয়া দুখী পিতার চরণ ধারণপূর্ব্বক কাঁদিতে লাগিল।

পিতা তখন পুত্রকে ক্রোড়ে তুলিয়া আশ্বাসবাক্যে বলিতে লাগিলেন, "বাবা, ইহাতে আমার কোন আপত্তি নাই। এ ত পরম সৌভাগ্যের কথা। তোমার যাঁহার নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিবার ইচ্ছা হয়, অবিলম্বে গ্রহণ করিতে পার। শুভ কার্য্যে বহু বিঘ্ন। তুমি যাহা বলিলে, সকলই সত্য। অদীক্ষিত জীবন পশুজীবন তুল্য এবং নিশ্চয়ই ঘৃণিত।" এই কথা শুনিয়া দুখী আনন্দভরে বলিল, "আমি অম্বিকানগরবাসী শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিতের প্রিয়শিষ্য শ্রীহৃদয়চৈতন্য দেবকে মনে মনে গুরুপদে বরণ করিয়াছি। যদি আপনারা কৃপা করিয়া অনুমতি দেন, তবে আমার একান্ত বাসনা—একবার শ্রীপাট অম্বিকা কালনায় গমন করিয়া শ্রীগুরুচরণ-দর্শনাভিলাষ পূর্ণ করি।"

অতি দূরদেশ বলিয়া তাহার জননী প্রথমে একটু আপত্তি করিলেন। কিন্তু নবানুরাগীর প্রাণ কোন বাধাই মানিল না। দুখী তাহার মাতাকে বলিল, "কোন প্রকার ভয়ের কারণ নাই। আমি গঙ্গাস্নানের যাত্রিক-দিগের সহিত একত্রে যাইব; সর্ব্বদাই এখান হইতে বহুলোক যাতায়াত করিতেছে।" এই বলিয়া দুখী মাতাপিতার পদধূলি গ্রহণপূর্ব্বক রওনা হইয়া কয়েকদিনের মধ্যে শ্রীপাট অম্বিকা কালনায় শ্রীহৃদয়চৈতন্য ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে তিনি ইহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বলিল, "আমার নাম দুখী—প্রকৃতই আমি দুঃখী;" তাহার 'দুখী' নাম শুনিয়া হৃদয়চৈতন্য ঠাকুর বলিলেন, "আজ হইতে তোমার নাম রহিল, "দুখী কৃষ্ণদাস।" গুরু-আজ্ঞায় সেইদিন হইতেই তাহার 'দুখী কৃষ্ণদাস' নাম প্রচার হইল। দুখী কৃষ্ণদাসের কাতর প্রার্থনায় শুভদিনে তাহার দীক্ষাকার্য্য সুসম্পন্ন হইল। দুখী কৃষ্ণদাস

গুরুদেবের সেবাপরিচর্য্যাই সর্ব্বোত্তম ভজন সাধন মনে করিয়া দিবানিশি গুরুসেবায় রত থাকিত। দীক্ষাগ্রহণের পর অতি অল্পকালমধ্যেই দুখী কৃষ্ণদাস শ্রীগুরুদেবের এবং অন্য সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিতে লাগিল। গুরুদেবও তাহাকে নিজ সন্তানের ন্যায় স্নেহের চোখে দেখিতে লাগিলেন। তিনি একদিন দুখীকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবার জন্য গঙ্গাজল আনিতে আদেশ করিলেন। সেইদিন হইতেই আশ্রমে যত গঙ্গাজলের প্রয়োজন, দুখী কৃষ্ণদাস প্রফুল্লচিত্তে একাকীই সমস্ত বহন করিতে লাগিল।

একদিন দুখী কৃষ্ণদাস গুরুদেবকে দণ্ডবৎ করিলে তিনি উহার মস্তকে হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিবার সময় দেখিতে পাইলেন যে, উহার মস্তকে ক্ষত হইয়া গিয়াছে। তখন তিনি অতি বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা কৃষ্ণদাস, তোমার মাথায় কি হইয়াছে?" দুখী কৃষ্ণদাস অতি সঙ্কুচিতভাবে উত্তর করিল, "আজ্ঞে, ও কিছুই নয়, আপনার কৃপায় শীঘ্র ভাল হইয়া যাইবে।" হৃদয়চৈতন্যঠাকুর বুঝিলেন যে, মহাপ্রভুর গঙ্গাজল বহন করিয়াই তাঁহার প্রিয় শিষ্যের মস্তকে এইরূপ ক্ষত হইয়াছে। তথাপি সে নিষ্ঠাবশতঃ সেবা ছাড়ে নাই। প্রিয়শিষ্যের সেবানিষ্ঠা দেখিয়া তিনি অত্যন্ত সুখী হইলেন এবং তাহাকে প্রেমালিঙ্গনদানে কৃতার্থ করিয়া বলিলেন, "বাবা, তুমি শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া শ্রীজীবগোস্বামিপাদের নিকট ভক্তিগ্রন্থ অধ্যয়ন কর।" দুখী কৃষ্ণদাস গুরুসেবা ত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবন যাইতে প্রথমে একটু আপত্তি করায় গুরুদেব বলিলেন, "বাবা, সেবা অর্থ সুখ দেওয়া। আমার যাহাতে সুখ হইবে, তোমার তাহাই করা উচিত। তুমি শ্রীবৃন্দাবন গেলে আমি সুখী হইব; অতএব তোমার যাওয়াই কর্ত্তব্য।"

গুরু-আজ্ঞা শিরোধারণ-পূর্ব্বক গুরুভক্তি-পরায়ণ দুখী কৃষ্ণদাস শ্রীধাম নবদ্বীপ দর্শন করিয়া শ্রীবৃন্দাবন গমন করিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া

শ্রীজীবগোস্বামিপাদ, শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভু এবং শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় প্রভৃতির সহিত মিলিত হইলেন। হৃদয়চৈতন্য ঠাকুর তাঁহার প্রিয় শিষ্য দুখী কৃষ্ণদাসকে ভক্তিশাস্ত্র শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীপাদ শ্রীজীবগোস্বামীকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। দুখী কৃষ্ণদাস সেই পত্রখানি শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর হস্তে প্রদান করিল। তিনি পত্রপাঠে পরমানন্দিত হইয়া উঁহাকে সযত্নে ভক্তিশাস্ত্র উপদেশ দিতে লাগিলেন। দুখী কৃষ্ণদাসও অতি অল্পকালের মধ্যে ভক্তিশাস্ত্রে বিশেষ অধিকার লাভ করিলেন। সেবাই ভক্তিশাস্ত্রের সার সিদ্ধান্ত, ইহাই বুঝিয়া তিনি শ্রীনিকুঞ্জ মন্দিরের ঝাড়ুদারী কার্য্যে ব্রতী হইলেন। সেবানিষ্ঠ দুখী কৃষ্ণদাসের মনে নিকুঞ্জবিহারিণী শ্রীশ্রীরাধারাণীর শ্রীচরণ দর্শনলাভের জন্য উৎকণ্ঠা দিন দিন বাড়িতে লাগিল ক্রমে সখীমঞ্জরী-পরিবৃত শ্রীশ্রীরাধামাধবের নিত্য নিকুঞ্জবিহার তাঁহার ভাগ্যে একদিন না একদিন দর্শনলাভ ঘটিবে, এই বিশ্বাসে বুক বাঁধিয়া তিনি মনোনিবেশপূর্ব্বক নিকুঞ্জসেবা করিতে লাগিলেন। "বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহুদূর" এই মহাজন-বাক্য দুখী কৃষ্ণদাসের পক্ষে আজ সার্থক হইল।

একদিন রাত্রিশেষে তিনি নিকুঞ্জ মন্দিরের বাহিরে ঝাঁট দিতে দিতে দেখিতে পাইলেন, পথিপার্শ্বে একগাছি স্বর্ণনূপুর শোভা পাইতেছে। ইহা দেখিয়া তিনি প্রেমানন্দে অধীর হইলেন। তাঁহার অঙ্গে অশ্রু, কম্প, পুলকাদির উদ্গম হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ ভক্তিসহকারে সেই অপূর্ব্ব, অপ্রাকৃত স্বর্ণনূপুরগাছটী হস্তে তুলিয়া প্রেমানন্দে একবার মস্তকে, একবার বক্ষে ধারণপূর্ব্বক প্রেমাশ্রুজলে স্নান করাইতে লাগিলেন। এক একবার প্রেমে অধীর হইয়া সেই অপূর্ব্ব নূপুরগাছটী আঘ্রাণ

করতঃ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন ;—"আহা মরি মরি! দয়াময়ীর কি অপার করুণা! বৃন্দাবন-বিলাসিনি করুণাময়ি রাধে! এ অধম অভাজনের প্রতি তোমার যদি এতই করুণা হইল, তবে একবার দর্শনদানে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া আমাকে কৃতকৃতার্থ কর।" এইরূপ কাতরোক্তিসহকারে নিকুঞ্জেশ্বরী রাধারাণীকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন।

এদিকে শ্রীরাধিকাজিউ নিকুঞ্জ বন হইতে কিছুদুর যাইতে না যাইতেই ললিতাজীকে বলিলেন, "রী সখী! মেরি নূপুর কাঁহা গির্ গয়া হ্যায়, তুতো ঢুঁড়্লে।" তখন ললিতাজী ব্যস্তভাবে একটী একাদশবর্ষীয়া পরমাসুন্দরী বালিকার বেশে প্রিয়সখীর নূপুর খুঁজিতে খুঁজিতে নিকুঞ্জ-মন্দিরের বাহিরে দুখী কৃষ্ণদাসকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রে ভাইয়া! একঠো সোণেকা নূপুর তু ক্যা পায়া হ্যায়?" দুখী কৃষ্ণদাস আনন্দাশ্রু-বিগলিত-নয়নে ললিতাজীর প্রতি চাহিয়া কহিলেন, "হাঁ, নূপুর আমি পাইয়াছি। উহা কি তোমার?"

ললিতাজী। নূপুর মেরি নেহি; মেরি বহিনকা হ্যায়।

দুখী কৃষ্ণদাস। "তবে তিনি আসিলেন না কেন?"

ললিতাজী। মেরি বহিন রাজাকো লেড়কী হ্যায়। অব "আনে নেহি শকেংগী।

দুখী কৃষ্ণদাস। তিনি যদি নাই আসিবেন, তবে নূপুর যে তাঁহার তাহা আমি কিরূপে জানিব? তুমি যদি মিথ্যা কথা বলিয়া লইয়া যাও। অতএব যাঁহার নূপুর তাঁহাকে এখানে লইয়া আইস। তাঁহার চরণের অপর নূপুরগাছটীর সঙ্গে মিলাইয়া আমি নিজহস্তে চরণে পরাইয়া দিব।

ললিতাজী। মেরে সো মে কভি ঝুট্বাত নেহি বোলেঙ্গী, বো বড়া ঘরকা বহু হ্যায়, উন্‌কা শাস্ গারি দেঙ্গী। তু মেরি হাত্‌মে দেই দে।

দুখী কৃষ্ণদাস কিছুতেই তাঁহার কথা শুনিল না দেখিয়া ললিতাজী বুঝিলেন, এ নিশ্চয়ই প্যারীজীর ভক্ত। নূপুর হারানছলে ইহাকে কৃপা করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। এই ভাবিয়া নিজ সমবয়স্কা বালিকাবেশে প্যারীজীকে লইয়া পুনরায় সেখানে আসিলেন। কারণ তখন প্রায় রাত্রি শেষ হইয়াছে। প্রাতঃকাল হইলেই অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে। প্যারীজী ললিতাজীর সঙ্গে আসিয়া দুখী কৃষ্ণদাসের নিকট নূপুরগাছটী ফেরত চাহিলে, তিনি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন, "তোমরা রাত্রিতে এই নির্জ্জন স্থানে আসিয়াছিলে কেন?" প্যারীজী ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "বহুত ক্যা বোলেঙ্গী? য়ে তো মেরি নিকুঞ্জ মন্দিল্ হায়। তুত সব সমুঝলিও, অব হট মাত করো। ফজর হো যায়গা, নূপুর দেই দে।" বলিয়া প্যারীজী যেমন ভঙ্গি করিয়া হাত পাতিলেন, অমনি দুখী কৃষ্ণদাস তাঁহার শ্রীহস্তে নূপুর দিয়া বলিলেন, "করুণাময়ি প্যারি! যদি এই অধম পতিতের প্রতি এতই কৃপা করিলে, তবে একবার নিজ স্বরূপে দর্শন দিয়া কৃতকৃতার্থ কর" এই বলিতে বলিতে কাঁদিয়া আকুল হইলেন। প্যারীজী হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "তু য়ে আখ্‌মে ক্যা মেরি স্বরূপ দর্শন করনে শকেগো?" তখন শ্রীললিতাজী কৃপাপরবশ হইয়া কহিলেন, "রী প্যারী! যব কৃপা হো গই, তব থোড়ে শক্তি ভি দেনা চাহিয়ে।" তখন প্যারীজী কহিলেন, "যো তেরি খুসি।" এই বলিয়া বিদ্যুল্লতার ন্যায় নিজস্বরূপ দেখাইয়া কহিলেন, "তোমার গুরুপাদপদ্মনিষ্ঠা, গুরুবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস এবং একনিষ্ঠ সেবার ফল-স্বরূপ আমার এই নূপুরচিহ্নিত তিলক তোমার ললাটদেশে বর্ত্তমান রহিল। জগদ্বাসী জীবগণ দেখুক এবং বুঝুক, শ্রীগুরুকৃপায় কি না হইতে পারে।" এই বলিয়া প্যারীজী রজোলিপ্ত নূপুরগাছটী দুখী কৃষ্ণদাসের ললাটে স্বহস্তে স্পর্শ করাইয়া দিলেন। বৃন্দাবনবিলাসিনী প্যারীজীর

শ্রীঅঙ্গস্পর্শে দুখী কৃষ্ণদাস প্রেমানন্দে অচেতন হইয়া পড়িলেন। ইত্যবসরে শ্রীমতী সগণে অন্তর্হিতা হইলেন।

কিছুক্ষণ পরে দুখী কৃষ্ণদাস চৈতন্যলাভ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট গমনপূর্ব্বক এই ঘটনার আমূল বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। গোস্বামিপাদ বলিলেন, "যখন তুমি রাধিকাজীর কৃপালাভ করিয়াছ, তখন নিশ্চয়ই তুমি শ্যামসুন্দরের প্রিয়পাত্র। অতএব আজ হইতে তোমার নাম রহিল 'শ্যামানন্দ দাস।' আর শ্রীমতীর কৃপাদত্ত নূপুরাকারেই তোমার তিলক হইবে।" দুখী কৃষ্ণদাস ভক্তিভরে গোস্বামিপাদকে প্রণাম করিয়া পুনরায় নিকুঞ্জসেবাকার্য্যে গমন করিলেন।

অতি অল্পদিনের মধ্যেই শ্যামানন্দের কথা শ্রীবৃন্দাবনে প্রচার হইয়া পড়িল। শ্রীজীব গোস্বামীর আনুগত্য, তিলক পরিবর্ত্তন প্রভৃতি সকলেই স্বচক্ষে দেখিলেন। কোনও এক ব্যক্তি অম্বিকায় যাইয়া হৃদয়চৈতন্য প্রভুকে বলিল, "দুখী কৃষ্ণদাস আপনাকে ত্যাগ করিয়া অপর গুরু করিয়াছে। এমন কি, তাহার নাম ও তিলক পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন হইয়াছে।" ইহা শুনিয়া হৃদয়চৈতন্য প্রভু অতিশয় বিস্মিত হইয়া শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর নিকট একখানা পত্র লিখিলেন। তাহাতে নিজ মনোভাব কিছুই ব্যক্ত না করিয়া এইমাত্র লিখিলেন, "দুখী কৃষ্ণদাসকে একবার অম্বিকায় পাঠাইয়া দিবেন।" পত্র পাইয়া শ্রীজীব গোস্বামিপাদ শ্যামানন্দকে অম্বিকায় যাইতে আদেশ করিলেন। শ্যামানন্দও গোস্বামিপাদ এবং শ্রীবৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীগুরুদেবের চরণদর্শনমানসে অম্বিকায় রওনা হইলেন।

যথাসময়ে শ্যামানন্দ অম্বিকায় পৌঁছিয়া শ্রীগুরুদেবের চরণ বন্দনা করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমায় এরূপ তিলক কে দিল?" শ্যামানন্দ করযোড়ে উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে আপনিই দিয়াছেন।"

গুরুদেব। তোমার নাম পরিবর্ত্তন কে করিল ?

শ্যামানন্দ। প্রভু, আপনিই করিয়াছেন। এ জগতে আপনি ভিন্ন আমাকে এত আদর আর কে করিবে ?

শ্যামানন্দ যথার্থ কথাই বলিলেন; কিন্তু আমাদের মত অনমুভবী লোকে হয়ত তাঁহার এই কথাটী কপটতা বলিয়া মনে করিতে পারে। কারণ শ্যামানন্দের তিলক ও নামপরিবর্ত্তন তাঁহার গুরুদেবের অসাক্ষাতে হইয়াছে। শ্রীমতী রাধারাণী স্বয়ং তাঁহাকে কৃপা করিয়াছেন। কিন্তু শ্যামানন্দ একমাত্র গুরুভিন্ন আর কাহাকেও জানেন না। তাঁহার গুরুদেব সক্রোধে বলিলেন, "ও সব ভণ্ডামি আমি শুনিতে চাই না। আমি সকলই শুনিয়াছি। তুই আমাকে প্রতারণা করিতেছিস্। আমিই যদি তোকে নাম ও তিলক পরিবর্ত্তন করিতে বলিয়া থাকি, তবে আমিই পুনরায় তোকে আজ্ঞা করিতেছি, এই তিলক পরিবর্ত্তন করিয়া পূর্ব্ববৎ তিলক কর্ এবং ঐ নাম ত্যাগ কর্।" শ্যামানন্দ করযোড়ে নিবেদন করিলেন, "প্রভো, কৃপা করিয়া আপনি দিয়াছেন, আপনিই মুছিয়া দিন।" এই কথা বলিবামাত্র হৃদয়চৈতন্য ঠাকুর নিজের গামছা দিয়া শিষ্যের ললাটস্থিত রাধারাণীর নূপুরচিহ্ন তিলক মুছিয়া দিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিলক মুছিয়া যাওয়া দূরে থাকুক, তিনি যতই চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তিলক ততই উজ্জ্বল হইতে লাগিল। বহু চেষ্টা করিয়াও যখন এই কার্য্যে সফলমনোরথ হইতে পারিলেন না, তখন তিনি কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করিয়া বুঝিলেন যে, শ্যামানন্দ নিশ্চয়ই ভগবৎকৃপায় ও গুরুভক্তির বলে তাঁহাকে জয় করিয়াছে। তখন শ্যামানন্দকে প্রেমালিঙ্গন করিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে গদগদকণ্ঠে বলিলেন, "বাবা শ্যামানন্দ! তোমার গুরুভক্তি এবং সেবা-নিষ্ঠা যথার্থ ই অকপট। আমি আজ তোমার নিকট হইতে বহু শিক্ষা

লাভ করিয়া ধন্য হইলাম।" ক্রমে তিনি শিষ্যের নিকট যথাযথ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন। গুরুশিষ্য উভয়েই প্রেমাবেশে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে উভয়েই চৈতন্য লাভ করতঃ কাঁদিয়া আকুল হইলেন। হৃদয়চৈতন্য ঠাকুর শিষ্যের-প্রতি সদয় হইয়া তাঁহাকে শ্রীবৃন্দাবন হইতে আনীত এই শ্রীরাধাগোবিন্দ বিগ্রহের চরণসেবায় নিযুক্ত করিয়া দিলেন। শ্যামানন্দ প্রভু এইস্থানে সেই শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করিয়া সেবা করিতে লাগিলেন। অদ্যাবধি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সেই সেবাই চলিয়া আসিতেছে।

বড় বাবাজী মহাশয়ের মুখে শ্রীগোবিন্দদেবের কাহিনী ও শ্যামানন্দ প্রভুর পুণ্য চরিতকথা শুনিয়া সেই ভক্তটী পরমানন্দিত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্রীরাধাগোবিন্দজিউর আরতির সময় উপস্থিত হইলে শ্রীমন্দিরে বহু লোকসমাগম হইতে লাগিল। বড় বাবাজী মহাশয়ও সদলবলে আরতি দর্শন করিয়া নামকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। রাত্রি প্রায় দেড়প্রহর পর্য্যন্ত কীর্ত্তন হইল। তৎপরে ঠাকুরের ভোগ হইলে ইঁহারা সকলেই পরমানন্দে প্রসাদ পাইয়া বিশ্রাম করিলেন।

পরদিন প্রভাতে ইঁহারা প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক সেখান হইতে গমনোদ্যত হইলে গ্রামবাসী সকলেই ইঁহাদিগকে সেখানে অন্ততঃ আর একদিন থাকিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ইঁহারা যথায়ই যান, তথাকার লোক ইঁহাদিগকে ছাড়িতে চাহে না। ক্ষণমাত্র যিনি এই সকল সাধুপুরুষদিগের সঙ্গসুখ লাভ করিয়াছেন বা করিতেছেন, তিনিই আপনাকে ধন্য মানিতেছেন। বড় বাবাজী মহাশয় তাঁহাদিগকে সুমিষ্ট বাক্যে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ইঁহারা যথাসময়ে মেদিনীপুর হইয়া ক্রমে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলেন। বড় বাবাজী মহাশয় জগন্নাথঘাটে বসিয়া বিশ্রাম করিতে

করিতে অনুগত সঙ্গিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমরা এখানে একটু অপেক্ষা কর। আমি স্নান করিয়া উঠি; পরে তোমরা স্নান করিবে।" সঙ্গিগণ তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। বাবাজী মহাশয় গঙ্গা-গর্ভে নামিবার পূর্ব্বে ভক্তিভরে জল স্পর্শ করিয়া করযোড়ে মায়ের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "মা কৃপাময়ি জাহ্নবি! পতিতপাবনি গঙ্গে! বহুদিন তোর অধম সন্তানকে চরণদর্শনে বঞ্চিত রাখিয়াছিলি। আজ তোর স্নেহমাখা কোল পাইয়া পরম শান্তিলাভ করিলাম। কৃপাময়ি মা আমার, কৃপা করিয়া এই করিস্, যেন অন্তিমকালে তোর কোলে স্থান পাই, মা!" এইরূপে মায়ের চরণে কত যে আর্ত্তিপূর্ণ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, তাহা বর্ণনা করে কার সাধ্য? বাবাজী মহাশয় গঙ্গাস্নানান্তে তীরে উঠিলে তাঁহার আদেশমত সঙ্গিগণ একত্রে গঙ্গাস্নান করিতে নামিলেন। এদিকে স্বেচ্ছাময় স্বতন্ত্র পুরুষ মনে মনে কি বিচার করিলেন, তিনিই জানেন। সঙ্গিগণকে মায়ের কোলে রাখিয়া একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ীতে চড়িয়া কোথায় চলিয়া গেলেন।

সঙ্গিগণ গঙ্গাস্নানান্তে তীরে উঠিয়া দেখেন, তাঁহাদের প্রাণের প্রাণ, জীবনসর্ব্বস্বধন দাদা সেখানে নাই। তখন সকলেই বিশেষ উদ্বিগ্নমনে চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু নিকটে কোন সন্ধান না পাইয়া পরামর্শ স্থির করিলেন যে, একজনকে ঘাটে রাখিয়া সকলে খুঁজিতে বাহির হওয়া যাউক। এইরূপ স্থির করিয়া সকলে চতুর্দ্দিকে বাবাজী মহাশয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু কোথাও তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। তখন সকলেই বিষণ্ণমনে ফিরিয়া আসিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়-ভাবে জগন্নাথঘাটে বসিলেন। সকলেরই মনে বিষম চিন্তা—চক্ষু ছলছল। তাঁহারা মণিহারা ফণীর ন্যায় অস্থিরভাবে এদিক্ ওদিক্ করিতেছেন, এমন সময় একটি ভদ্রলোক আসিয়া বলিলেন, "মহাশয়, তিনি কোন

অনির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়াছেন। 'নবদ্বীপধামে সময়মত দেখা হইবে' এই কথাটি তিনি আমাকে আপনাদের নিকট বলিতে বলিলেন।" যাহা হউক, তাঁহার একটা সংবাদ পাইয়া সকলেই একটু স্থির হইলেন। এই ভদ্র-লোকটিই ইঁহাদিগের সেদিনকার ঠাকুরের ভোগের ব্যবস্থা করিয়া দিলে ইঁহারা রন্ধন করতঃ ঠাকুরের ভোগ দিবার পর প্রসাদ পাইয়া দুঃখিতমনে সেইদিনই কেহ বা নবদ্বীপ কেহ বা স্থানান্তরে গমন করিলেন। এই সময় হইতে বাবাজী মহাশয়ের পুনরায় শ্রীধাম নবদ্বীপ আগমনপর্য্যন্ত বৃত্তান্তসকল তাঁহার হস্তলিখিত একখানি খাতায় যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহাই এই স্থানে উদ্ধৃত করা হইল :—

তত্ত্বমীমাংসা

নিঃসঙ্গ অবস্থায় ভ্রমণ করিতে করিতে ভাবিলাম, কি উপায়ে পরম শান্তি লাভ করা যায়। তখন মনে উদয় হইল, তর্কাদি-মীমাংসা, চিত্ত-সদ্ধতমোনাশ, দৃঢ়বিশ্বাস দ্বারা স্থায়ী বস্তু হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক আদর্শ পথ অবলম্বন দ্বারা লক্ষিত বস্তু লাভ করিবার উপায় প্রাপ্ত হইতে পারিলে জীবের চিরশান্তি লাভের কারণ হইতে পারে। নিজের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিকালের অবস্থা ভাবিতে ভাবিতে হৃদয়ের মধ্যে নানাপ্রকার আলোচনা করতঃ কখন শোক, কখন দুঃখ, কখন বা আনন্দ ইত্যাদি নানা ভাবের উদয় হইয়া থাকে। মনের কথা প্রকাশ করিলে লোকে তাহাকে পাগল বলিয়া থাকে। যাহা হউক, আজ পাগল বলিয়া পরিচিত হইতে হইলেও এ অদ্ভুত রহস্য গোপন করিতে অক্ষম হইয়া সভ্যসমাজে পাগল বলিয়া পরিচিত হইতে বসিলাম। তবে একটু ভরসা এই যে, পাগলের কথা কদর্য্য হইলেও সভ্যগণ নিজেদের আনন্দবর্দ্ধনের জন্য অনেক সময় পাগলের সহিত আলাপ করিয়া থাকেন।

আমি আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কে? কোথা হইতে আসিলে? এবং তোমার প্রতিমুহূর্ত্ত পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই কেন? কখন তুমি পরমানন্দে মাতিয়া যাইতেছ; কখন বা মহাদুঃখ অনুভব করিয়া হাহাকার করিতেছ; আবার কখনও বা সুখদুঃখে মাথা-মাখিভাবে কালযাপন করিতেছ। কখনও বা তুমি পরদুঃখে কাতর, আবার কখনও বা পরকে দুঃখ দিতে প্রস্তুত। সময়ে খাইবার জন্য ব্যাকুলতা, সময়ে আহারে অনিচ্ছা। কখনও তুমি নিদ্রিত, কখনও বা জাগ্রত। কখনও বা তুমি রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দের প্রতি ধাবিত হইতেছ; কিন্তু তাহাতে বিফলমনোরথ হইলে দুঃখে অধীর হইয়া পড়িতেছ। আবার কখনও বা ঐ সকল বস্তু প্রাপ্ত হইয়াও ত্যাগ করিতেছ; কখনও বা সাদরে গ্রহণ করিয়া আনন্দে বিভোর হইতেছ। কখনও উপস্থিত বস্তু পরিত্যাগ করিতেছ, কখনও বা আবার অভাব পূরণের জন্য ব্যাকুল হইয়া বেড়াইতেছ, অসামর্থ্যে কত হাহুতাশ করিতেছ। কখনও মোহে অভিভূত হইয়া অবনতমস্তকে ত্রিতাপ জ্বালা সহ্য করিতেছ; আবার কখনও বা ত্রিতাপে তাপিত হইয়া শান্তিলাভের আশায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছ। তোমার চরিত্র দেখিয়া তুমিই অবাক্! কখনও নিজে প্রভু সাজিয়া অভিমানে মাতিয়া যাইতেছ; কখনও কাহারও আজ্ঞা প্রতীক্ষা করিয়া সম্পূর্ণ নিজের দাসত্বের পরিচয় দিতেছ। ইত্যাদি প্রতি-মুহূর্ত্তে নানাভাবের তরঙ্গে হাবুডুবু খাইতেছ। তোমাকে বিশেষরূপে চিনিবার জন্য বড়ই অভিলাষ হইয়াছে।

কি উপায় অবলম্বন করিলে তোমাকে চিনিতে পারিব, ভাবিতে ভাবিতে এক গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, একটী গর্ভবতী স্ত্রীলোক প্রসববেদনায় ছট্‌ফট্ করিতেছে। তাহার কাতরতা দেখিয়া তথায় দাঁড়াইলাম। মনে করিলাম, ইহার পরিণাম বুঝিয়া যাইব।

পরমুহূর্ত্তেই গর্ভবতী স্ত্রীলোকটি একটী সুন্দর বালক প্রসব করিল। সদ্যোজাত শিশুটি ভূমিষ্ঠ হইয়াই ক্রন্দন করিতে লাগিল। প্রসূতি তাহার মুখে স্তনদান করিবামাত্র সে শান্ত হইল। বালকের পিতা এই নবজাত শিশু এবং তাহার প্রসূতির শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেম। একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, এই নবজাত বালকের পিতার নাম জনমেজয় বন্দ্যোপাধ্যায়। মাতার নাম হরিমতী দেবী। এই উভয়ের সহযোগে এই বালকের জন্ম।

এই কথাটী শুনিবামাত্রই বুঝিলাম, পুরুষ ও প্রকৃতিজাত দুইটী পদার্থ অর্থাৎ রজঃ ও বীর্য্য সহযোগে স্বরূপ, স্বভাব, ভাব, ইচ্ছা, অহঙ্কারাদি প্রস্তুত হইয়াছে। জ্ঞানটীও সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছে; কারণ উক্ত বালক ক্ষুধার উদ্রেকে রোদন করিতে লাগিল। আবার অভীষ্ট বস্তু স্তনদুগ্ধপানে ক্ষুধার নিবৃত্তি হইলে মাতৃক্রোড়ে নিদ্রিত হইল। কাজেই অনুমান করিলাম, অভীষ্টবস্তু না পাওয়া পর্য্যন্ত চিত্ত কখনও শান্ত হয় না। আমি আমাকে ভুলিয়া গিয়া চিন্তাসাগরে ডুবিয়াছিলাম। এই বালকের জন্ম দর্শনে আমার আত্মতত্ত্বজ্ঞান জন্মিল। বুঝিলাম মাতাপিতা হইতে আমাদের জন্ম এবং তদনুরূপ আকার, স্বভাব, ভাব; ক্রমে ইচ্ছা, অহঙ্কার, সম্বন্ধ, স্বভাবের জ্ঞান, স্বভাবের যোগাযোগ, ভক্তি, শ্রদ্ধা, ব্যাকুলতা, চেষ্টা, চিন্তা, যত্ন, আগ্রহ, লালসা, উদ্বেগ ইত্যাদি নানাপ্রকার ভাবে আমাদের হৃদয় পরিপূর্ণ। কিন্তু যে সমস্ত দ্বারা আমাদের ভিতর বাহির সাজান, উহা সীমাবদ্ধ; অতএব ব্যাপ্য। ঐ ব্যাপ্যবস্তুগুলির ক্রিয়া অনুভব করিলে বুঝা যায় যে, কোনও একটী ব্যাপক বস্তু ঐরূপে ব্যাপ্য হইয়া রহিয়াছে। ইহার গূঢ় রহস্য বুঝিবার জন্য বহু চেষ্টা করিতে লাগিলাম। যাহাকেই সম্মুখে পাই, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করি।

একদিন একজন বৈজ্ঞানিক ব্যক্তির দেখা পাইলাম। তাঁহাকে

জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "জগতের নিখিল বস্তু স্বভাবজাত। জগৎ স্বভাবের শোভা বই আর কিছুই নয়। সকলই আপনা আপনি উৎপন্ন হইয়া কালে আপনা আপনিই লয় পাইতেছে। এইরূপ তুমিও জন্মিয়াছ; কালে নষ্ট হইবে। ইহার কেহ নিয়ন্তা নাই।" এই কথা শুনিয়া যাহা বুঝিলাম, তাহাতে মনের তৃপ্তি হইল না। ক্রমে একটি মায়াবাদী সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হইলে, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "বাবা! তুমি, আমি এবং অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্বর্ত্তী দৃশ্যাদৃশ্য নিখিল বস্তুসকল একমাত্র ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নয়। 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।' ব্রহ্ম নিরাকার, নির্গুণ, চিদানন্দময়, জ্ঞানস্বরূপ এবং সর্ব্বব্যাপক। স্বেচ্ছায় একাংশে ঘটপটাদি উপাধিতে উপহিত হইয়া জীবত্ব প্রাপ্ত হন, আবার কালে জ্ঞানোদয়ে উপাধি বিনষ্টে ব্যাপ্যত্বহানি প্রযুক্ত ব্যাপক ব্রহ্মে লীন হইয়া যান। ইহাকেই নির্ব্বাণ মুক্তি বলে। অর্থাৎ জীবমাত্রেই ব্যাপকব্রহ্ম ব্যাপ্যরূপে বিরাজ করিতেছেন। আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ে তাপিত জীব পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্তির জন্য বেদান্ত আলোচনাপূর্ব্বক 'তত্ত্বমসি, অহং ব্রহ্মাস্মি, প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম' ইত্যাদি মহাবাক্য চিন্তা করিতে করিতে 'একমেবাদ্বিতীয়ং' এই জ্ঞান জন্মিলে ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয়।"

মায়াবাদী সাধুর উপদেশগুলি মন্দ নয় বটে; কিন্তু ইহাতেও আমার প্রাণ শীতল হইল না। বরং স্বাভাবিকভাবে নিজে যাহা বুঝিয়াছিলাম, তাহাও ঠিক্ রাখা কষ্টকর হইয়া পড়িল। ঘোরতর চিন্তার স্রোতে পড়িলাম। এমন সময় একটি অধ্যাত্মবাদী যোগী উপস্থিত হইলেন। ইঁহারা যোগমার্গে ষট্‌চক্রভেদ করিয়া জীবাত্মা পরমাত্মার সম্মিলনে সমাধি যোগ করিয়া থাকেন। যোগী বলিলেন, "তুমি যাহা বুঝিবার জন্য ব্যাকুল, উহা বাহিরে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পাতঞ্জলাদি যোগশাস্ত্রোক্ত

যোগসাধন দ্বারা রিপু ও ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিরোধের পর কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত করিয়া জীবতত্ত্ব এবং পরমাত্মতত্ত্ব নিরূপণপূর্ব্বক ষট্‌চক্রভেদ করতঃ নাভিপদ্ম হইতে জীবাত্মাকে সহস্রারে লইয়া পরমাত্মার সহিত মিলনের নাম সমাধি। যোগশাস্ত্রমতে পরমাত্মাই কৃষ্ণ এবং জীবাত্মাই রাধা। এইরূপ প্রত্যেক জীবের দেহেই রাধাকৃষ্ণ প্রকৃতি ও পুরুষরূপে কার্য্য করিতেছেন। ইহা একমাত্র অনুভূতিগম্য, বাহিরে খুঁজিয়া পাইবার বস্তু নয়।"

এই মহাত্মার কথা শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। ইঁহার প্রদর্শিত ভজনপ্রণালী যাজন করিতে চেষ্টাও করিলাম। কিন্তু মনের আকাঙ্ক্ষা মিটিল না—প্রাণের অভাব দূর হইল না। বরঞ্চ হৃদয়ের ব্যাকুলতা আরও বাড়িয়া গেল। তখন পাগলের ন্যায় দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া চলিতে চলিতে সরস্বতীরে উপনীত হইয়া উৎকণ্ঠিতচিত্তে শ্রীশ্রীগুরুদেবের চরণ চিন্তা করিতে লাগিলাম এবং প্রাণ খুলিয়া তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলাম, "হে করুণাময় প্রভো! তুমি ত অন্তর্য্যামী। প্রকৃত ভজনতত্ত্ব অবগত হইবার যথার্থই যদি আমার সময় হইয়া থাকে, হে অযাচিতকৃপাকারী, হে অজ্ঞানতিমিরনাশক শ্রীগুরুদেব, তবে একবার এ দাসকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিতে আজ্ঞা হউক।" এইরূপভাবে প্রার্থনা করিতে করিতে নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলাম, সম্মুখে তপ্ত-কাঞ্চনের ন্যায় গৌরবর্ণ, আজানুলম্বিতভুজ, অতি দীর্ঘাকার, অশ্রুজলসিক্ত-বদনকমল পরমানন্দময়-মূর্ত্তি অভীষ্টদেব সম্মুখে দণ্ডায়মান। তাঁহাকে দেখিবামাত্র আনন্দে অধীর হইয়া চরণতলে পতিত হইলাম।

তখন তিনি কৃপাপরবশ হইয়া চঞ্চলচিত্ত জীবাধম আমাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন প্রদানে ধন্য এবং বিশুদ্ধ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ভজন-কুটীরে গমনপূর্ব্বক নিজ মানসিক চঞ্চলতার কথা শ্রীচরণে নিবেদন করিয়া

যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইবার অভিলাষ প্রকাশ করিলাম। মরুভূমিসদৃশ শুষ্কহৃদয় আমা হেন পতিত জীবকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখচন্দ্র হইতে উপদেশামৃত বর্ষণ হইতে লাগিল।

তিনি বলিলেন, "বাবা, তোমার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে স্বরূপ, স্বভাব, জ্ঞান ইত্যাদি যে সমস্ত বস্তু তোমার সহজাত হইয়াছিল, সে সকল সীমাবদ্ধ হইলেও বড়ই আনন্দপ্রদ ও সুখের হইত। কিন্তু ক্রমে তুমি যতই বড় হইতে লাগিলে, ততই প্রত্যেক অবস্থায় তোমার বিক্ষিপ্ত শক্তির সঞ্চার হইতে লাগিল। এই বিক্ষিপ্ত শক্তি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তোমাকে এরূপভাবে আত্মসাৎ করিয়া ফেলিল যে, আর তুমি মুহূর্ত্তের জন্যও শান্তি লাভ বা কোন নির্দ্দিষ্ট বস্তুতে ক্ষণকালের জন্য স্থির থাকিবার উপায় নির্দ্দেশ করিতে পারিলে না। এই অবস্থায় তোমার স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান, অবিদ্যা ও মায়ারূপ মেঘে সমাচ্ছন্ন হইয়া অজ্ঞান নাম ধারণ করিল। ঐ অবিদ্যা ও মায়ারূপ মেঘ দূর করিয়া এই অজ্ঞানকে জ্ঞানরূপে পরিণত করিবার দুটী উপায় আছে। একটী ভগবৎ-কৃপা এবং দ্বিতীয়টী সদ্গুরুর উপদেশানুসারে নিজের চেষ্টা। ভগবৎ-কৃপা নিরপেক্ষ। ভগবৎ-কৃপায় আপনাআপনি সমস্ত বস্তুর ব্যুৎপত্তি ও জ্ঞান জন্মে। তখন অজ্ঞান ও অবিদ্যা দূর হইয়া প্রকৃত বস্তুর লক্ষ্য হয় এবং লক্ষিত বস্তু প্রাপ্তির উপায় উদ্ভাবনের ক্ষমতা হৃদয়ে উদ্ভূত হয়। সেই সঙ্গে সঙ্গে নির্দ্ধার্য্য বস্তু হৃদয়ে স্থায়িভাবে রাখিবার শক্তি প্রকাশ পায়।

দ্বিতীয় উপায়—অজ্ঞান এবং অবিদ্যাকে পরাজয়ের জন্য বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজন। বিদ্যাশিক্ষা চারিপ্রকার। যথা,—অর্থকরী, যশস্করী, বাদকরী ও সুতত্ত্ববোধিনী। প্রথম প্রকার বিদ্যাশিক্ষা এই যে, ছেলেটিকে স্কুলে দিয়াই মাষ্টার পণ্ডিতকে বলা হইল, 'মহাশয়, যাহাতে ছেলেটী কোন রকমে একটু চাকরী করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারে, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক

সেই বিষয়ে একটু চেষ্টা করিবেন।' এইরূপ উদ্দেশ্যে বিদ্যাশিক্ষার নাম অর্থকরী বিদ্যা। পরীক্ষা দিতে গিয়া অপর ভাল ছেলেদের নিকট হইতে প্রশ্ন জানিয়া লইয়া কিংবা যিনি কাগজ দেখিবেন, তাঁহাকে গোপনে কিছু দিয়া পাশ করা অথবা পুস্তকের যে যে স্থান হইতে প্রশ্ন হইবার সম্ভাবনা, সেই সেই স্থান অভ্যাস করিয়া পাশ করাকেই যশস্করী বিদ্যা বলে; অর্থাৎ অমুক ছেলে বি-এ পাশ, অমুক ছেলে এম-এ পাশ ইত্যাদি যশের অভিলাষে যে বিদ্যা শিক্ষা করা যায়, তাহাই যশস্করী বিদ্যা নামে অভিহিত হয়। ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি তর্কশাস্ত্র কিংবা ধর্ম্মশাস্ত্র পড়িতে গিয়া সর্ব্বাগ্রে পণ্ডিতের নিকট কূট তর্ক অভ্যাস করিয়া প্রতিপক্ষ পরাস্ত করা কিংবা লোকের নিকট আপনাকে জ্ঞানী বা সাধকরূপে প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত মিছামিছি তর্ক করিয়া অপরকে পরাস্ত করিয়া যশোপার্জ্জনের নাম বাদকরী বিদ্যা।

এই ত্রিবিধ বিদ্যা উপার্জ্জনে অবিদ্যা ও অজ্ঞানতা নাশ করা ত দূরের কথা; বরং উহা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এই কারণে উক্ত ত্রিবিধ বিদ্যাকে অবিদ্যার মধ্যেই পরিগণিত করা হয়। চতুর্থ বিদ্যার নাম স্বতত্ত্ববোধিনী। প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য যে বিদ্যা অভ্যাস করা হয়, তাহাকেই স্বতত্ত্ব-বোধিনী বিদ্যা বলা যায়। এই বিদ্যাবলেই অজ্ঞান ও অবিদ্যার নিবৃত্তি হইয়া বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়া থাকে। তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বস্তুনির্দ্দেশ হয়। বস্তুনির্দ্দেশ হইলে নির্দ্দিষ্ট বস্তু লাভের লালসা জন্মে। লালসা বাড়িলে তত্ত্ব-বস্তুপ্রাপ্ত ব্যক্তির আদর্শ লইয়া সাধন দ্বারা যোগ্যতা লাভ করাই বস্তুপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়। তোমাকে যেরূপ অস্থিরচিত্ত দেখিতেছি, আমার বিশ্বাস, তুমি সম্পূর্ণ অবিদ্যা ও অজ্ঞানের হস্তগত হইয়া পড়িয়াছ। আমি আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি। মনস্থির করিয়া শুন।

বিদ্যাশিক্ষায় প্রথম বর্ণজ্ঞান, বর্ণে বর্ণে যোজকতা দ্বারা শব্দজ্ঞান,

শব্দের দ্বারা তৎপ্রতিপাদ্য বস্তুজ্ঞান জন্মে। ঐ বস্তু কতক দৃশ্য, কতক অনুমেয়। দৃশ্য বস্তুও কতক অনুভব করা কষ্টকর হয়। বস্তু সকল পৃথক পৃথক্ শব্দে অভিহিত হইয়া তত্ত্বতঃ ব্যাপ্য হইলেও ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছে। যাবতীয় বস্তুগুলি দুইভাগে বিভক্ত,—স্থাবর ও জঙ্গম। এই স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক দৃশ্যাদৃশ্য নিখিল বস্তুজাত একমাত্র ভগবান্ শ্রীহরিতে পর্য্যবসিত। কিরূপে ভগবানে পর্য্যবসিত, তাহাও বুঝাইয়া দিই, শুন।

দৃশ্যাদৃশ্য স্থাবর জঙ্গমাত্মক যাবতীয় পদার্থই ক্ষিত্যপ্‌তেজমরুদ্ব্যোম এই পঞ্চভূতাত্মক। ক্ষিত্যাদি স্থূল পঞ্চভূতের নাশে বস্তু পঞ্চতন্মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। পঞ্চতন্মাত্রনাশে মহত্তত্ত্বাদিতে, তন্নাশে ত্রিগুণে, ত্রিগুণাভাবে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিতে, প্রকৃত্যভাবে একমাত্র পরম পুরুষ সেই ভগবান্ শ্রীহরিতে পর্য্যবসিত হয়। তাই সংক্ষেপে বলিয়াছিলাম, যাবতীয় বস্তু একমাত্র শ্রীহরিতে পর্য্যবসিত। ভগবান্ বলিয়াছেন, "ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব" ভগবান্ সর্ব্বগুণসম্পন্ন এবং রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শের আকর। তিনি সর্ব্বব্যাপক হইয়াও ব্যাপ্যরূপে আমাদের ব্যবহারিক জগতে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবদুক্তি যথা,—"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ"। অতএব ব্রহ্মবাদীদিগের ব্রহ্ম, পূর্ণ পূর্ণতম শ্রীভগবানের অঙ্গকান্তি। যোগিগণের পরমাত্মা, সেই ভগবানের অংশবিশেষ।

এক্ষণে সেই পূর্ণ পূর্ণতম শ্রীহরির নাম ও রূপ অবগত হওয়া প্রয়োজন। তাঁহার একটি নাম 'কৃষ্ণ'। "কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দঃ, নশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ। যস্মাদেতত্রয়ং যাতি স কৃষ্ণঃ সমুদাহৃতঃ॥" অর্থাৎ যিনি স্বয়ং স্থূলরূপরসাদি উৎপন্ন করাইয়া পালন করেন এবং তাহার বিনাশে পুনরায় স্বয়ং আকর্ষণ করেন, তিনিই কৃষ্ণ। তাঁহার অনন্ত নাম ও রূপ থাকিলেও দ্বিভুজ

শ্যামসুন্দর, গোপবেশ, বেণুকর, নবকৈশোর, নটবর, মধুরমূরতি, ভুবন-মোহন সচ্চিদানন্দ গোবিন্দরূপে ভূবি বৃন্দাবনে অবস্থান করিতেছেন। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন, "হরিনামের বহু অংগ তাহা নাহি জানি। যশোদানন্দন শ্যামসুন্দর এইমাত্র জানি॥"

শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপটী সাধারণ দেহধারীর ন্যায় উপাধিগত নহে। ইনি নিত্য, চিন্ময়, পূর্ণৈশ্বর্য্য, পূর্ণমাধুর্য্য এবং রসময়বিগ্রহ। ইনি স্বেচ্ছাময় ও স্বতন্ত্র পুরুষ। নিজ ইচ্ছা দ্বারা বহু প্রকাশ হইয়া জগতে আপনাকে আপনি বুঝাইয়া থাকেন এবং কখন আপনাকে আপনি আচ্ছাদনও করিয়া থাকেন। তাই পূর্ব্বে বলিয়াছি, ইহারই অঙ্গকান্তিকে মায়াবাদী' নিরাকার ব্রহ্ম' বলিয়া তত্ত্বমস্যাদি অবলম্বনে নির্ব্বাণ লাভ করিতেছেন। ইঁহারই অংশাংশকে যোগিগণ নশ্বরদেহে অন্বেষণ করিতে গিয়া চিরদিন নানাস্থানে ভ্রমণ করিতেছেন। ইঁহারই দুইভাগে বিভক্ত প্রকৃতি ও পুরুষের খেলা দেখিয়া বৈজ্ঞানিকগণ স্বভাবের শোভা বলিয়া দম্ভপ্রকাশ করতঃ নিরীশ্বর-বাদী হইয়া পড়িয়াছেন। কেহ কেহ বা সীমাবদ্ধ কর্ম্মফলের অধিষ্ঠাত্রী দেবদেবীগণকেই ঈশ্বর ঈশ্বরীবোধে উপাসনা করিয়া স্বর্গাদি সুখভোগ বাসনায় কালাতিপাত করিতেছেন। তাঁহারা জানেন না, কিম্বা জানিবার জন্য ইচ্ছাও করেন না যে, ইচ্ছাময় শ্রীভগবান্ আপন ইচ্ছায় ত্রিগুণের সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবকে ত্রিগুণের অধিষ্ঠাতৃরূপে নিযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহারই আজ্ঞায় ব্রহ্মা রজোগুণের দ্বারা সৃষ্টি করিতেছেন। তাঁহারই আদেশে বিষ্ণু সত্ত্বগুণের দ্বারা পালন করিতেছেন এবং তাঁহারই অনুমতিক্রমে দেবাদিদেব মহাদেব তমোগুণের দ্বারা সংহার করিতেছেন। ইচ্ছা এবং অহঙ্কার না থাকিলে কোন কার্য্য সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব বোধে শ্রীভগবান্ নিজের ইচ্ছা ও অহঙ্কার দ্বারা ত্রিগুণাধীশ্বর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবকে ঈশ্বরপদে

অভিহিত করিয়া ইচ্ছা ও অহঙ্কার শক্তি প্রদান করতঃ নিজ মায়াশক্তি দ্বারা প্রত্যেককেই আবরণ করিয়া রাখিয়াছেন। অনন্ত ঐশ্বর্য্যশালী, শ্রীভগবান্ অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি ব্রহ্মাণ্ডেই এইরূপ গুণত্রয় দ্বারা রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। এই ত্রিগুণ, ভগবদিচ্ছা ও অহঙ্কার দ্বারা মহাবিষ্ণু হইতে মাকাল দেবতা পর্য্যন্ত চিচ্ছক্তি, স্থাবর জঙ্গম কীটাণু পর্য্যন্ত জীবশক্তি এবং লক্ষ্মী দুর্গা হইতে কীটানী পর্য্যন্ত মায়াশক্তিরূপে আবৃত রহিয়াছেন। পূর্ণ পূর্ণতম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আত্মারামরূপে প্রত্যক্ষ দেহে অধিষ্ঠিত হইয়া নিজ শক্তি দ্বারা নিজের তত্ত্ব, নিজের ব্যাপকত্ব ও নিজের লীলারহস্য স্বয়ং অনুভব করিতেছেন। কিন্তু মায়ামুগ্ধ জীবগণ লীলাময়ের লীলারহস্য বুঝিতে না পারিয়া নিজ নিজ অহঙ্কার, ইচ্ছা, স্বরূপ এবং ভাবে উন্মত্ত হইয়া সুখদুঃখ, ধর্ম্মাধর্ম্ম, স্বর্গ, নরক, স্রষ্টা এবং সৃষ্টি ইত্যাদি নানাপ্রকার বাসনা ভোগ করিয়া আসিতেছে। এই প্রকার চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া মানবক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে জীবের অনুভব শক্তির উপলব্ধি হয়। ক্রমে তাঁহারা নিজ নিজ কর্ম্মফলানুসারে মানবের মধ্যে ভারতবাসী, ভারতবাসীর মধ্যে হিন্দু, হিন্দুর মধ্যে বর্ণ, বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের মধ্যে বেদজ্ঞ, বেদজ্ঞের মধ্যে কর্ম্মী, কর্ম্মীর মধ্যে জ্ঞানী, জ্ঞানীর মধ্যে মুক্ত, মুক্তের মধ্যে ভগবদ্ভক্তরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ক্রমে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি, বৈধী ভক্তি, বিশুদ্ধা ভক্তি, রাগভক্তি প্রভৃতি ভক্তির প্রকারভেদে ভক্তগণেরও ভিন্ন ভিন্ন ভাব হৃদয়ে অবধারণ করতঃ নিজ নিজ স্বরূপতত্ত্ব অবগত হইয়া সাধণ করিতে পারিলেই সিদ্ধ দেহ লাভ হইয়া জীবের পুনরাবৃত্তি লোপ হইয়া যায়। ঐ তত্ত্ব একমাত্র মানবজন্ম ভিন্ন অন্য কোনও জন্মে উপলব্ধি হওয়া সুকঠিন।

এই সকল তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করায় স্থির সিদ্ধান্ত হইল যে, জীবের কোনও স্বতন্ত্র শক্তি নাই। শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র প্রভু। তিনি সচ্চিদানন্দময়-বিগ্রহ, সর্ব্বকারণ-কারণ, সর্ব্বনিয়ন্তা। সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া আপামর সাধারণ জীবগণকে অযাচিত-ভাবে চির-অনর্পিত প্রেমধন বিতরণ করিবার মানসে অভিন্নহৃদয় শ্রীবলদেব-জিউকে নিত্যানন্দরূপে অবতীর্ণ করাইয়া তাঁহার উপর প্রেমবিতরণের ভার অর্পণ করিলেন। শ্রীগোলোকধামে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মধুর লীলা নিত্য বিরাজিত। সেই গোলোকলীলাই ভূবৃন্দাবনধামে পরকীয়ভাবে মাধুর্য্যা-ধিক্যরূপে আস্বাদিত হইতেছে এবং সেই বৃন্দাবনবিহারীই নিজপরিকরগণে বেষ্টিত হইয়া শ্রীনবদ্বীপধামে অবতীর্ণ হইলেন। এই ধামত্রয়ে নিত্যলীলা সমকালীন পূর্ণভাবে বিরাজিত রহিয়াছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে একমাত্র গুণাতীত অচিন্ত্যশক্তি-প্রভাব বা অঘটনঘটন-পটীয়সী কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যাশয়া যোগমায়ার প্রভাব ভিন্ন অন্য কিছুই বলা যাইতে পারে না।

মোটের উপর বুঝা গেল যে, জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস। এই কথা ভুলিয়া অবিদ্যা ও মায়ায় মুগ্ধ হইয়া অহঙ্কার এবং ইচ্ছাশক্তির-প্রভাবে 'অহং করোমি' ইত্যাকার অজ্ঞানমুগ্ধতাবশতঃ জীব নিজের কর্তৃত্ব উপলব্ধি করে। তাহারা কখন সৎকর্ম্মফলে স্বর্গাদি অপবর্গভোগ, কখন বা অসৎ কর্ম্মফলে দুঃখাদি অনন্ত নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়া নানাযোনি ভ্রমণ করিতেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে জীবের কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি এবং কোন্ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে সুখদুঃখ, জন্মমৃত্যু এবং ত্রিতাপাদি-রহিত হইয়া নিত্য নিরবচ্ছিন্ন পূর্ণানন্দরসে সর্ব্বদা সমভাবে ডুবিয়া থাকিতে পারা যায়, তাহার নির্ণয় এবং তদবস্থাপ্রাপ্তির উপায় বিধান করা সকলেরই একমাত্র বিধেয়। বেদাদি শাস্ত্রে সাধন-প্রণালী বহুপ্রকারে নিরূপিত হইয়াছে।

তন্মধ্যে প্রধান কল্প তিনটি। যথা—জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি। প্রাপ্তির বিষয় যথাক্রমে ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান্। বিষয়ান্তরে দ্বেষভাব পোষণ করিয়া এই তিনটি বিষয় পৃথক্ পৃথক্ রূপে সাধিত হইলে সাধ্যবস্তু সম্পূর্ণলাভের অভাব দোষ ঘটে। প্রকৃত প্রস্তাবে এই অভাব দূর করিতে হইলে এই তিনের একত্র সামঞ্জস্য করা প্রয়োজন। অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্ গোলোক ধামে জ্যোতিরভ্যন্তরে দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর মুরলীধারী গোপবেশ বেণুকর; যাঁহার অঙ্গকান্তি ব্রহ্ম, যাঁহার অংশাংশ পরমাত্মারূপে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপৃত, বিষ্ণু হইতে কীটাণু পর্য্যন্ত যাঁহার আজ্ঞাকারী দাসরূপে নিরন্তর আজ্ঞাপালন করিয়া আসিতেছেন, সেই ইচ্ছাময় ভগবান্ সচ্চিদানন্দ গোবিন্দ আপন ইচ্ছায় জীবজগতের গোচরীভূত হইয়া মানব-জন্মের উৎকর্ষতা বুঝাইবার জন্য রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শের আকর-স্বরূপে শ্রীবৃন্দাবনে লীলাপ্রকাশ এবং পরিপূর্ণভাবে ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় বিধান নিমিত্ত জীবের সহিত সম্বন্ধাদি রসবিলাস বিস্তার করেন। অর্থাৎ নাগপত্নীদিগের নিকট ভগবান্‌রূপে, রক্তক পত্রকের নিকট প্রভুভাবে, শ্রীদামাদির নিকট সখাভাবে, নন্দ যশোদার নিকট পুত্রভাবে এবং শ্রীরাধাদি গোপীগণের নিকট কান্তভাবে নিরন্তর আকৃষ্ট হইয়া লীলারস আস্বাদন করিতেছেন। এই মধুর বৃন্দাবনলীলা দ্বাপর যুগের বৈবস্বত মন্বন্তরে সাধারণের নয়নগোচর হইয়াছিল।

এই লীলারহস্য জগতে প্রকট ও অপ্রকট এই দুইভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। চন্দ্রসূর্য্যের উদয়াস্তের ন্যায় প্রকট এবং অপ্রকট এই দুইটী শ্রীভগবানের লীলারহস্য। এই উভয় লীলায় প্রবেশ করিতে হইলেই সাধনের আবশ্যক হইয়া থাকে। জীব অনাদি বহির্ম্মুখ; অতএব সাধনে অসমর্থ দেখিয়া দয়াময় শ্রীহরি কৃপাপূর্ব্বক নিজ হ্লাদিনীর সার মহাভাবস্বরূপা

শ্রীমতী রাধিকার অঙ্গকান্তি দ্বারা নিজরূপ আচ্ছাদন করতঃ ভক্তরূপ ধারণপূর্ব্বক অধন্য কলিযুগকে ধন্য করিবার নিমিত্ত সাঙ্গোপাঙ্গ সপার্ষদে কলিরাজের দুর্জ্জয় শাসন হইতে জীবদিগকে উদ্ধার করিবার উদ্দেশ্যে খোলকরতালযোগে শ্রীহরিসংকীর্ত্তন প্রচার দ্বারা কলিকবলিত জীববৃন্দকে অভয়দানে পূর্ব্বোক্ত বৃন্দাবনলীলা আস্বাদনোপযোগী ভাব ও প্রেম দান করিলেন। ঐ সকল লীলা এখন অপ্রকট হইলেও সংকীর্ত্তনযজ্ঞে উঁহাকে আহ্বান করিলে অর্থাৎ ব্যাকুলপ্রাণে কাঁদিয়া ডাকিলে তিনি দেহে দেহে গেহে গেহে ভাবাবেশরূপে উদিত হইয়া পরম গুহ্যাতিগুহ্য লীলারস অতিশয় অজ্ঞ জীবের হৃদয়েও প্রেরণা করিয়া থাকেন। জ্ঞানের দ্বারা এই তত্ত্ব হৃদয়ে ধারণা হইলে তত্ত্বের অবধি হয়। সেই নির্দ্দিষ্ট তত্ত্ববস্তুর সহিত মিলনের নাম যোগ। এই যোগের দ্বারা অভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত হইয়া নিরন্তর আস্বাদন করার নাম ভক্তি।

এক্ষণে আমাদের ন্যায় প্রপন্নজীবের কর্ত্তব্য স্থির করিয়া উপাসনা বুঝিয়া লওয়া উচিত। বেদাদি শাস্ত্র অন্বেষণ দ্বারা তত্ত্ববস্তু নির্দ্দেশ করিতে হইলে এ জীবনে কুলান কঠিন এবং শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্রের পরম রহস্য বুঝিয়া তত্ত্ব গ্রহণ করা জীবের পক্ষে দুষ্কর। এই সকল কারণে দেশকালপাত্র অনুসারে মহাজনগণের প্রদর্শিত এবং আচরিত পন্থা অনুসরণ করাই সরল উপায় এবং আমাদের একান্ত বিধেয়। এখন কলিকাল; আমরা কলিহত মায়ামুগ্ধ অধর্ম্মপরায়ণ জীব। আমাদের ভারতবর্ষে বাস। আমাদের পক্ষে সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত যুগোচিত উপাসনাই শ্রেয়ঃ। এই যুগধর্ম্ম—ভুবনপাবন সর্ব্বমঙ্গলময় হরিনামসংকীর্ত্তন। ইহার প্রচারক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু। মহাপতিত জগাই মাধাই উদ্ধার ইহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। এই ঘোর কলিযুগে এমন পরম কারুণিক পতিতপাবন শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর চরণ স্মরণ ভিন্ন আমাদের ন্যায় মহাপাপী জীবের উদ্ধারের উপায়ান্তর নাই।

ভূবৃন্দাবনে নিকুঞ্জকাননে নন্দনন্দন রাধারমণ রাসবিহারী রাস-রসানন্দে মগ্ন হইয়া যে লীলা আচরণ করিতেছেন, যুগোচিত সাধন শ্রীহরিনাম অবলম্বনে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর দাসানুদাস হইয়া শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-দেবের পাদপদ্ম আশ্রয় করতঃ সেই সেই লীলায় প্রবেশ করাই জীবের একান্ত কর্ত্তব্য। এই সাধন পথাশ্রয়ই জীবের চিরশান্তিলাভের কারণ। এ বিষয়ে আর নূতন বিচার করা নিষ্প্রয়োজন। বেদমন্থনে শ্রীমদ্ভাগবত এবং ঐ ভাগবতমন্থনে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উৎপত্তি। শ্রীশ্রীচরিতামৃতের মধ্যমের অষ্টম পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর সহিত রামানন্দ রায়ের বিচারে বস্তু-নির্দ্দেশ হইয়াছে। যথা,—নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে পরিপূর্ণভাবে লাভ করিয়াছেন শ্রীমতী রাধিকা। ললিতাদি সখীগণ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীরূপ রতি ও অনঙ্গাদি মঞ্জরীগণ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ও ললিতাদি সখীগণকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। উঁহারা পরিপূর্ণভাবে প্রাপ্ত হইয়া নিরন্তর রাধাকৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত আছেন। অতএব মঞ্জরীগণের প্রাপ্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এস্থলে বিচার করিয়া দেখিলে নিরাকার ব্রহ্মে নির্ব্বাণমুক্তি অপেক্ষা সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম সনাতনের বৃন্দাবনলীলারসে প্রিয়নর্ম্মমঞ্জরীগণরূপে নিযুক্ত থাকারূপ নির্ব্বাণই পরম মঙ্গল এবং মহাসাধনা। যেহেতু ইহাদিগের আর পুনরাবৃত্তি হয় না। এই মঞ্জরীভাব মুক্তির চরম, জ্ঞানের অবধি, ভক্তির শেষ সীমা। এইক্ষণ উপরি উক্ত মঞ্জরীভাবে আমাদিগের প্রবেশলাভের উপায়নির্দ্ধারণ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

যে যে কারণে আমরা কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছি, তদ্বিষয় জানিয়া তাহার প্রতীকার করাও অবশ্য কর্ত্তব্য। জীব স্বরূপ, স্বভাব, ভাব, ইচ্ছা ও অহঙ্কার দ্বারা সর্ব্বদা আবদ্ধ; অতএব প্রাকৃত রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শে আকৃষ্ট হেতু নিজ নিজ তত্ত্ব বিস্মৃত হয় এবং বিক্ষিপ্ত শক্তির বলে পুরুষাভি-মানী হইয়া সর্ব্বদা নিজের পুরুষাকার উপলব্ধি করিতেছে। এই স্বরূপ,

স্বভাব, ভাব, ইচ্ছা ও অহঙ্কার কখনই জীবের নিজস্ব নহে। ইহা অবশ্য কাহারও প্রদত্ত। অতএব যাঁহার প্রদত্ত বস্তু পাইয়া ব্যবহারদোষে আমরা এত কষ্ট পাইতেছি, তাঁহার বস্তু তাঁহাকে অর্পণ করাই উচিত। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া হৃদয়ে আনন্দভাব স্থায়ী করতঃ সকলেরই মনে মনে সংকল্প করা উচিত যে, "অদ্য হইতে নিতাইচাঁদ যাহা করাইবেন, তাহাই করিব।" অহঙ্কার ও ইচ্ছা প্রভৃতি নিজ কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিলে ত্রিতাপভোগ করিতেই হইবে। ঐ ত্রিতাপ দূর করিবার বাস্তবিক জীবের যখন কোনও শক্তি নাই, তখন উচিত কথা বলাই ভাল।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পাদপদ্মে অহঙ্কার ও ইচ্ছা প্রভৃতি সমর্পণ করিয়া তাঁহার সহিত দাস ও প্রভু সম্বন্ধ স্থাপনপূর্ব্বক নিরন্তর প্রভুর আজ্ঞানুসারে যথোপদিষ্ট কার্য্য করিতে পারিলেই শ্রীগৌরাঙ্গচরণলাভ হইবে। তখন তাঁহার শ্রীচরণে প্রার্থনা করিবে, "হা প্রভো, লীলাময় গৌরাঙ্গচাঁদ! আমাকে শ্রীবৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণলীলায় সখীগণ-আনুগত্যে নর্ম্মমঞ্জরীগণ-গণনায় গণিয়া তদযোগ্য দেহ দান করুন।"

এইরূপ প্রণালীতে সাধন করিতে করিতে ভাব, স্বভাব, ইচ্ছা ও অহঙ্কারের অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়া যাইবে। তখন সর্ব্বদা ব্রজলীলা রসাস্বাদনে ইচ্ছা হইবে। 'আমি শ্রীমতী রাধিকার দাসী' এই অহঙ্কারে হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণলীলায় যদি মঞ্জরীভাব স্থায়ী হয় এবং যদি স্বভাব মঞ্জরীস্বভাবে পরিণত হয়, তবে স্বরূপে পুরুষের দেহ থাকিলেও ভাব, স্বভাব, ইচ্ছা ও অহঙ্কারের প্রভাবে অষ্টকালীয় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-নিত্যলীলায় প্রবেশপূর্ব্বক স্বীয় কার্য্যে তৎপর থাকা হেতু স্থূলদেহের স্বরূপ, স্বভাব, ভাব, অহঙ্কার ও ইচ্ছা স্বতন্ত্র কর্ম্মে প্রবেশ করিতে পারিবে না; অর্থাৎ বাসনা কামনাদি বৃত্তিসকল শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণপাদপদ্মে উদিত হইবে। যে উহাতে বাধা দিবে, তাহার প্রতি ক্রোধ জন্মিবে এবং তাহার

নিকট যাইতে অনিচ্ছা হইবে। সর্ব্বদা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলাকথা শুনিতে লোভ হইবে। লীলাগুণচিন্তাদ্বারা সর্ব্বদা মুগ্ধ থাকিবে। লীলারসকীর্ত্তনে সর্ব্বদা মন প্রেমোন্মত্ত থাকিবে। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ত্বের পর আর তত্ত্ব নাই, ইহাই মাৎসর্য্যের বিষয় হইবে। তখন চক্ষুদ্বারা রাধাকৃষ্ণরূপ দর্শন, কর্ণদ্বারা লীলাগুণ শ্রবণ, নাসিকা দ্বারা গাত্রগন্ধ আঘ্রাণ, রসনায় লীলারস কীর্ত্তন ও তাঁহার অধরামৃত গ্রহণ, হস্ত দ্বারা শ্রীহরিমন্দির মার্জ্জন ও চন্দন-তুলসী আহরণ, পদদ্বারা রাধাকৃষ্ণ লীলাস্থলী গমনাগমন, সর্ব্বাঙ্গ দ্বারা রাধাকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে ও তাঁহার দাসদাসীগণকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। এই প্রকার ভজনপ্রণালীর নিয়ম তিন প্রকার—কায়িক, বাচিক ও মানসিক।"

শ্রীগুরুদেবের কথা শেষ হইলে আমি অতি ব্যকুলভাবে তাঁহার শ্রীচরণ ধরিয়া বলিলাম, "প্রভো, এতদিনে বুঝিলাম, শ্রীগৌরাঙ্গ ভিন্ন আমাদের আর গতি নাই। শ্রীনিতাইচাঁদের শ্রীচরণাশ্রয় এবং কৃপা ব্যতীত শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রাপ্তি হইতে পারে না। অতএব কি উপায়ে নিতাইচাঁদের কৃপালাভ করা যায়, তাহা আমাকে কৃপা করিয়া উপদেশ করুন।" ইহা শুনিয়া পরম কারুণিক শ্রীগুরুদেব প্রসন্নচিত্তে বলিতে লাগিলেন :—

শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা পাইবার উপায়।

ব্রাহ্মণ আচণ্ডাল কুক্কুরান্ত করি।
দণ্ডবৎ করিবেক বহুমান্য করি॥
এই সে বৈষ্ণবধর্ম্ম সবারে প্রণতি।
সেই ধর্ম্মধ্বজী যার ইথে নাই মতি॥

প্রাণিমাত্রে কোন মতে উদ্বেগ না দিবে।
কায়মনোবাক্যে সবায় সন্তোষ রাখিবে॥
সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি মানে।
কৃষ্ণকৃপা করিবেন দৃঢ় করি জানে॥
নিন্দাশূন্য নম্রভাবে সবারে স্তবন।
অভ্যাগত আহূত ব্যক্তির চরণবন্দন॥
সর্ব্ববৈষ্ণবেরে ভজে অভেদ করিয়া।
অনায়াসে কৃষ্ণ পায় সে যায় তরিয়া॥
একালে যে বৈষ্ণবেরে ছোট বড় বলে।
নিশ্চিন্ত থাকুক সে জানিবে কালে কালে॥
সবাকারে উদ্ধারিবেন গৌরাঙ্গসুন্দর।
ব্যতিরিক্ত বৈষ্ণবনিন্দুক দুরাচার॥
গর্হিত আচরণ যদি করেন মহা-অধিকারী।
নিন্দার আছুক দায় হাসিলেও মরি॥
কৃষ্ণের প্রকাশ হয় ত্রিবিধ প্রকার।
শাস্ত্র, শ্রীমূর্ত্তি আর ভক্ত-কলেবর॥
ইহাতে বিচারবুদ্ধি কভু না রাখিবে।
অবিচারে নিজভক্তি যাজন করিবে॥
শ্রীমূর্ত্তিতে নিবেদিত যে কিছু হইবে।
মহাপ্রসাদজ্ঞানে তাহা গ্রহণ করিবে॥
কৃষ্ণে নিবেদিত বস্তু প্রপঞ্চ দেখিলে।
অক্ষয় নরকে গতি হয় কালে কালে॥
স্পর্শদোষে কৃষ্ণপ্রসাদ নষ্ট নাহি হয়।
নষ্টদোষ ঘটাইলে নিজে নষ্ট হয়॥

জগৎ কৃষ্ণের প্রকাশ স্থাবর জঙ্গম।
এই তত্ত্ব জানি তাহে মজাইবে মন॥
কৃষ্ণস্তুতি বিনা অন্য ভাব নিরূপণ।
বিফল হইবে কাম নরকে গমন॥
গুরুরূপে কৃষ্ণকৃপা ভত্ত্বের অবধি।
তত্ত্ব নিরূপণ হ'লে ছাড় বেদবিধি॥
ভক্ত-পদরজ আর ভক্ত-পদজল।
ভক্তভুক্ত অবশেষ সাধনের বল॥
দীনাতিদীন হঞা করে নাম সংকীর্ত্তন।
অচিরাতে মিলে তারে কৃষ্ণ প্রেমধন॥
এ সব না জানে যে জন করে কৃষ্ণভক্তি।
কৃষ্ণকৃপা দূরে থাক্ নাহি তার গতি॥
এ সব করিলে যাজন অনর্থ নাশ হয়।
পাশমুক্ত হয়ে নিত্য বৃন্দাবনে যায়॥
নিত্যানন্দ প্রভু করেন হৃদয়ে বসতি।
নিরন্তর ঝুরে ভাবি যুগল-পিরীতি॥

বাবা, আর অধিক কি বলিব? যাহা শুনিলে, হৃদয়ে ধারণা করিয়া নিরপেক্ষ ভাবে সাধন করিয়া যাও। লোকাপেক্ষা করিতে গেলে প্রকৃত-তত্ত্বের উপলব্ধি হয় না।"

আমার আর ধৈর্য্য রহিল না; তাঁহার চরণতলে পতিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলাম, "প্রভো, এ দাসকে আর বঞ্চিত করিবেন না। শ্রীচরণে স্থান দিয়া চরণসেবার অনুমতি দিতে আজ্ঞা হয়।" ইহা শুনিয়া তিনি কৃপাপূর্ব্বক আমার মস্তকে চরণ দিয়া বলিলেন, "বাবা, সেবা অর্থ সুখ দেওয়া, অতএব সেবা করিতে হইলে যাহাতে আমার সুখ হয়, তাহাই করা

দরকার। আজকাল জগতে অনেক উপধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়া মহাপ্রভুর বিশুদ্ধ মত লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। যদি তুমি একটী জীবকেও সৎপথে আনিতে পার, তবে জানিবে,—সেবা অপেক্ষা আমার কোটিগুণ সুখলাভ হইবে। নিতাইচাঁদ এ অধমকে নিজবংশে জন্ম দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আমাদ্বারা তাঁহার আদেশ কিছুই পালন হইল না। তুমি যদি আমার হইয়া স্বয়ং প্রেমধর্ম্ম আচরণপূর্ব্বক জগতের জীবকে শিক্ষা দিতে পার এবং অবিচারে নামপ্রেম বিতরণ করিয়া কলিহত জীবের উদ্ধার করিতে সমর্থ হও, তাহা হইলে আমি কেন, পরমদয়াল নিতাইচাঁদও তোমার নিকট চিরদিনের জন্য বাঁধা থাকিবেন। আমি দিবানিশি নিতাইচাঁদের চরণে জানাইতেছি, তিনি যেন তোমাকে তাঁহার অলৌকিক শক্তি দান করেন।"

এই বলিয়া শ্রীগুরুদেব আমাকে প্রেমালিঙ্গন দিয়া কিঞ্চিৎ অধরামৃত দান করিলেন এবং তিন দিন নিকটে রাখিয়া নানাবিধ সদুপদেশ দানে কৃতার্থ করিয়া আমাকে বাঙ্গালায় আসিতে আদেশ করিলেন। শ্রীগুরু-আজ্ঞা শিরে ধারণ করিয়া তাঁহার শ্রীচরণে দণ্ডবৎ প্রণতিপূর্ব্বক আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "প্রভু, পুনরায় কখন এ দাসের ভাগ্যে আপনার শ্রীচরণদর্শন লাভ হইবে?" ইহা শুনিয়া তিনি ঈষৎ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তুমি আমাকে যখন স্মরণ করিবে, তখনই দেখা পাইবে।" শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখানিঃসৃত আশ্বাসবাণী শুনিয়া মনে মনে অত্যন্ত আশ্বস্ত হইলাম। তখন তাঁহার শ্রীচরণে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক জোনপুর গোমতী নদীতে স্নান করিয়া ক্রমে সেখান হইতে নৈমিষারণ্যে গমন করিলাম। সেখানে একটী মহাপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি কৃপা করিয়া একদিন আমাকে তাঁহার নিকটে রাখিলেন। এই মহাপুরুষ আমাকে এক অপূর্ব্ব বস্তু খাইতে দিয়া বলিলেন, "ইহা খাইলে তোমার তিন দিন ক্ষুধা বোধ হইবে না এবং অনাহারে তোমার শরীর দুর্ব্বল হইবে না।"

বাস্তবিক ঐ অপূর্ব্ব বস্তু আহার করায় তিন দিন পর্য্যন্ত আমার বোধ হইতে লাগিল, যেন এই এখনই উদর পরিপূর্ণ করিয়া ভোজন করিয়াছি।

নৈমিষারণ্য হইতে কাশীধাম আসিলাম। এখানে মণিকর্ণিকা ঘাটে স্নান করিয়া শ্রীবিশ্বেশ্বর এবং অন্নপূর্ণা দেবীর চরণ দর্শন পূর্ব্বক এক দিন তথায় বাস করতঃ একেবারে শ্রীবৃন্দাবনধামে গমন করিলাম। শ্রীধাম বৃন্দাবনে আট দিন অবস্থানপূর্ব্বক শ্রীবিগ্রহাদি দর্শন করিয়া শ্রীধাম নবদ্বীপ অভিমুখে যাত্রা করিলাম।"*

শিক্ষাগুরুপ্রাপ্তি

আজ শ্রীধাম নবদ্বীপে আবার নূতন আনন্দ। যাঁহার সহিত বড় বাবাজী মহাশয়ের দেখা হইতেছে, তিনিই অতিশয় আনন্দিতমনে ইঁহাকে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন। কেহ কেহ বা "রাজেন দাদা, কবে এলে ভাই? কেমন ছিলে, কোন্ বাসায় আছ ভাই?" ইত্যাদি নানা প্রশ্ন করিয়া আপ্যায়িত করিতেছেন এবং ইনিও সহাস্যবদনে যথাযোগ্য সাদর-সম্ভাষণে সকলকেই পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন। এই সময় একমূর্ত্তি বৈষ্ণব আসিয়া পুনঃপুনঃ ইহার মুখপানে চাহিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই চিনিতে না পারিয়া অগত্যা পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি বড় বাবাজী মহাশয়ের উত্তরে পূর্ব্ব পরিচয়ের কোন আভাস না পাইয়া একটু বিস্মিত হইলেন। তখন বড় বাবাজী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, আপনার কি নাম?"

বাবাজী। আমার নাম মাধব দাস।

বড় বাবাজী। আপনি কতদিন ভেক গ্রহণ করিয়াছেন?

---

* বড় বাবাজী মহাশয়ের স্বহস্তলিখিত খাতায় এই পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে।

মাধব। প্রায় পাঁচ ছয় মাস হইবে।

বড় বাবাজী। কোথায় আপনার গুরুস্থান ?

মাধব। এই যে বড়ালের বাড়ীর সম্মুখে। আসুন না, আমার গুরু-স্থান দেখিবেন।

বলিতে বলিতে দুইজনেই বড়ালের বাড়ীর সম্মুখে একখানি কাঁচা বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া দেখেন আন্দাজ পঁচাশি ছিয়াশি বৎসর বয়স্ক একটি গৌরবর্ণ খর্ব্বাকৃতি বৈষ্ণব বসিয়া মালা জপ করিতেছেন। মাধব দাস বাবাজী বলিলেন, "ইঁনিই আমার শিক্ষাগুরু ; ইঁহার নাম **শ্রীপাদ গৌরহরি দাস মহান্ত**।" এই বলিয়া তাঁহার চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। বড় বাবাজী মহাশয়ও বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয়কে প্রণাম করিলেন। ক্রমে দুই চারি দিন যায়,—একদিন কথাপ্রসঙ্গে উভয়েরই পূর্ব্ব পরিচয় প্রকাশ পাইল। তখন জানা গেল যে, উভয়ে উভয়ের বৈবাহিক। মাধব দাস বাবাজী মহাশয়ের পূর্ব্বতন নাম ছিল মথুরানাথ সেন। ইঁহারই আগ্রহে বড় বাবাজী মহাশয়ের ঐ বাড়ীতে থাকার ব্যবস্থা হইল।

বৃদ্ধ গৌরহরি দাস বাবাজী মহাশয়ের বাড়ীর সম্মুখস্থ ফাঁকা জায়গায় নানারূপ শাক-সবজি হইয়াছে। তাহার মধ্যে পাটশাকও আছে। বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয় অবকাশমতে ঐ পাটশাকের ক্ষেত পরিষ্কার করিতেছেন, এই সময় বড় বাবাজী মহাশয় ঐ রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন। বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয়কে ঐ অবস্থায় দেখিয়া ইনি একটু কটাক্ষ ভাবে বলিলেন, "বাবাজী মহাশয়, এই সব কাজই যদি করিতে হইবে, তবে সংসার ছাড়ার দরকার কি ?"

বৃদ্ধ বাবাজী। বাবা! সে মায়ার দাসত্ব, আর এ পরমপুরুষ ভগবানের কার্য্য।

বাবাজী। হ্যাঁ হ্যাঁ মহাশয়, ও কেবল স্তোভ বাক্য বৈ ত আর কিছুই নয়। লোহার শিকল বা সোনার শিকল দ্বারা বাঁধার ন্যায়। বন্ধনযাতনা ত একই রকম।

বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয় একটু তাপ পাইলেন; কিন্তু আর কোন কথা না বলিয়া পূর্ব্ববৎ সেবাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। ইনিও যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন। কিছু দূর যাইতে না যাইতেই ইহার হৃদয়ে প্রকৃত তত্ত্ব উদিত হইল এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "হায়! আমি ত বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয়ের কাছে অপরাধ করিয়াছি! যখন অভিমানের বশে বৃদ্ধ বৈষ্ণবকে অপমান করিলাম, তখন 'নিন্দাশূন্য নম্রভাবে সবারে স্তবন' এ কথা পালন হইল কৈ? তবে ত নিতাইদাস বলিয়া পরিচয় দেওয়া আমার ভুল হইতেছে। আমি ত এখনও ঘোর অভিমানী। যতক্ষণ অভিমান আছে, ততক্ষণ যাবতীয় ইন্দ্রিয়ই আমার প্রবল রহিয়াছে। তবে কি কেবল লোক-প্রতারণার জন্য আমি সংসার ছাড়িয়াছি? কৈ ছাড়িলাম কি? সবই ত পূর্ণমাত্রায় রহিল। তবে আমার উপায় কি? হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল "ভূমৌ স্খলিতপাদানাং ভূমিরেবাবলম্বনম্। ত্বয়ি জাতাপরাধানাং ত্বমেব শরণং প্রভো॥" আর যাওয়া হইল না। বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয়ের নিকট ফিরিয়া আসিলেন এবং তাঁহার চরণ ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "বাবা। আমি আপনার অবোধ সন্তান; আমি প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া অভিমানবশতঃ আপনার উপর কতকগুলি অযথা শ্লেষবাক্য প্রয়োগ করিয়াছি। আমার অপরাধ ক্ষমা করিতে হইবে।" ইত্যাদি নানারূপ বিনয়বাক্যে বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয়কে শান্ত করিলেন বটে; কিন্তু নিজের মন শান্ত হইল না। অবশেষে মাধব দাস বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ঐ বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয়ের নিকটই ভেক এবং শিক্ষা গ্রহণের মত করিলেন। বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয় চৈত্রসংক্রান্তির দিন ভেকের দিন ধার্য্য

করিয়া দিলেন। শুনিয়া ইঁহার মনে বড়ই আনন্দের উদয় হইল।

আজ মাসের ১৪ই তারিখ। আর মাত্র ষোল দিন বাকী আছে। বড় বাবাজী মহাশয় নিজের যা কিছু ছিল, সমস্তই ঐ আখড়াতে আনিলেন। ১৬ই চৈত্র প্রাতে নবদ্বীপ দাদা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সাক্ষাৎ হইবামাত্র উভয়ে উভয়কে ধরিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন। কিছুক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ স্থির হইয়া বহুদিনের সঞ্চিত সুখদুঃখের কথা বলাবলি করিতে লাগিলেন।

ক্রমে রাসমোহন আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। মহামায়া কাহাকেও পরীক্ষা করিতে ক্রটি করেন না। রাসমোহন তাহার মায়ের কিছু সোনার অলঙ্কার এবং দুইশত টাকা আনিয়া বাবাজী মহাশয়ের হাতে দিয়া বলিল, "আপনার যাহা ইচ্ছা করুন।" ইনি বিষম সমস্যায় পড়িলেন। একবার মনে করিতেছেন, বৈষ্ণবসেবা করিয়া দেওয়া যাক। আবার মনে করিতেছেন—না, মায়ার জিনিষ দিয়া বৈষ্ণবসেবা করার দরকার নাই। হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "ভাই, তোমার গুরুপাট কোথায়?" রাসমোহন বলিল, 'শ্রীপাট ভরতপুর।' বড় বাবাজী মহাশয় পরদিন প্রাতে রাসমোহনকে সঙ্গে লইয়া ভরতপুর যাত্রা করিলেন। তথায় গিয়া রাসমোহনের গুরুমাকে ঐ সমস্ত অলঙ্কার পরাইয়া দিলেন এবং ঐ দুইশত টাকা দ্বারা ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও দুঃখী কাঙ্গালীদিগকে পরিতৃপ্তভাবে ভোজন করাইয়া নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিলেন। নির্দ্ধারিত দিনের তিন দিন পূর্ব্বে ভেকগ্রহণে কি কি প্রয়োজন, জিজ্ঞাসা করায় বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয় যাহা যাহা দরকার বলিয়া দিলেন। প্রভুর কি অপার করুণা! কাহাকেও কিছু বলিতে হইল না। আপনা আপনি এক একজন কিছু কিছু করিয়া আনিয়া দিতে লাগিল। সকলেরই মনে এক অভিনব আনন্দের তরঙ্গ উঠিল। অনায়াসেই বৈষ্ণবসেবার সমস্ত দ্রব্য সংগৃহীত হইল।

ভেকের দিন প্রাতে বৈষ্ণব-পূজারীগণ রান্নার যোগাড় করিতে লাগিলেন। বেলা আন্দাজ দেড় প্রহরের সময় বড় বাবাজী মহাশয় বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন, "বাবা, আমি কিছুদিন পূর্ব্বে স্বপ্নে একটী মন্ত্র পাইয়াছি। যদি উপযুক্ত বোধ করেন তবে সেই মন্ত্রটীই আমাকে প্রদান করুন।" এই বলিয়া স্বপ্নলব্ধ মন্ত্রটী বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয়কে বলিলে তিনি হৃষ্টচিত্তে ঐ মন্ত্রটী ইঁহার কর্ণে প্রদানপূর্ব্বক ডোর কৌপীন দিয়া ভিক্ষা করিবার আদেশ করিলেন। নব অনুরাগী নবীন সন্ন্যাসী নাম করিতে করিতে যখন রাস্তায় ভিক্ষা করিতে বাহির হইলেন, তখন কাহার সাধ্য যে চোখের জল রাখে? সেই দীর্ঘাকার মুণ্ডিতমস্তক মহাপুরুষের অবিরতধারে দুটী চোখে ধারা বহিয়া যাইতেছে। আবালবৃদ্ধ-স্ত্রীপুরুষ যাহাকে দেখিতেছেন, তাহাকেই করযোড়ে গদগদকণ্ঠে বলিতেছেন "আপনারা আমায় দয়া করুন; আমি যেন অভিমানশূন্য হইয়া নিতাইদাসের দাস হইতে পারি। আমি জ্ঞাত-অজ্ঞাতসারে যত কিছু অপরাধ করিয়াছি, সকলে ক্ষমা ভিক্ষা দিয়া আমার মায়া বন্ধন ছিন্ন করিয়া দিন। আমি বৈষ্ণবাপরাধী। আপনাদের কৃপা ভিন্ন আর আমার গতি নাই।" প্রাণের আবেগে এইরূপ কতই কি বলিতেছেন। সে দৃশ্য দেখিয়া ও সে কথা শুনিয়া ঘোর পাষণ্ডও অস্থির হইয়া পড়িতেছে। সঙ্গে অনেক লোক, সকলেরই চোখে জল।

এইরূপে কিছুক্ষণ ভিক্ষা করিয়া যাহা হইল, আশ্রমে আসিয়া শ্রীগুরুদেবের নিকট সমর্পণপূর্ব্বক তাঁহার শ্রীচরণে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। গুরুদেব ইঁহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। গুরুদেবের স্পর্শে শিষ্যও কাঁদিয়া আকুল হইলেন। তদ্দর্শনে উপস্থিত গুরুমণ্ডলীও অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না। চারিদিকেই কান্নার রোল উঠিল। ক্ষণকাল পরে গুরুদেব উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন।

লীলাময়ের এ কি অপরূপ খেলা! যখন হাসির তরঙ্গ উত্থিত হইতেছে, তখন উহা চরম সীমায় যাইয়া পৌঁছিতেছে। আবার যখন কান্নার রোল উঠিতেছে, তখন উহাও সীমা অতিক্রম করিতেছে। ক্রমে সকলে স্থির হইলেন। যথাসময়ে মহোৎসব ব্যাপার বিরাটরূপে সম্পন্ন হইয়া গেল। গুরুদেব ইঁহার নাম রাখিলেন "শ্রীরাধারমণ চরণ দাস"। কিন্তু তিনি নিজে ইঁহাকে "যাদব দাস" বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহার অপূর্ব্ব বাৎসল্য; যাদব বলিতেই যেন অজ্ঞান; ইঁহাকে নিজ সন্তানবৎ স্নেহ করিতেন।

চৈতন্যদাসের সহিত মিলন

কয়েক দিন যায়, বড় বাবাজী মহাশয় একদিন মহাপ্রভুর দর্শনে গিয়া দেখেন যে, অতি সুন্দর গৌরবর্ণ আন্দাজ কুড়ি বৎসর বয়স্ক একটী বালক মহাপ্রভুকে লক্ষ্য করিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছে, "হে গৌর! তুমি না আমায় বাল্যকাল হইতে অঙ্গীকার করিয়াছ? তুমি না আমায় মৃত্যুর কবল হইতে বাঁচাইয়াছিলে? তুমি না আমায় সংসার-নরককুণ্ড হইতে তুলিয়া আনিলে? আমি ত চিরজীবনের মত তোমারই চরণে বিক্রীত হইয়াছি। এখন কিছু ব্যবস্থা করিতেছ না কেন? প্রভু হে, দয়া করিয়া আমায় এমন সৎসঙ্গ দাও, যাহাতে আমি সদ্ভাবে জীবনযাপন করতঃ তোমার শ্রীচরণলাভ করিতে পারি। কৈ? আমাকে স্বপ্নে যে সঙ্গের কথা বলিলে, যে লোক দেখাইলে, আমি ত অনেক খোঁজ করিলাম, সে মহাপুরুষের দেখা ত পাইলাম না! তবে কি আবার আমায় সেই মায়াকূপে ফেলাইবে?" এই বলিয়া চোখ মুছিতে

মুছিতে যেমন মুখ ফিরাইল, অমনি দেখে যে, সুদীর্ঘাকার একটী মহাপুরুষ পশ্চাদ্ভাগে দাঁড়াইয়া আছেন। দেখিবামাত্রই বালকটী একটু স্তম্ভিত হইয়া ঐ মহাপুরুষের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে অধৈর্য্য হইয়া উঁহার চরণতলে পতিত হইলে ইনি আস্তে ব্যস্তে তাঁহাকে তুলিয়া আলিঙ্গন করিলেন। বালকটী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "বাবা, আমি গত রাত্রে শান্তিপুরের নিকটে একটী গাছতলায় শুইয়া ব্যাকুলপ্রাণে মহাপ্রভুকে জানাইতেছিলাম যে, 'প্রভো! আমি ত বালক, যখন আমাকে কেশে ধরিয়া আনিয়াছ, তখন আমার একটা উপায় বিধান কর। শুনিয়াছি গুরুকরণ না হইলে তোমাকে পাওয়া যায় না। অমি ত ভালমন্দ কিছুই বুঝি না, যাহা হয় তুমি করিবে না কি?" ভাবিতে ভাবিতে ঘুম আসিল। শেষ রাত্রিতে স্বপ্নে দেখি, এই গৌরাঙ্গ প্রভু গিয়া আমাকে বলিলেন, "তোর চিন্তা কি? কাল আমার ওখানে দর্শন করিতে গেলে তোর গুরু মিলিবে এবং ঐ সময়েই তোর দীক্ষা হইবে। তোর গুরু 'রাজেন বাবু' বলিয়া নবদ্বীপে প্রসিদ্ধ।" এই বলিয়া মহাপ্রভু তাঁহার যেরূপ আকার প্রকার বর্ণনা করিলেন, আপনাকে দেখিয়া ঠিক সেই মহাপুরুষ বলিয়াই আমার বোধ হইতেছে। অতএব আর বিলম্ব না করিয়া আমার পশুজীবন উদ্ধার করুন।" বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "তোমার নাম কি চৈতন্যদাস? কাছাড় জেলায় তোমার বাড়ী? তোমার উপর মহাপ্রভুর অতিশয় কৃপা।" এই বলিয়া তাহার কর্ণে মন্ত্রপ্রদান করিলেন। এই চৈতন্যদাস হইতেই গোপীভাবে শ্রীরাধাকৃষ্ণ-উপাসনার প্রণালী প্রকাশ পাইয়াছিল। সেইদিন হইতেই চৈতন্যদাস বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে সঙ্গে রহিল। ক্রমে রাধাবিনোদ দাস ও কিশোরী-গোপাল দাস প্রভৃতি আসিয়া ইহাদের সঙ্গে মিলিত হইতে লাগিল।

কুকুরের মহোৎসব

একদিন বাবাজী মহাশয় সদলে সংকীর্ত্তন লইয়া মহাপ্রভুর বাড়ী গমন করিলেন। বহুক্ষণ কীর্ত্তনের পর সে স্থান হইতে যেমন বাহির হইলেন, অমনি একটী মেয়েকুকুর ইঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিল। ইঁহারা যে যে স্থানে দাঁড়াইয়া কীর্ত্তন করিতেছেন, সকলে চলিয়া যাওয়ার পর সেই সেই স্থানে ঐ কুকুরটী গড়াগড়ি দিতেছে দেখিয়া সকলেরই উহার প্রতি ভক্তি জন্মিল। কুকুরটী আর ইঁহাদের সঙ্গ ছাড়িল না। সেই হইতে সকলেই উহাকে 'ভক্তি মা' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। উহার এরূপ প্রকৃতি হইল যে, দেখিলে ঠিক যেন মূর্ত্তিমতী ভক্তি বলিয়াই মনে হইত। কেহ কিছু অনিবেদিত বস্তু আনিয়া দিলে ভক্তি মা উহা গ্রহণ করিতেন না। কেহ কখনও অন্য কুকুরের সহিত ভক্তিমার ঝগড়া শুনে নাই। অন্য বৈষ্ণবকে যেরূপ খাইতে দেওয়া হয়, ভক্তিমাকেও সেইরূপ পারশ করিয়া দেওয়া হইত। কিছুদিন পরে ভক্তিমার শরীর অসুস্থ হইল। তখন সকলে কায়মনোবাক্যে ভক্তিমার সেবা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে দুই চারিদিন যায়, ভক্তিমা ক্রমশঃই দুর্ব্বল হইতে লাগিলেন। অবশেষে একদিন ভক্তিমার অন্তিমকাল উপস্থিত বুঝিতে পারিয়া সকলে উহার চারিদিকে খোলকরতালযোগে নামসংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ভক্তিমা নাম শুনিতে শুনিতে শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম লাভ করিলেন। সকলেই নাম করিতেছেন, আর ঠিক মাতৃহীন বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে অঝোরে ঝুরিয়া কাঁদিতেছেন। কীর্ত্তন করিতে করিতে ভক্তিমার চিন্ময় দেহটী পুণ্যসলিলা পতিতপাবনী জাহ্নবীদেবীর জলে সমাধি দেওয়া হইল।

তিনদিন অতীত হইলে চতুর্থ দিবসে ভক্তিমার চিড়ামহোৎসব সম্পন্ন হইয়া গেল। বাবাজী মহাশয়ের মনে বড়ই বাসনা হইল যে, ভক্তিমার মহোৎসবে কিছু বৈষ্ণবসেবা করান হয়। ক্রমে সেইরূপ যোগাড় হইতে লাগিল। চতুর্দ্দশ দিবসে বড় আখড়ার দলের বৈষ্ণবদিগকে ভক্তিমার তিরোভাব উপলক্ষে তৎপরদিবস মহোৎসব করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হইল।

ঐদিন অপরাহ্নে বাবাজী মহাশয় বসিয়া আছেন, হঠাৎ ইঁহার মনে কি এক খেয়াল উদয় হইল। সঙ্গিগণকে বলিলেন, "দেখ, ভক্তিমার স্বজাতি কয়েকমূর্ত্তি বৈষ্ণব নিমন্ত্রণ না করিলে ভাল দেখায় না। তোমরা একজন নবদ্বীপের পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আইস। বাবাজী মহাশয়ের মুখে এইরূপ বিস্ময়জনক প্রস্তাব শ্রবণে সকলেই অবাক্ হইয়া বসিয়া রহিলেন। তখন সুদৃঢ় বিশ্বাসী গুরুবাক্যৈকনিষ্ঠ নবদ্বীপ দাদা উঠিয়া বলিলেন, "কিরূপে কি বলিতে হইবে বলিয়া দিন।" বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "স্ত্রী কিংবা পুরুষ কুকুর দেখিবামাত্র গলায় কাপড় দিয়া সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করতঃ করযোড়ে বলিবে, "আমাদের ভক্তিমা দেহ রাখিয়াছেন, আগামী কল্য তাঁহার মহোৎসব হইবে। আপনারা অনুগ্রহ-পূর্ব্বক সবান্ধবে বড়ালঘাটের নিকট আমাদের পরম গুরুদেবের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া মধ্যাহ্নে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিবেন।" তখন নবদ্বীপ দাদা বাবাজী মহাশয়ের চরণ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ইনিও বামহস্তে তাঁহার পিঠের উপর একটী চাপড় মারিয়া তুলিয়া দিলেন। তখন তিনি মত্ত মাতালের ন্যায় টলিতে টলিতে গমন করিলেন। তখনকার সেই অবস্থায় তাঁহাকে যে-ই দূর হইতে দেখিতেছে, সে-ই মনে করিতেছে, হয়ত ইনি বদ্ধ পাগল, না হয় ত মত্ত মাতাল; কিন্তু আবার কাছে আসিয়া ইঁহার মুখপানে তাকাইলে তাহার মনে হইতেছে যে, ইনি একজন মহা-শক্তিসম্পন্ন জ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষ। তিনি কিন্তু যেন এ জগতে নাই।

তিনি যেখানেই একটী কুকুর দেখিতেছেন, সেইখানেই দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক গললগ্নীকৃতবাসে সাশ্রুনয়নে বলিতেছেন, "আমার গুরুদেব আপনাদিগকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য আমায় পাঠাইয়াছেন। আগামী কল্য আমাদের ভক্তিমায়ের দিবসী মহোৎসব হইবে। ঐ উপলক্ষে আপনারা সবান্ধবে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদের পরম গুরুদেবের আশ্রমে গমন করিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিবেন এবং আপনাদের স্বজাতি অন্যান্য যাঁহাদের সঙ্গে আপনার দেখা হইবে, তাঁহাদিগকেও এই নিমন্ত্রণটী দিয়া আমাদিগকে চিরবাধিত করিবেন।" এইরূপে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া রাত্রি অনুমান এক প্রহরের সময় আশ্রমে ফিরিলেন।

পূর্ব্ব হইতেই বড় বাবাজী মহাশয় কাষ্ঠাধারী আখড়ায় সঙ্গিগণের থাকিবার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। ইনি কখনও গুরুদেবের আশ্রমে কখনও বা সঙ্গীদের সঙ্গে বাস করিতেন। নবদ্বীপ দাদা যথাযথ বৃত্তান্ত বাবাজী মহাশয়ের নিকট বলিয়া সকলের সঙ্গে কাষ্ঠাধারী আখড়ায় চলিয়া গেলেন। প্রাতঃকালে বৈষ্ণবপূজারীগণ আসিয়া রান্না আরম্ভ করিলেন। বেলা দ্বিপ্রহরের মধ্যে রান্না শেষ হইলে বৈষ্ণবদিগকে ডাকা হইল। দুই চারি মূর্ত্তি আসিতেছেন, এমন সময় একজন লোক বলিল, "বাবাজী মহাশয়! আপনারা বৈষ্ণব; কুকুরের মহোৎসবে খাওয়া আপনাদের পক্ষে সঙ্গত হয় না।" ক্রমে ক্রমে এই কথাটা পাকিয়া গেল; তখন সকলেরই অমত হইল। ডাকের পর ডাক হইতেছে, তবুও বৈষ্ণবগণ আসিতেছেন না দেখিয়া একজন পূজারী এবং বাবাজী মহাশয় নিজে বড় আখড়ায় গেলেন। তখন বড় আখড়ার মহান্ত স্পষ্ট করিয়াই বলিলেন, "দেখুন বাবা! কুকুরের মহোৎসব হইবে, ইহা ত আমরা জানি না; এ মহোৎসবে গেলে আমাদের বড়ই অপমান হইবে। অতএব আপনি অন্যান্য লোকদিগকে খাওয়াইয়া দিন, আমাদের যাওয়া হইবে না।"

বাবাজী মহাশয় অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া বলিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই যখন তাঁহাদিগকে রাজি করিতে পারিলেন না, তখন লীলাময় নিতাইচাঁদের কি এক খেলা খেলিবার ইচ্ছা হইয়াছে বুঝিয়া আনন্দিত চিত্তেই আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ক্রমে এই ঘটনা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। জগদ্বন্ধু চট্টোপাধ্যায় নামক নবদ্বীপনিবাসী বিশেষ সম্ভ্রান্ত জনৈক ভদ্রলোক বড়ালবাড়ীতে থাকিতেন। তাঁহার কাঠের গোলা ছিল। তিনি এই ঘটনা শুনিয়া বলিলেন, "আমি মহান্তের উপর ক্ষতিপূরণের দাবী করিব।" বাবাজী মহাশয় তাঁহাকে বিনীতভাবে বলিলেন, "বাবা, মঙ্গলময়ের যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে। কোন প্রতিবাদ করার প্রয়োজন নাই।" এদিকে যাঁহারা উপস্থিত হইতেছেন, তাঁহাদিগকেই মহাপ্রসাদ দেওয়া হইতেছে। বাবাজী মহাশয় নবদ্বীপ দাদাকে বলিলেন, "হ্যাঁরে, ভক্তিমায়ের স্বজাতি বৈষ্ণব এখনও কেহ আসিলেন না কেন?" নবাগত সঙ্গিগণ মনে করিতেছেন, "বাবাজী মহাশয়ের এ আবার কি খেলা? এ কি কখনও সম্ভব হয়? পশুজাতি সাঙ্কেতিক কথা দুই একটা বুঝে, তাই বলিয়া কি তাহারা নিমন্ত্রণ খাইতে আসিবে? যেমন ক্রিয়া কর্ম্মের বাড়ীতে কুকুর আসে, বরং সেইরূপ দুই চারিটী আসিতে পারে।" কিন্তু যাঁহারা ইঁহার অলৌকিক প্রভাবজ্ঞ পুরাতন সঙ্গী; তাঁহারা বলিতেছেন, "যখন বাবাজী মহাশয়ের মনে উদয় হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই আসিবে।"

এই সময় রাধেশ্যাম বাবা * আসিয়া উপস্থিত হইলে বাবাজী মহাশয় তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে তিনি বলিতে লাগিলেন, "বাবা, তোর এক এক কাণ্ড দেখিয়া যে আমি অস্থির। কোথা হইতে যে এক কুকুরের

* ইঁহার প্রকৃত নাম রামলাল মিত্র। ইঁহাকে রাধেশ্যাম বাবা বলিয়াই সকলে ডাকিয়া থাকে।

মহোৎসব সৃষ্টি করিলি! আমি মনে করিলাম, যাহা হউক, বৈষ্ণবসেবা ত হইবে; কিন্তু তাহাও হইল না, নানারূপ গোলযোগ উপস্থিত হইল। তার পর আবার কি এক কুকুরের নিমন্ত্রণ হুযুগ তুলিয়াছিস্? এত বুজরুকি করা কেন বাবা? যাহা কেউ কখনও করে নাই, তাহা করিতে গিয়া লোকের কাছে হাস্যাস্পদ হওয়া বই ত আর কিছুই নয়! তোদের না হয় নিন্দাস্তুতি সমান জ্ঞান হইয়াছে, আমাদের ত বাবা, তোদের একটু কিছু শুনিলে প্রাণে বড়ই ব্যথা লাগে।" বাবাজী মহাশয় করযোড়ে বলিলেন, "বাবা! আমি এসব কিছুই জানি না, ঐ আপনার পাগল ছেলেপিলে কি করিতে কি করিয়া ফেলে। ও সব কথায় আপনি কান দিবেন না।" রাধেশ্যাম বাবা একটু ক্রোধের সহিত বলিলেন, "এমন অবোধ ছেলেপিলে কাছে রাখা উচিত নয়। এখন যে কুকুর না দেখিয়া সকলে তোমার গায়ে ধুলা দিবে, তাহা কে রাখিবে?" বাবাজী মহাশয় একটু ক্ষুব্ধভাবে বলিলেন, "কেন বাবা! আপনারা না বলিয়া থাকেন, প্রভু সর্ব্ব ঘটে বিরাজ করেন। কুকুরের ঘটে কি তিনি থাকিতে পারেন না? প্রহ্লাদ যদি স্ফটিকস্তম্ভ হইতে নরসিংহমূর্ত্তি প্রকট করিতে পারেন, তবে কি সচেতন জঙ্গমদেহ হইতে এই সামান্য কার্য্য হইবে না? আমাদের এই অবিশ্বাসই সর্ব্বনাশের মূল। আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি, যদি 'নিতাইচাঁদ সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন', একথা সত্য হয়, তবে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আপনি দেখিবেন, এই কুকুরদ্বারা রঙ্গিয়া নিতাই জগদ্বাসীকে এক অপূর্ব্ব রঙ্গ দেখাইবেন।"

এদিকে বেলা অবসানপ্রায়, এই সময় এক একটী করিয়া কুকুর আসিতে লাগিল। বাবাজী মহাশয় যেমন দেখিতে পাইলেন, অমনি আস্তেব্যস্তে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বড়ালবাড়ীর সম্মুখস্থ রাস্তার উপর উঁহাদের বসিবার ব্যবস্থা করিয়া দিতে লাগিলেন। ক্রমে কুকুরের

সংখ্যাও বাড়িতে লাগিল, দর্শক লোকের সংখ্যাও বাড়িতে লাগিল। সকলেই কিন্তু বিস্ময়ান্বিত। এ কি আশ্চর্য্য! দলে দলে কুকুর আসিয়া সারি সারি বসিয়া যাইতেছে, কাহারও মুখে রা নাই। দুইটী কুকুর একত্র হইলে ঝগড়া হয়, এটী চিরপ্রসিদ্ধ; কিন্তু আজ এ কি এক নূতন ব্যাপার! ক্রমে পঞ্চাশ ষাট্‌টী কুকুর উপস্থিত হইল। রাস্তার দুইপার্শ্বে বহু লোক দাঁড়াইয়া এই অলৌকিক ব্যাপার দর্শন করিতেছেন। বাবাজী মহাশয় গললগ্নীকৃতবাসে আরক্তিম সজল নয়নে বিনীতভাবে উপস্থিত কুকুরদিগকে বলিলেন, "আজ্ঞা হয় ত পাতা দিই। পরে যাঁহারা আসিবেন, তাঁহাদের ব্যবস্থা পরে করা যাইবে।" সকলেই উর্দ্ধমুখে ইঁহার মুখপানে তাকাইয়া রহিল, না জানি অব্যক্ত ভাষায় তাঁহারা কি বলিলেন, তাহা ঐ মহাপুরুষই বুঝিয়া পাতা দিবার ব্যবস্থা করিলেন এবং বড় গামলা করিয়া ডা'ল, তরকারী, অন্ন, দধি, পায়স প্রভৃতি যাবতীয় দ্রব্য একত্রে মাখিয়া পরিবেশন করিতে বলিলেন। তাহাই করা হইল। গগনভেদী হরিধ্বনি এবং প্রাণমাতান উলুধ্বনিতে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইল। সকলেই দেখিয়া অবাক্। পাতায় মহাপ্রসাদ দেওয়া হইল; কিন্তু কেহই মুখ দিতেছেন না। সকল পাতায় পরিবেশন শেষ হইলে বাবাজী মহাশয় সাশ্রুনয়নে গদগদকণ্ঠে করযোড়ে বলিলেন, "আপনাদের তবে বসিতে আজ্ঞা হউক।" বলিবামাত্র একটী কালরঙ্গের কুকুর আসিয়া সকলের পাতার মহাপ্রসাদের আঘ্রাণ লইয়া গেল। তখন সকলেই মহাপ্রসাদ পাইতে আরম্ভ করিলেন। হরিধ্বনি এবং উলুধ্বনিতে সেই স্থান যেন কম্পিত হইতে লাগিল। চারিজন পরিবেষ্টা যে যে পাতায় প্রসাদ শেষ হইয়া যাইতেছে, সেই সেই পাতায় প্রসাদ দিতেছেন। এক একটী নূতন কুকুর আসিতেছে, আর নূতন পাতা দেওয়া হইতেছে। লোকে লোকারণ্য। যত কিছু কোলাহল লোক-মুখে; কিন্তু কুকুরের মুখের একটী শব্দও কেহ শুনিতে পাইতেছেন না।

নবাগত সঙ্গিগণ এই ব্যাপার দেখিয়া নিজেদের সংকীর্ণ বিচারবুদ্ধিকে ধিক্কারপূর্ব্বক অবিরতধারে অশ্রুবিসর্জ্জন করতঃ আত্মহারাভাবে নাচিতেছেন। মানবের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগোচর, অতিশয় বিস্ময়সূচক এই ঘটনাটী দেখিয়া উপস্থিত দর্শকবৃন্দের তাৎকালিক অবস্থা একবার ভাবিয়া দেখিলে বোধ হয় হয় সকলেই স্বীকার করিবেন যে, উহা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

আজ আমরা কাহার জয় দিব? ভক্তিমায়ের? না তাঁহার প্রিয় পুত্র বাবাজী মহাশয়ের, কি উপস্থিত কুক্কুরবেশী মহাপুরুষদিগের, বা গুরুবাক্যৈকনিষ্ঠ দৃঢ়বিশ্বাসী নবদ্বীপের, কিংবা লীলাময় নিতাচাঁদের, অথবা উপস্থিত দর্শক ভক্তবৃন্দের? আমার মতে কিন্তু ভক্তবৃন্দেরই জয় দেওয়া উচিত; কারণ ঐশ্বর্য্যবিকাশ বহু বহু স্থলে বহু বহু ব্যাপারে হইতে পারে; কিন্তু দর্শন ত আর সকলের ভাগ্যে ঘটে না। কেহ কেহ উচ্চকণ্ঠে বলিতেছেন, "ধন্য বাবাজী মহাশয়! ধন্য শক্তি! এরূপ অদ্ভুতলীলা দেখা ত দূরের কথা, আমরা কখন শুনিও নাই। এ কি মানুষে সম্ভবে?" কেহ কেহ বা ঐ কুকুরের পঙ্গতের মধ্যে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া তাঁহাদের নিকট ভক্তি প্রার্থনা করিতেছেন। পরিবেশকগণ প্রত্যেকের সম্মুখে মহাপ্রসাদ যাচিয়া বেড়াইতেছেন। যাঁহার ভোজন শেষ হইয়া যাইতেছে, তিনিই অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বসিতেছেন। তাঁহার পাতায় প্রসাদ দিতে গেলে আরও মুখ ফিরাইয়া অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। ক্রমে এক একটী মাটির গ্লাসে করিয়া জল দেওয়া হইলে সকলেই স্বেচ্ছাপূর্ব্বক জল পান করিলেন।

এইরূপে পঙ্গত শেষ হইয়া গেলে বাবাজী মহাশয় অধরামৃত তুলিবার জন্য একজনকে আদেশ করিলেন। এদিকে নবদ্বীপ দাদা একটী বাটিতে জল লইয়া সকলের চরণামৃত নিতে লাগিলেন। কুক্কুরবেশী বৈষ্ণবগণ যেন চিত্রপুত্তলিকাবৎ বসিয়া আছেন। বাবাজী মহাশয় পূর্ব্ববৎ করযোড়ে

দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক বলিলেন, "আপনাদের যদি উদর পূরণ হইয়া থাকে, তবে এ দাসের ত্রুটি মার্জ্জনাপূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিতে আজ্ঞা হউক।" অমনি চারিদিকে হরিহরিধ্বনি ও উলুউলুধ্বনি হইতে লাগিল। উপস্থিত দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে প্রায় সকলেই অতি আগ্রহের সহিত ঐ অধরামৃত ও চরণামৃত গ্রহণ করিলেন। সন্ধ্যাদেবীও যেন এই মনোহারিণী আশ্চর্য্যময়ী লীলা দর্শন করিবার মানসে সদলবলে আসিয়া নিজ অধিকার বিস্তার করিতে লাগিলেন। বাবাজী মহাশয় আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। আনন্দে অধীর হইয়া সেই সব প্রসাদী পত্রের উপর গড়াগড়ি দিয়া এপাশ হইতে ওপাশ যাইতে লাগিলেন। ক্রমে সেই সব পাতা যে কোথায় গেল ঠিক রহিল না। পঙ্গতের স্থান আর কাহাকেও পরিষ্কার করিতে হইল না। ভক্তগণ গড়াগড়ি দিয়াই পরিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। স্বেচ্ছাসত্ত্বেও লোকাপেক্ষী অনেক মহাত্মাগণ সান্ধ্যতমোরাশিতে গা ঢাকিয়া মহাপ্রসাদ পাইতে লাগিলেন। কেহ কেহ বা উত্তরীয় বা বস্ত্রাঞ্চলে আচ্ছাদন করিয়া কিছু কিছু মহাপ্রসাদ বাড়ীতে লইয়া যাইতে লাগিলেন। হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার! মহা আনন্দকোলাহল উঠিল। রাধেশ্যাম বাবা কাঁদিতে কাঁদিতে বাবাজী মহাশয়কে আলিঙ্গন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "বাবা, তোর যে নিতাইর উপর এত দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে, ইহা ত আমি পূর্ব্বে জানি নাই। ধন্য বাবা, তোর শক্তি! চারিদিকে লোকমুখে তোর এই অলৌকিক শক্তির প্রশংসা শুনিয়া আমি যে কতদূর আনন্দ পাইতেছি, তাহা আর কি বলিব! আশীর্ব্বাদ করি, তোদের এইরূপ সুযশ দিন দিন শত গুণ বৃদ্ধি পাউক।" বলিতে বলিতে তাঁহার অঙ্গ পুলকিত হইল—চোখে জল আসিল। বাবাজী মহাশয় সগণে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তিনিও আশীর্ব্বাদ করিয়া কিঞ্চিৎ বৈষ্ণব-অধরামৃত গ্রহণপূর্ব্বক গমন করিলেন। তখন সমস্ত বৈষ্ণব-অধরামৃত একত্র করিয়া ভক্তিমাকে সমর্পণ-

পূর্ব্বক ভক্তিমায়ের অবশিষ্ট প্রসাদ ইঁহারা সকলে বাঁটিয়া খাইলেন।

আনন্দের সময়টা যেন শীঘ্রই চলিয়া যায়। দেখিতে দেখিতে রাত্রি প্রায় দেড়প্রহর হইল। বাবাজী মহাশয় সঙ্গিগণসঙ্গে গঙ্গাস্নান করিয়া একটি গৃহে বিশ্রাম করিতেছেন, এই সময়ে চৈতন্যদাস অপর একটী গৃহ হইতে ডাকিয়া বলিল, "গুরুদেব! ঠাকুরের ভোগের একটী পায়শ ধরা রহিয়াছে, আমরা কেহই দেখি নাই। এত রাত্রে কেহ ক্ষুধার্ত্তও নাই। এ মহাপ্রসাদ কি করা হইবে?" তখন বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "গঙ্গাস্নান করিতে করিতে হঠাৎ আমার মনে হইল, যেন নিমন্ত্রিত কোন মহাত্মা আসিয়া উপস্থিত হইতে পারেন নাই। যদ্যপি তিনি রাত্রে আসিয়া উপস্থিত হন, তবে কি দিয়া তাঁহাকে সেবা করান হইবে।" যাক, যখন নিতাইচাঁদ প্রসাদ রাখিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই কোন নিমন্ত্রিত মহাত্মা অনুপস্থিত আছেন। মহাপ্রসাদ ঐরূপভাবেই রাখিয়া দাও।" কিছুক্ষণ পরে বাবাজী মহাশয় যেমন ঘর হইতে বাহিরে যাইবেন, অমনি দেখেন যে, একটী লালরঙ্গের কুকুর ঐ গৃহের দ্বারদেশে শুইয়া আছে। ইঁহাকে দেখিবামাত্র কুকুরটী সসম্ভ্রমে উঠিয়া ইঁহার মুখপানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। তখন ইনি চৈতন্যকে ডাকিয়া বলিলেন, "এই যে একজন মহাত্মা উপস্থিত হইয়াছেন। ইঁহাকে ঐ পায়শ একত্রে মাখিয়া একখানি পাতায় দাও।" বাবাজী মহাশয়ের আদেশানুসারে চৈতন্যদাস একখানি পাতায় করিয়া উঁহাকে মহাপ্রসাদ দিলেন। নবদ্বীপ দাদা ঐ কুকুরটাকে দেখিবামাত্র বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে বলিয়া উঠিলেন, "কি আশ্চর্য্য! সর্ব্বপ্রথমে ইঁহার সঙ্গেই আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ইঁহার এত বিলম্ব হইবার কারণ কি?" বাবাজী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ইঁহাকে কি বলিয়া নিমন্ত্রণ করিয়াছিলে?" নবদ্বীপ দাদা বলিলেন, "আমি ইঁহাকে দেখিবামাত্র সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎপূর্ব্বক বলিয়াছিলাম, "আগামী কল্য ভক্তিমায়ের মহোৎসবে

হইবে ; অতএব আপনারা সবান্ধবে বড়ালবাড়ীর সম্মুখস্থ আমাদের পরম গুরুদেবের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিবেন। এবং আপনাদের স্বজাতি যাঁহার সহিত আপনার দেখা হইবে, তাঁহাকেও এই নিমন্ত্রণ দিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন।" বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "তবে ত ঠিকই হইয়াছে। ইঁহার উপর যখন নিমন্ত্রণের ভার অর্পণ করা হইয়াছিল, তখন ইনি সাধ্যানুসারে সকলের অনুসন্ধান করিয়া আসিয়াছেন ; কাজেই বিলম্ব হইয়াছে। ভ্রমাত্মক জীব আমাদের ভ্রম হইলেও অন্তর্য্যামী নিতাইচাঁদ পূর্ব্ব হইতেই ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। ধন্য তাঁহার করুণা !"

এদিকে ঐ কুক্কুরবেশী মহাপুরুষটী পরিতৃপ্তভাবে ভোজন করিয়া চলিয়া গেলে ইঁহারাও তাঁহার অধরামৃত গ্রহণপূর্ব্বক বিশ্রাম করিলেন।

দশহরায় কালী বাবুর সহিত মিলন

আজ গঙ্গাতীর লোকে লোকারণ্য। পূর্ববঙ্গবাসী যাত্রিকগণের কোলাহল, উলুধ্বনি এবং বাউল সম্প্রদায় বৈষ্ণবগণের গানের শব্দে দিগ্মণ্ডল মুখরিত। বাবাজী মহাশয়ও সদলে কীর্ত্তনে বাহির হইয়াছেন। আজ আর একটী নূতন ধরণের নূতন পদ ধরিয়াছেন :—

গীত

জয় জয় শ্রীচৈতন্য ॥
জয় জয় শব্দ হ'ল ন'দেপুরে,
জয় গৌরাঙ্গ নাম বলে ঘরে ঘরে,
কেহ গঙ্গাতীরে কেহ গঙ্গানীরে
সঘনে বলিছে শ্রীচৈতন্য ॥
অধন্য কলিরে ধন্য করিবারে,
নিতাই চৈতন্য নদীয়া নগরে,
প্রেমের হিল্লোলে ভাসা'লে সকলে
(বসি নীলাচলে ভাসা'লে সকলে)
(আজ) প্রেমে পরিপূর্ণ সবার হৃদয় ॥
জয় গৌরাঙ্গ ব'লে যাব ব্রজপুরে,
ন'দের চাঁদ আমায় নিবেন কেশে ধ'রে,
অধম চরণেরে রেখো নাকো দূরে,
প্রাণ সঁপিলাম ঐ রাঙ্গা পায় ॥

বহুক্ষণ কীর্ত্তনানন্দের পর কীর্ত্তন সমাপ্তি করিয়া সকলে প্রেমানন্দে নাচিতে নাচিতে গঙ্গায় অবগাহন করিলেন। স্নানান্তে যেমন তীরে

উঠিলেন, অমনি একটী গৌরবর্ণ মহাপুরুষ আসিয়া ইঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। আগন্তুক মহাপুরুষের মস্তকে দীর্ঘকেশ, পরিধানে গৈরিক বসন, আঁখি দুইটী ঢুলু ঢুলু। উঁহার নাম শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ ভারতী। বাবাজী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ মাত্রই উভয়ে প্রেমালিঙ্গন করিয়া কীর্ত্তনানন্দে নৃত্য করিতে করিতে সঙ্গিগণসহ আশ্রমে প্রবেশ করিলেন।

বাবাজী মহাশয় শেষ রাত্রে নবদ্বীপ এবং চৈতন্যদাসকে নাম করিতে করিতে নগরভ্রমণ করিয়া আসিবার আদেশ করিলেন। তাঁহারা দুইজনে "ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে" এই পদ গাহিতে গাহিতে যেমন চারিচরা পাড়ায় গিয়া উপস্থিত হইলেন, অমনি একটী গৌরবর্ণ দীর্ঘাকার ব্রাহ্মণ বাড়ীর বাহিরে আসিয়া উঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কোথায় থাক? তোমাদের সঙ্গে আর কে আছে?" নবদ্বীপ দাদা বলিলেন, "আমাদের সঙ্গে আর দুই একটী গুরুভাই আছেন; আমরা শ্রীশ্রীগুরুদেবের সঙ্গে প্রায় সময়ই কাম্বাধারী আখড়ায় থাকি।" এই বলিয়া আবার নাম করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত উঁহাদিগকে দেখা গেল এবং নাম শুনা গেল, ততক্ষণ বাবুটী যেন মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় উঁহাদের পানে তাকাইয়া রহিলেন। উঁহারা অদৃশ্য হইলে বাবুটী বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ইনি ব্রজলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মধ্যম পুত্র। ইঁহার নাম কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়; কৃষ্ণনগরে মোক্তারী করেন। বেলা অনুমান ছয়দণ্ডের সময় তাঁহার একটী সম্পর্কীয় ভাইকে বলিলেন, "দেখ অনুকূল, নবদ্বীপে একটী নূতন সাধু আসিয়াছেন; চল, তাঁহাকে খুঁজিতে হইবে।" বলিয়া উভয়ে কাম্বাধারীর আখড়া হইয়া গঙ্গার ধারে ধারে বহুক্ষণ অন্বেষণ করিলেন; কিন্তু কোন সাধুর অনুসন্ধান না পাইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। পুনর্ব্বার অপরাহ্নে একাকী সাধুর

অন্বেষণে বাহির হইয়া কাষ্ঠাধারী আখড়ায় উপস্থিত হইবামাত্র দেখেন যে, একটী মহাপুরুষ বসিয়া আছেন। কালীবাবুকে দেখিবামাত্র মহাপুরুষ উঠিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক বসিতে আসন দিলেন। তখন কালীবাবু বলিলেন, "দেখুন, গতরাত্রে আমি স্বপ্নে দেখিলাম যে, শ্রীবাস-অঙ্গনে মহাসংকীর্ত্তন হইতেছে এবং একটী মহাপুরুষ নৃত্য করিতেছেন। সে যে কি অপরূপ নৃত্যভঙ্গি, তাহা আর কি বলিব! নৃত্যকালীন মহাপুরুষের সর্ব্বাঙ্গ হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় তেজ বাহির হইতেছে। উপস্থিত দর্শক ভক্তগণ আত্মহারা—আনন্দে বিভোর। সকলেই মহাপুরুষটির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছেন। আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছি যে, সেই মহাপুরুষ এবং আপনার আকারে কোনও পার্থক্য নাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আপনিই সেই মহাপুরুষ। বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "জয় নিতাই, জয় নিতাই! আমি ভাই মহাপুরুষ টুরুষ কিছুই নই; বরং কাপুরুষ হইতে পারি। তবে আপনার প্রতি নিতাইচাঁদের অপার করুণা; তাই তিনি শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ভুবনমোহন নৃত্য দেখাইয়াছেন। পর্ব্বতের ভার পিপীলিকার উপর চাপান কেন ভাই?" ইত্যাদি নানাকথায় অনেক সময় কাটিয়া গেল।

বাবাজী মহাশয় রাত্রে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। সকলেই উন্মত্ত। নবাগত কালীবাবুও প্রেমে বিভোর হইয়া চিত্রপুত্তলিকাবৎ সেই মনোমুগ্ধকর মধুর কীর্ত্তনপদাবলীশ্রবণে এবং কীর্ত্তনের ভাবে অদ্ভুত নৃত্যদর্শনে মোহিত হইতেছেন আর বলিতেছেন, "আমি কোথায় আছি? স্বর্গে কি মর্ত্তে, বৃন্দাবনে কি বৈকুণ্ঠে, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। এ জাতীয় আনন্দ যে পার্থিব হইতে পারে না, এ ধ্রুব সত্য। ইহা নিশ্চয়ই অপ্রাকৃত চিন্ময় আনন্দ।" বলিতে বলিতে কালীবাবু এক একবার প্রেমাবেশে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িতেছেন। তাঁহার তাৎকালিক অবস্থা

লেখনীতে প্রকাশ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। যিনি অনুভব করিয়াছেন বা করিতে জানেন, তিনিই অনুভবে বুঝিবেন যে, কালীবাবু আজ কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে নিমগ্ন হইয়াছেন! এই দিন হইতেই কালীবাবু বাবাজী মহাশয়ের ছোট ভাই হইলেন। কালীবাবু সখ্যরসের ব্যবহার বড়ই ভালবাসেন। সখ্যভাবটী যেন তাঁহার সহজাত। হঠাৎ তাঁহার ব্যবহার দেখিলে কেহ তাঁহাকে নাস্তিক, কেহ বা ব্রাহ্ম এইরূপ মনে করিতে পারেন; কিন্তু যিনি অন্ততঃ কিঞ্চিৎ কাল তাঁহার সঙ্গে কথোপকথন করিয়াছেন, তিনিই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, কালীবাবু কতদূর উচ্চ অধিকার লাভ করিয়াছেন।

এইরূপে কোথা দিয়া যে সে রাত্রি কাটিয়া গেল, কেহই জানিতে পারিলেন না। প্রভাত হইয়াছে দেখিয়া সকলেই অবাক্! ক্রমে ধর্ম্মদাস রায়, কালীনাথ চট্টোপাধ্যায়, গোপীকৃষ্ণ চন্দ্র, শ্রীনাথ গোস্বামী প্রভৃতি অনেক-স্থানীয় ভদ্রলোক বাবাজী মহাশয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। ইনি নবদ্বীপবাসী ভদ্রলোকের নিকট কিন্তু সেই রাজেন বাবুই রহিয়াছেন।

ভারতীসংবাদ

একদিন পূর্ব্বোক্ত প্রেমানন্দ ভারতী মহাশয় আসিয়া বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন, "দেখ ভাই, এই তোমাদের বৈরাগীর প্রকৃত ধর্ম্মটা যে কি, তা ত আমি বুঝিতে পারিলাম না। আমার কয়েকটী প্রশ্ন আছে, তোমাকে উত্তর দিতে হইবে।" বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "আমরা 'হরেকৃষ্ণ, নিতাইগৌর' ব'লে দু'টী ভিক্ষা মেগে খাই। আমরা ধর্ম্মকর্ম্মের কথা কি জানি? তবে আপনি বলুন, আপনার মুখে শুনিয়াও ত আমরা কৃতার্থ হইতে পারিব।" ভারতী মহাশয় বলিলেন, "প্রথম প্রশ্ন বৈষ্ণব শব্দে

কি বুঝায় এবং বৈষ্ণব শব্দের প্রকৃত মর্ম্মার্থ কি? শাস্ত্র এবং যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত দ্বারা আমাকে বলিতে হইবে।"

বাবাজী মহাশয়। বিষ্ণুকে যিনি উপাসনা করেন, তিনিই বৈষ্ণব-পদবাচ্য। তবে রাম, নৃসিংহ, বামন, অনন্ত প্রভৃতি বিষ্ণুর যত যত অবতার, তাঁহাদের উপাসকদিগকেও বৈষ্ণবপদে অভিহিত করা হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু বসু-রামানন্দের শিক্ষায় বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর, বৈষ্ণবতম ভেদ করিয়াছেন, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যখণ্ড পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে যথা ;—

অতএব যাঁর মুখে এক কৃষ্ণনাম।
সেইত বৈষ্ণব তাঁরে করিবে সম্মান॥

ঐ ষোড়শ পরিচ্ছেদে,—

কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে।
সেই সে বৈষ্ণব ভজ তাঁহার চরণে॥
যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিও তুমি বৈষ্ণবপ্রধান॥

অর্থাৎ কোন বৈষ্ণবচিহ্নাদি দ্বারা চিহ্নিত না হইলেও সর্ব্বভূতে অদ্বেষ্টা প্রাণিমাত্রহিতে রত, সত্যৈকনিষ্ঠ ব্যক্তিকেই বৈষ্ণব বলিয়া জানিতে হইবে। সংসার ত্যাগ বা বেশভূষাদি বৈষ্ণবতার প্রতি কারণ হইতে পারে না। তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত—মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে ষষ্টিসহস্র ঋষি, অনন্তকোটী দেবতা, এমন কি সাক্ষাৎ যজ্ঞেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত উপস্থিতসত্ত্বেও বৈষ্ণবসেবার অভাবে রাজসূয় যজ্ঞ পূর্ণ না হওয়ায় মুচিরাম দাসকে আনিয়া সেবা করার পর যজ্ঞ পূর্ণ হইল—স্বর্গে ঘণ্টা বাজিল। সে ত জাতিতে মুচি, আশ্রমত্যাগী নয়। ঝড়ুঠাকুর জাতিতে ভূমিমালী এবং সস্ত্রীক সংসারাশ্রমে বাস করেন। তথাপি শাস্ত্রে ইহারা বৈষ্ণবাগ্রগণ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। জগতে এমন অনেক বৈষ্ণব আছেন যে, প্রতিষ্ঠার ভয়ে

আত্মগোপনপূর্ব্বক স্বধর্ম্ম যাজন করেন। এমন কি, অনেক মহাত্মার পাগলের মত ব্যবহারও দেখা যায়। অতএব কেবল বাহ্য ব্যবহারই বৈষ্ণবতার বা অবৈষ্ণবতার প্রতি কারণ হইতে পারে না।

ভারতী। তা বেশ। বৈষ্ণব শব্দের বিশদ ব্যাখ্যা বুঝিলাম। বৈষ্ণব ধর্ম্মের লক্ষণ কি?

বাবাজী। বৈষ্ণব ধর্ম্মের লক্ষণ ব্যাখ্যা করা আমার ন্যায় ক্ষুদ্রজীবের দুঃসাধ্য। আপনাদের কৃপাশক্তিতে হৃদয়ে যাহা স্ফূর্ত্তি হইবে, তদ্দ্বারা দিগ্দর্শন মাত্র করিতেছি:—

"ব্রাহ্মণ আচণ্ডাল কুক্কুরান্ত করি।
দণ্ডবৎ করিবেক বহু মান্য করি॥
এই সে বৈষ্ণবধর্ম্ম সবারে প্রণতি।
সেই ধর্ম্মধ্বজী যার ইথে নাই মতি॥
উত্তম হইয়া বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান॥
সর্ব্বদেব পূজিবে না হবে তৎপর।
সবার নিকট মেগে লবে ইষ্টভক্তি বর॥

অর্থাৎ স্থাবরজঙ্গম, পশুপক্ষী, তৃণলতা হইতেও নিজেকে হীন মনে করিতে হইবে।

ভারতী। ঐ ত আমি বুঝিলাম না। যখন ভগবান্ মানবজাতিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ করিয়াছেন, তখন সেই মানবজাতি নিজেকে পশুপক্ষী হইতে হীন কি করিয়া মনে করিবে? করিলেও সে কথাটা আমার মতে প্রতারণা বলিয়া বোধ হয়।

বাবাজী। আমি বলি, মানবজাতি সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। এবিষয়ে একটি গল্প মনে পড়িল,—একজন সাধু যোগবলে যাবতীয় বস্তুর অভিপ্রায় বুঝিতে

পারিতেন। একদিন তিনি এক রাজবাড়ী অতিথি হইয়াছেন। রাজার মাতৃশ্রাদ্ধ; অনেক রকম খাওয়া দাওয়া হইল। পরদিন মলত্যাগ করিবার জন্য মাঠে গিয়াছেন। শৌচক্রিয়ার পর দুর্গন্ধের ভয়ে নাকে কাপড় দিয়া চলিয়া যাইবেন, এই সময় সেই ময়লা সাধুকে বলিতে লাগিল, "ওহে সাধু! তুমি ঘৃণার পাত্র, কি আমি ঘৃণার পাত্র একবার ভাবিয়া দেখ দেখি! গত পরশ্ব আমি দোকানে ঘি, ময়দা, সুজি, চিনিরূপে ছিলাম। রাজা উপযুক্ত মূল্যে আমাকে দোকান হইতে আনাইয়া সুযোগ্য ব্রাহ্মণদ্বারা গঙ্গাজল ও অগ্নিসহযোগে পুরী, কচুরী, মোহনভোগাদি প্রস্তুত করাইয়া ভগবানের ভোগ লাগাইলেন। তখন সৎসঙ্গের গুণে আমি ভগবদ্‌ভোগ্য হইলাম। আমার নশ্বরত্ব দূর হইয়া নিত্য চিন্ময়ত্ব লাভ হইল। এমন কি, কুক্কুরাদির স্পর্শেও আমার পবিত্রতা নষ্ট হইত না। তদনন্তর মহারাজ সৎপাত্রবোধে আমাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিলেন। আজ তোমার সঙ্গদোষে আমার এরূপ দুরবস্থা হইয়াছে যে, তুমি নিজেও আমাকে পরিত্যাগ করিয়া স্নান না করা পর্য্যন্ত নিজেকে অপবিত্র মনে করিতেছ। দুঃখের কথা আর কি বলিব? যে আমাকে পরিষ্কার করিবে, সে পর্য্যন্ত তোমাদের অস্পৃশ্য। এখন বল দেখি, তোমার নিজের বিবেচনায় তুমি ঘৃণিত, না আমি ঘৃণিত? মহারাজ যদি আমাকে গাভীর নিকটে দিতেন, তবে আজ আমার সারাংশ দুগ্ধরূপে এবং অসারাংশ গোময়গোমূত্ররূপে পরিণত হইয়া দেবভোগ্য হইত। এমন কি পশুপক্ষীকে দিলেও আমি এত অপবিত্র হইতাম না।" ইহা শুনিয়া সাধুর চৈতন্যোদয় হইল। তখন তিনি ময়লাকে দণ্ডবৎ করিয়া বলিলেন, "তোমার কথা অতি সুসত্য। যদি জগতে যথার্থ ঘৃণার পাত্র কিছু থাকে, তবে মনুষ্য।" এই বলিয়া সাধু যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন।

এখন আপনিই ভাবিয়া দেখুন—হস্তী, অশ্ব, গণ্ডার, শূকর, ময়ূর, শুক

প্রভৃতি পশুপক্ষিগণের মৃতদেহ দ্বারা জগতের কত উপকার হইতেছে। মানবের দেহ যতক্ষণ বাড়ীতে থাকিবে, ততক্ষণ উহা অস্বাস্থ্যকর হইবে। মানবদেহ যে স্থানে সমাধি দেওয়া হয় বা সৎকার করা হয়, সে স্থানটী শ্মশানভূমি বলিয়া কথিত। বৈজ্ঞানিক যুক্তিতেও শ্মশানভূমির গ্যাস দূষিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। মাতাপিতা বা কোন জ্ঞাতির মৃত্যুতে তৎসম্পর্কিত ব্যক্তি যথানির্দ্দিষ্ট দিন অশুচি থাকে, কিন্তু গবাদি পশুর মৃত্যুতে ত কেহ অপবিত্তা বোধ করে না। এ ত গেল জঙ্গম দেহের বিষয়। স্থাবর দেহের কথা একবার ভাবুন দেখি। তৃণগুচ্ছ-দ্বারা মানবের কত উপকার সাধিত হয়! বৃক্ষ জীবিত থাকিয়া পত্র, পুষ্প, ফল, ছায়াদিদানে জগতের বহু উপকার সাধন করিয়া মৃতদেহের দ্বারাও আবার খাট, চেয়ার, টেবিল, সিংহাসন প্রভৃতি হইয়া আমাদের কতই হিত সাধন করিতেছে! তাহাতেই কি ক্ষান্ত আছে? উহার অবশিষ্টাংশ কাষ্ঠরূপে রান্নার সাহায্য করিতেছে। তবুও নিরস্ত নাই; নিজে অগ্নিদগ্ধ হইয়াও কয়লারূপে অলঙ্কারাদি প্রস্তুতের সাহায্য করিতেছে। তবে দেখুন, তাহারা বড়, কি আমরা বড়।

ভারতী। এ সব ত দৈহিক ক্রিয়া। পশুপক্ষী অপেক্ষা মানসিক বৃত্তির উচ্চতাবশতই সর্ব্বপ্রাণী অপেক্ষা মানবের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হইয়াছে।

বাবাজী। তাই বা কিরূপে বলি! আপনি অনেক জ্যোতিষ শাস্ত্র প্রভৃতি অধ্যয়ন করিয়াও যতদূর অভিজ্ঞতা লাভ করিতে না পারেন, পশুপক্ষিগণ তাহা অনায়াসেই লাভ করিতেছে। মনে করুন, আপনি গোপনে কোনও একটী স্থানে বহুবিধ আবরণে আবৃত করিয়া কিছু মিষ্ট দ্রব্য রাখিয়াছেন। পিপীলিকা কোনও শাস্ত্রাদির বিনাসাহায্যে ঠিক সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত। এই পিপীলিকার কথাতে মনুষ্যজাতির আর একটা

হীনতার কথা মনে হইল। একটী পিপীলিকা কোন স্থানে একটু খাদ্যবস্তু পাইবামাত্র সে দ্রুতগতিতে তাহার স্বজাতিবর্গকে ডাকিয়া সকলে সেই বস্তু আস্বাদন করে বা আপন আপন বাসস্থানে লইয়া যায়। আমরা অতি উচ্চ মানবজাতি, যদি কোথাও কিছু পাই, তবে আগে চারিদিকে তাকাইয়া দেখি, কেহ দেখিল কি না। তৎপরে অতিসন্তর্পণে উহা লইয়া এমন গুপ্তস্থানে রাখি যে, সহোদর ভাই বা মাতা পিতা পর্য্যন্তও যাহাতে জানিতে না পারেন। আমরা পিতার মৃত্যুর পর ভাইয়ে ভাইয়ে বিষয় লইয়া মামলা করিতেছি। একতা বলিয়া জিনিষটী মানবজাতির মধ্যে আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। ছিদ্র পাইলেই প্রতারণা। এইজন্যই মহাপ্রভু মানবকে তৃণ হইতেও হীনতা সাধন করিতে বলিয়াছেন। সৃষ্টিকর্ত্তার শেষ সৃষ্টি মানবজাতি। যেমন কৌশলী চিত্রকর নানারূপ জীবজন্তু, গাছপালা, লতাপাতা, ফলফুল প্রভৃতি অতি সুন্দরভাবে অঙ্কন পূর্ব্বক যতকিছু রং থাকে, শেষকালে সব একত্র করিয়া যে-সে রূপে এক অদ্ভুত মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া থাকে, সৃষ্টিকর্ত্তা সেইরূপ নানাবিধ কৌশলে মনোযোগের সহিত পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গাদি যাবতীয় পদার্থ সৃষ্টি করিয়া সকলের অবশেষ যাহা কিছু ছিল, তদ্দ্বারা মানবজাতির সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন চটের কলে ১নং ২নং ৩নং চটের বেশ আদর হয়। ৪নং চটখানা অতি পাতলা ও অপরিষ্কার হইয়া থাকে। কেহই উহার আদর করে না দেখিয়া কৌশলী কারিকর উহাতে রং দিয়া যেমন একখানি তাঁবু প্রস্তুত করিল, অমনি তাহার আদর বাড়িয়া গেল। ১নং চটখানার ১০৲ টাকা দাম হইলে সেই ক্যানভাস্ পরদাখানার দাম ৬০৲ টাকা হইবে। তাহার ভিতর কি আছে, কে আর লক্ষ্য করিতে যায়? মোমজামা প্রভৃতিও ঠিক ঐরূপ। তেমনি সৃষ্টিকর্ত্তা মনুষ্যজাতির উপরে মোমজামাসদৃশ একটা চাকচিক্য দিয়াছেন। বাস্তবিক আপনি অনুসন্ধান করিয়া দেখুন, এক

একটী পক্ষীতে কিংবা এক একটী লতাপাতায় ভগবানের সৃষ্টির যেরূপ কৌশল বা কারুকার্য্য লক্ষিত হয়, মানবদেহে তাহার শতাংশের এক অংশ আছে কি না সন্দেহ। যদি বলেন, ধর্ম্মে মানবজাতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহাই বা কি করিয়া বলি? শাস্ত্রে আছে, নিষিদ্ধ দিন ব্যতীত ঋতুমতী স্ত্রীকে অভিগমন করিবে। মনুষ্য এই বিধানানুসারে জীবনযাপন করে কি? মানবজাতিতে যত ব্যভিচার দেখা যায়, অন্য কোন প্রাণীতে সেরূপ নাই। সিংহ, হস্তী, গো, মহিষ, মৃগ, পক্ষী প্রভৃতি সকলেই নির্দ্দিষ্টকাল ব্যতীত সর্ব্বদা নির্ব্বিকারচিত্তে স্ত্রীপুরুষ একত্রে বসবাস করিয়া থাকে। এরূপ সমতা মনুষ্য জাতির মধ্যে আছে কি? মানবজাতি কেবল 'আমরা শ্রেষ্ঠ' এই অভিমানেই বড়। তদ্ভিন্ন তাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়? তাই পরমদাল মহাপ্রভু উপদেশ দিয়াছেন, "যদি প্রকৃত মানবপদবাচ্য হইতে চাও—যদি সর্ব্বাপেক্ষা লাভ করিতে চাও, তবে আপনাকে সকল পদার্থ অপেক্ষা হীন জ্ঞান কর, অভিমানমঞ্চ হইতে নীচে নাম, অপর প্রাণিহিংসা দ্বারা নিজের দেহপুষ্টির বাসনা পরিত্যাগ কর; অচিরাৎ কৃষ্ণ কৃপা করিবেন।" প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্ম বলিতে ইহা ছাড়া আমি আর কি বলিব?

ভারতী। আচ্ছা, মালাতিলক প্রভৃতি ধারণের কি প্রয়োজন? যাজন ত মনে মনে। মনোমালাই ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, বাহ্যাড়ম্বর কেন?

বাবাজী। আমরা স্থূল জগতে বাস করি। স্থূল ব্যতীত কেবল সূক্ষ্মের দ্বারা আমাদের যাবতীয় ব্যাপার নির্ব্বাহ হইতে পারে না। আমাদের কতকগুলি কুসংস্কার আছে। অনেক সময় আমরা মহতের দোহাই দিয়া মহৎ হইতে যাই। যেমন মানসে রাধাগোবিন্দের ভোগ লাগাইলাম; কারণ স্মরণমননই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সনাতন গোস্বামীর নিকট ঠাকুর লবণ চাহিয়াছিলেন, তিনি তাহা দেন নাই। আমাদের এত বাহ্যাড়ম্বর করিবার দরকার কি? তিনি "আনিয়া বনের শাক, অলবণে করি পাক" ঠাকুরকে

দিতেন। আমরা কি তাঁহা হইতে বড় হইলাম, যে সেবার চেষ্টা করিব? সুতরাং ভগবৎ-সেবাটা স্মরণেই সারিয়া দিলাম। অথবা যেন তেন প্রকারেণ তাঁহার সেবার ব্যবস্থা করিলাম। কিন্তু আমার মাথাটা বড় গরম, একটু ঠাণ্ডা তেল মাথায় না দিলে চলে না। তিনবার স্নান না করিলে ঘুম হয় না। রুটি হজম হয় না, বাধ্য হইয়া ইহাকে তাহাকে ধরিয়া কিছু জবাকুসুম তেল, পুরাতন চা'ল, মুগডা'ল ও একটু দুধ যোগাড় করা চাই। এ বেলা স্মরণমননে চলিবে না। এখন প্রমাণ বাহির হইবে—"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্।" এ বেলা সনাতন গোস্বামী, দাস গোস্বামীর কথা মনে নাই। তাঁহারা যেমন অলবণ শাক অতি আদর করিয়া খাইতেন, সেইরূপ তুমি তোমার ঠাকুরকে যাহা দিবে, তাহাই খাইয়া দিন কাটাও না কেন? সনাতন গোস্বামীর 'অলবণ'টুকু নিলাম; কিন্তু তাঁহার ছাপ্পান্ন দণ্ড ভাবনাটা বা "চারি দণ্ড শুতি থাকে, স্বপ্নে রাধাকৃষ্ণ দেখে, এক এক বৃক্ষতলে এক এক রাত্র বাস।" এগুলি কেন বাদ যায়? রঘুনাথ দাস গোস্বামী এক পল মাঠা ভোগ দিতেন। তিনি ঐ মাঠা বৈ নিজের জন্য অন্য কিছু চেষ্টা করিতেন কি? রাসলীলার বেলায় কৃষ্ণ হইতে সাধ, গোবর্দ্ধনধারণের বেলায় পলাইলে চলিবে কেন? তাই বলি, আমরা যতদিন স্থূলজগতে থাকিব, ততদিন স্থূলের সঙ্গে মিশাইয়া যথাসম্ভব সূক্ষ্ম ভাবটী লইতে হইবে। জীব কৃষ্ণের নিত্য দাস। এই দাসত্ব-চাকুরীর চাপরাস মালাতিলক প্রভৃতি বেশ, দেশের এবং প্রভুর পরিচায়ক। যেমন আমরা বেশ দেখিয়া ইনি কাবুল, ইনি মান্দ্রাজী, ইনি চীনা, ইনি বিলাতী এইরূপ বুঝিয়া থাকি, সেইরূপ বেশ দেখিয়াই ভগবদ্দাস বলিয়া জানা যায়। কোন সাহেবের কাছে যাইতে হইলে যেমন হ্যাট্ কোট্ টুপী প্রভৃতি না পরিয়া যাওয়া যায় না, কারণ সাহেব কিছু না বলিলেও তাঁহার আরদালী কিছুতেই ভিতরে প্রবেশ করিতে

দিবে না, তদ্রূপ ভগবদ্দাস হইয়া তাঁহার সভার সভ্য জাতীয় বেশভূষা না করিলে তিনি যদিও কিছু না বলেন, কিন্তু তাঁহার পরিকরগণ মানিবে কেন? আর বেশে মানসিক গতির তারতম্য হইয়া থাকে। গঙ্গাস্নান করিয়া একখানি শুদ্ধ বসন পরিধান ও নামাবলী ধারণপূর্ব্বক হরিনামের মালাটী হাতে লইয়া ঠাকুরদর্শনে যাইবার সময় মনের কিরূপ অবস্থা হয় এবং সাহেবী পোষাক পরিয়া হাতে ছড়ি, পায়ে জুতা, একটী চুরুট মুখে দিয়া বাজারে বেড়াইবার সময় মনের কিরূপ অবস্থা হয়, একবার চিন্তা করিয়া দেখিলেই সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, মনের সহিত দেশের ও বেশের সম্বন্ধ আছে কি না।

ভারতী। বৈষ্ণবের মধ্যে আর একটা প্রায়ই দেখা যায়, নামের গোঁড়ামী। এটা কিরূপ?

বাবাজী। নামের গোঁড়ামী অর্থ কি আমি বুঝিতে পারিলাম না।

ভারতী। নামের গোঁড়ামী অর্থাৎ কেহ জয় শ্যামসুন্দর, কেহ জয় কানাইয়া লাল, কেহ বা জয় মদনগোপাল, কেহ কেহ বা জয় রাধারমণ, কেহ বা জয় গোবিন্দ ইত্যাদি এক একজন এক এক নামে আকৃষ্ট। দিবানিশি মুখে কেবল ঐ একই নাম কেন?

বাবাজী। ইহা গোঁড়ামী নয়। ইহাকে নিষ্ঠা বলা যায়। অন্য নামের প্রতি বিদ্বেষভাবকে গোঁড়ামী বলে; কিন্তু এই নিষ্ঠা বিদ্বেষভাব-রহিত। নিষ্ঠা অনেক প্রকার। তন্মধ্যে নামৈকনিষ্ঠা, রূপৈকনিষ্ঠা, গুণৈকনিষ্ঠা এবং স্বরূপৈকনিষ্ঠা এই চারিপ্রকার প্রধান। যেমন দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারি রসের পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পর পর রসে সঞ্চারিত হয়, তদ্রূপ নামনিষ্ঠ ব্যক্তি নামেতেই আকৃষ্টচিত্ত হয়, রূপৈকনিষ্ঠ নাম ও রূপ দুইতে, গুণনিষ্ঠ ব্যক্তি নাম, রূপ ও গুণে এবং স্বরূপনিষ্ঠ ব্যক্তি নাম, রূপ, গুণ ও স্বরূপে আকৃষ্ট থাকে। স্বরূপনিষ্ঠ ব্যক্তির নাম,

• রূপ, গুণ প্রভৃতির বৈপরীত্যেও নিষ্ঠা সমানই থাকে। প্রাকৃত রাজ্যের কথা ভাবিয়া দেখুন; আপনি যদি কোন ব্যক্তির সদগুণ শুনিয়া তাঁহাকে ভক্তি করিয়া থাকেন, হঠাৎ তিনি একটা চুরি মোকদ্দমায় পড়িলে যথার্থ যখন তাঁহাকে চোর বলিয়া জানা গেল, তখন তাঁহার প্রতি আপনার আর সেইরূপ ভক্তি-ভালবাসা থাকে কি? এইরূপ কাহারও অতি সুন্দর রূপযৌবন দেখিয়া একজন মুগ্ধ হইল, বয়সে কিংবা ব্যাধিতে যদি তাহার রূপ কদাকার হইয়া যায়, তবে ভালবাসার পরিবর্ত্তে ঘৃণার উদ্রেক হয় না কি? ইহাকে বলে একদেশব্যাপী ভালবাসা। যাহার প্রকৃত স্বরূপে ভালবাসা হয়, তাহার ভালবাসা কখনই টুটে না। সে চোর, শঠ, লম্পট, কিংবা রোগী, বৃদ্ধ যেমনই হউক না কেন, তাহার ভালবাসা চিরকাল অক্ষুণ্ণই থাকিবে। ভগবদ্রাজ্যেও এইরূপ। তবে নামে কোনও অর্থবাদ নাই, রুচি অনুসারে এক এক নামে নিষ্ঠা জন্মে; এইজন্য শত নাম, সহস্র নামের প্রকাশ হইয়াছে। চরিতামৃতেও বলিয়াছেন,—

"অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার।
কৃপাতে করিলে অনেক নামের প্রচার॥"

অনিন্দুক হইয়া যাহার যে নামে রুচি, সেই নামেই লক্ষ্য বস্তু প্রাপ্তি হইবে। মূর্খলোক 'বিষ্ণায়' বলিয়া ভগবানকে প্রণাম করে, আর পণ্ডিত 'বিষ্ণবে' বলিয়া প্রণাম করিয়া থাকে। তিনি কিন্তু ভাবগ্রাহী। শব্দ, অর্থ অথবা ব্যাকরণগ্রাহী নহেন। যাঁহার ভাবপ্রাবল্য হইবে, তাঁহার বস্তু আদর করিয়া গ্রহণ করিবেন। জাতিকুলবিদ্যার আদর ভগবানের নিকট নাই। তিনি ভাবের ঠাকুর, ভাবেই তুষ্ট। সাধক রামপ্রসাদ ভাবভরে মাকে যা মুখে আসে, গালাগালি করিয়াও যে প্রসাদ লাভ করিয়াছেন, আমি চারিবেদ, অষ্টাদশ পুরাণ ও তন্ত্র-অনুসারে যুগ যুগান্তর বসিয়া মায়ের উপাসনা ও পূজা করিলেও বোধ হয় তাহার কণামাত্র

লাভ হইবে কিনা সন্দেহ। তাই বলি, ভাবের গালিও মধুর; অভাবের স্তুতিও অপ্রীতিকর।

ভারতী। আচ্ছা, ভগবানই ত গুরু। তিনিই ত আমাদিগকে সদসৎ পথে চালাইবার মালিক। তবে আবার পৃথক গুরু করিবার দরকার কি? মানুষগুরু করাতেই ত জগতে নানারূপ উপধর্ম্মের প্রচার হইতেছে।

বাবাজী। আজ্ঞে আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঠিক কথা। শাস্ত্রেও তাই বলে ভগবান্ই গুরু। আপনার কথাতেই ত দুটী বস্তু পাওয়া গেল,—ভগবান্ এবং গুরু। বর্ত্তমান অবস্থায় দুইটী বস্তু প্রতিপন্ন না করিলে তত্ত্বতঃ অভিন্নত্ব প্রতিপাদন হইতে পারে না। যেমন রাম ও শ্যাম অভিন্ন। রাম শ্যাম দুইটী ব্যক্তি না থাকিলে কেবল শ্যাম অভিন্ন, এ কি হয়? ভগবান্ বলিয়াছেন, "আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ। ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥ শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ এই শ্লোকেরই পয়ার করিয়াছেন :—

"জীবের নিস্তার লাগি নন্দসুত হরি।
ভুবনে প্রকাশ হন গুরুরূপ ধরি॥
মহিমায় গুরু কৃষ্ণ এক করি জান।
গুরু-আজ্ঞা হৃদে সব সত্য করি মান॥
সত্যজ্ঞানে গুরুবাক্যে যাহার বিশ্বাস।
অবশ্য তাহার হয় ব্রজভূমে বাস॥
যার প্রতি গুরুদেব হন পরসন্ন।
কোন বিঘ্নে সেই নাহি হয় অবসন্ন॥
কৃষ্ণ রুষ্ট হ'লে গুরু রাখিবারে পারে।
গুরু রুষ্ট হ'লে কৃষ্ণ রাখিবারে নারে॥

গুরু মাতা গুরু পিতা গুরু হন পতি।
গুরু বিনা ত্রিসংসারে নাহি আর গতি॥
গুরুকে মনুষ্যজ্ঞান না কর কখন।
গুরুনিন্দা কভু কর্ণে না কর শ্রবণ॥
গুরু-নিন্দুকের মুখ কভু না হেরিবে।
যথা হয় গুরুনিন্দা তথা না যাইবে॥
গুরুর বিক্রিয়া যদি দেখহ কখন।
তথাপি অবজ্ঞা নাহি কর কদাচন॥"

গুরু সর্ব্বশক্তিমান্—বাঞ্ছাকল্পতরু। শিষ্য যাহা বাঞ্ছা করিবে, গুরু তাহাই পূরণ করিবেন। গুরুদেব গাভীস্বরূপ, শিষ্য বৎস; যত দুগ্ধ টানিয়া লইতে পারিবে ততই পাইবে। জগতে যত কিছু দৃশ্যাদৃশ্য পদার্থ, সবই গুরুর প্রকাশ।

ভারতী। তবে চোর, লম্পট, দস্যু বা মাতাল গুরুর পন্থা অনুসরণ করা যাইতে পারে কি?

বাবাজী। জগৎ গুরুর প্রকাশ। সেই প্রকাশরূপ গুরু দুই প্রকার। অনুকূল এবং প্রতিকূল। গুরুদেব আচার্য্যরূপে, বৈষ্ণবরূপে, সাধুরূপে আচরণ করিয়া শিষ্যকে শিক্ষা দিতেছেন, এইরূপ আচরণ কর, প্রেমভক্তি লাভ হইবে। শিষ্য মনে করিতেছে, যদি না করি তবে কি হইবে? অন্তর্য্যামী গুরুদেব অন্তরের ভাব জানিতে পারিয়া ভাবিলেন, "এ ত অজ্ঞ জীব; শাস্ত্র দেখাইলে বুঝিবে না, প্রত্যক্ষ দেখান চাই।" ভাবিয়া চোর, দস্যু, লম্পটরূপে প্রতিকূল গুরুভাবে উপস্থিত হইয়া শিষ্যকে শিক্ষা দিতেছেন, 'সাবধান! চুরি করিও না, চুরি করিলে আমার ন্যায় শাস্তি পাইতে হইবে। দেখুন, গুরুদেব আমাদের জন্য কত কষ্ট স্বীকার করিতেছেন। আমাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য কুৎসিত আচরণ করিতেছেন

এবং তাহার দরুণ শাস্তিপর্য্যন্তও গ্রহণ করিতেছেন। এমন পরম দয়াল গুরু যে না ভজে, তার গতি কোথায়? 'গুরুর দরকার কি?' এই প্রশ্নের উত্তরে আমি বলিতে চাই, অপ্রাকৃত রাজ্য ত দূরের কথা, আমাদের স্বাভাবিক ব্যবহার পর্য্যন্ত গুরুভিন্ন চলিতে পারে না। জন্ম হইবামাত্র যদি গুরুদেব ধাত্রীরূপে মাতৃস্তন পান শিক্ষা না দিতেন, তবে নিশ্চয়ই অনাহারে আমাদের প্রাণবিয়োগ হইত। তৎপরে গুরুদেব মাতৃরূপে পিতৃরূপে যদি জাগতিক ব্যাপার শিক্ষা না দিতেন, তবে কোথায় জ্ঞান পাইতাম? প্রতিমুহূর্ত্তে যদি গুরুদেব এক এক মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা না দিতেন কিংবা রক্ষা না করিতেন, তবে আমরা যে জ্ঞানবিজ্ঞানের বলে এত বুদ্ধিমান্ বলিয়া গরবে আত্মহারা হইয়া তাঁহার অখণ্ড সত্তাকে পর্য্যন্ত লোপ করিতে চেষ্টা করিয়া থাকি, সে শক্তি কোথায় পাইতাম? আমার দৃঢ় ধারণা, যদি বা কেহ নিজে বিচারশক্তির প্রভাবে ঈশ্বরত্ব লোপ করিতে যায়, সেও বরং কিঞ্চিৎ সম্ভবপর হইতে পারে; কিন্তু গুরুসত্তালোপ কিংবা গুরুর অপ্রয়োজনীয়তা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না।

ভারতী। গুরুকে আত্মসমর্পণ কথাটা কি?

বাবাজী। সমর্পণ অর্থ কায়মনোবাক্যে তাঁহার হওয়া। নিজের চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া তিনি যাহা করাইবেন, যদি কেহ সেইভাবে চলিতে পারে, তবে মঙ্গলময় প্রভু তাহার মঙ্গল বই কখনই অমঙ্গল করিতে পারেন না। আর যদি নিজ-উদ্দেশ্য সাধনমানসে আংশিক মানিতে যাই আংশিক বাদ দিই, তবে গুরুর কৃপাও আংশিকভাবে কার্য্য করিবে। একটী গল্প মনে পড়িল,—একটী লোক ঘোর পাযণ্ড ছিল। এক সাধুর কৃপায় তাহার মতিপরিবর্ত্তন হইল। তখন সে সাধুর নিকট বলিল, "দেখুন, আমাকে অল্পায়াসে সদ্‌ভাবে সংসারে চলিবার ব্যবস্থা দিতে হইবে।" সাধু বলিলেন, "দেখ, জগৎ একমাত্র শ্রীগুরুর প্রকাশ এবং তিনি মঙ্গলময়, এইটী হৃদয়ে

দৃঢ় ধারণা রাখিতে পারিলে আর কোন বিপদ হইবে না।" শিষ্য সাধুর বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক চলিয়া গেল। কিছুকাল পরে একদিন মনে হইল, গুরুদেব যে কথাটা বলিলেন, তাহা ত পরীক্ষা করা হইল না। আজ পরীক্ষা করা যাক, ভাবিয়া একটী রাস্তার মধ্যস্থলে গিয়া দাঁড়াইল। এমন সময় ঐ রাস্তাদিয়া একটা হাতী যাইতেছিল। উপরে মাহুত চীৎকার করিতেছে, 'হট্ যাও, হট্ যাও, পাগ্‌লা হাতী মার দেগা।' সে ভাবিল, "হাতী ত গুরুর প্রকাশ, তবে ভয় কি? গুরু মঙ্গলময়, তিনি কখনই আমার অমঙ্গল করিবেন না। আমি সরিব কেন?" ক্রমে হাতীটা নিকটে আসিয়া ঐ লোকটীকে শুণ্ড দ্বারা দূরে নিক্ষেপ করিলে সে বড়ই আঘাত পাইল। তখন মনে মনে সাধুর উপর বড়ই রাগ হইল। 'সাধু হইয়া এত মিথ্যা কথা! যাই দেখি, কেমন সাধু!' ভাবিতে ভাবিতে সাধুর নিকট গিয়া বলিল, "আপনি আমায় প্রবঞ্চনা করিলেন কেন? জগৎ গুরুর প্রকাশ এবং গুরু মঙ্গলময়, আর আমি তাহার কিছুই পরিচয় পাইলাম না!" সাধু আমূল বৃত্তান্ত শ্রবন করিয়া বুঝিলেন, 'শিষ্যের ধারণা হইয়াছে, হাতী যখন শুণ্ডদ্বারা আমাকে আঘাত করিল, তখন হাতীকে কিরূপে মঙ্গলময় গুরুর প্রকাশ বলা যায়?' তখন তিনি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা বাবা, হাতীর সঙ্গে আর কেউ ছিল কি?" শিষ্য বলিল—"হাঁ, উপরে একটা মাহুত ছিল। সে চীৎকার করিতেছিল, 'পাগলা হাতী মার দেগা, হট্ যাও।' আমি হ'টে যাব কেন? হাতী কি আমার মঙ্গলময় গুরুর প্রকাশ নয়," সাধু বলিলেন, 'তুমি কি বলিতে চাও যে হাতীই গুরুর প্রকাশ, হাতীর রক্ষক গুরুর প্রকাশ নহে? বাবা, যে বাক্য মানিতে হয়, তাহার সর্ব্বাংশ না মানিয়া একদেশ মানিলে বিপদ ত অবশ্যম্ভাবী। যেমন গুরুর প্রকাশ হাতী আসিতেছে, তেমনি গুরুর প্রকাশ মাহুত নিষেধ করিতেছে। গুরুর প্রকাশ মানিতে গেলে মাহুতের

কথামত এক পাশে সরিয়া যাওয়া উচিত ছিল। আমার নিজ বুদ্ধিবলও রাখিব, গুরুবাক্যও পালিব এ হয় না। সমর্পণও যাহা, বিক্রী হওয়াও তাই। যেমন বাজার হইতে আলু, বেগুন, পটল কিনিয়া আনা হইল। আপনি ভাজা, রসা, তরকারী যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। আলু, বেগুন আপত্তি করিতে পারে না। সমর্পিত ব্যক্তিও সেইরূপ কোন আপত্তি করিতে পারে না।

ভারতী। আচ্ছা যদি কোন স্ত্রীদেহ গুরুকে সমর্পণ করা হয় এবং গুরু কু-অভিলাষ করেন, তবে কি কর্ত্তব্য?

বাবাজী। আগে নিজের চিত্ত পরীক্ষা করিতে হইবে। গুরুকে আমার কৃষ্ণ-জ্ঞান হইয়াছে কি না; যদি গুরু আমার ধন, পুত্র, গৃহ প্রভৃতি যাবতীয় বস্তু অঙ্গীকার করিয়া আমাকে ভিখারিণী বেশে বনে যাইতে বলেন, আমি পারিব কি না। গুরুদর্শনে আমার কৃষ্ণদর্শনানুরূপ আনন্দানুভূতি হয় কি না। গুরু ব্যতিরেকে নিতাইগৌর, রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি অন্য কিছু প্রাপ্তির অভিলাষ মনে আছে কিনা। যদি মনে এই সকল ধারণা দৃঢ়বদ্ধ হইয়া থাকে এবং গুরুকে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিতে সমর্থ হই, তবে ব্রজগোপীদের ন্যায় গুরুর অভিলাষ পূরণ করিলে আমার সতীত্ব নষ্ট বা অন্য কোনও পাপ হইতে পারে না। যদি ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিবার মানসে অপর লোকের প্রবোধের জন্য শাস্ত্রবাক্য মুখস্থ করিয়া শাস্ত্রের দোহাই দিয়া পাপকার্য্য করা হয়, তবে দ্বিগুণতর শাস্তি হইবে। বরং মদ্যপায়ী, লম্পট, চোর, দস্যু প্রভৃতি অসাধু ব্যক্তির নিস্তার আছে, কিন্তু ধর্ম্মবলে যাহারা পাপবৃত্তি আচরণ করে কিংবা লোকের কাছে ভাবুক সাজিয়া যাহারা কামিনী-কাঞ্চনের লোভ চরিতার্থ করে, তাহারা ভণ্ড। কোন যুগেও তাহাদের উদ্ধারসাধন হইতে পারে না।

ভারতী। ভাই, তোমার মুখে এই সব বিষয়ের সুমীমাংসা শুনিয়া

আমার প্রাণে বড়ই আনন্দ হইতেছে। তোমাকে এত কথা বলাইতেছি বলিয়া কোনও কষ্ট হইতেছে না ত ভাই ?

বাবাজী। দাদা, আপনি কি বলেন ! আপনারা সূত্রধর, আমি ত কাঠের পুতুল। আমার আজ শুভ দিন। আপনার এ সমস্ত জিজ্ঞাসা নয় ত, শিক্ষা দেওয়া।

ভারতী ; আমি শিক্ষা দিতে আসিয়াছি কি নিতে আসিয়াছি, তাহা আমার মনই জানে। যাক্, আর এক কথা, নরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনায় আছে, "গুরুরূপা সখীর বামে, ত্রিভঙ্গ হইয়া ঠামে, চামরের বাতাস করিব" ইত্যাদি। এখানে আবার গুরু কৃষ্ণ একবস্তু পাওয়া গেল। এর সমন্বয় কি ?

বাবাজী। এই জন্যই পূর্ব্বে বলিয়াছি, গুরু সর্ব্বশক্তিমান্ কল্পতরু। তাঁহার নিকট যে যাহা চাহিবে, তিনি তাহাকে তাহাই দিবেন। এমন কোনও বস্তু নাই যে, যাহা গুরু হইতে পারেন না। বৈষ্ণব তাঁহাকে কৃষ্ণ-বিষ্ণু বলিবে বলিয়া শৈব কি তাঁহাকে শিব বলিবে না ?

"গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুঃ গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরোঃ পরতরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

গ্রন্থান্তরে বলিয়াছেন,

গুরুরাধা গুরুঃ কৃষ্ণো গুরুঃ শঙ্করশঙ্করী।
ন গুরোরধিকং কিঞ্চিৎ সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥"

শাস্ত্রাদিতে এই প্রকার বহু বহু প্রমাণ রহিয়াছে। আমি তাহার আর কয়টীর উল্লেখ করিব ? মোট কথা শিষ্যের যখন যাহা প্রয়োজন, গুরুদেব তখন তাহাই হইবেন। রাধা, কৃষ্ণ, সখী, মঞ্জরী, নিতাই, গৌর, শিব, দুর্গা, গণেশ, সূর্য্য ইত্যাদি যাহা কিছু আছেন, গুরু সবই হইতে পারেন।

ভারতী। আচ্ছা মনে কর, গুরু পরম গুরু প্রভৃতি একস্থানে শিষ্যের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। শিষ্য আগে কাহাকে প্রণাম করিবে? এবং কাহাকেই বা আগে পূজা করিবে?

বাবাজী। সর্ব্বাগ্রে গুরুর প্রণাম এবং গুরুর পূজাবিধি। এখন কি, গুরুসান্নিধ্যে অগ্রে অন্যদেবতার পূজা পর্য্যন্ত নিষেধ। শ্রীগুরুদেবের চরণে প্রণাম করার পর তিনি যদি আদেশ করেন, তবে পরমগুরু, পরাপরগুরু-দিগকে প্রণাম পূজা করিয়া, তদনন্তর অন্য দেবতার অর্চ্চন বন্দনা করা উচিত।

ভারতী। বিধিভক্তি কাহাকে বলে? এবং কত প্রকার?

বাবাজী। শাস্ত্রযুক্তি অনুসারে ভগবদ্ভক্তজনকেই বিধিভক্তি বলে। এই বিধিভক্তি চৌষট্টি অঙ্গে শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন এই নয় প্রকারে বিভক্ত।

ভারতী। রাগভক্তি কিরূপ এবং কত প্রকার?

বাবাজী। শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা না করিয়া লোভপরবশ হইয়া যে কৃষ্ণভজন, তাহারই নাম রাগভক্তি। এই রাগভক্তি আবার বৈধী এবং রাগভেদে দুই প্রকার। অর্থাৎ রাগের বিধি এবং রাগের রাগ। এই রাগভক্তিকে কেহ কেহ সম্বন্ধভক্তি ও প্রেমভক্তি এই দুই নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই ভক্তি, সম্বন্ধ ভিন্ন হয় না। আমার প্রভু, আমার সখা, আমার পুত্র, আমার পতি এই চারি ভাবেই রাগ ভক্তির গতি। রাগের বিধি দ্বারকায় মথুরায়। এই ভক্তিতে ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য উভয় মিলিত থাকে; কিন্তু রাগের রাগভক্তি অর্থাৎ অহৈতুকী ভক্তি ব্রজে ভিন্ন অন্যত্র নাই। ইহাকে গোস্বামিগণ প্রেমভক্তি বলিয়া থাকেন। ইহ তে ঐশ্বর্য্যের গন্ধমাত্রও নাই। রাগভক্তির মূলই হইল লোভ। লোভী ব্যক্তি যে কোন প্রকারেই হউক, লোভনীয় বস্তু লাভ করিতে চেষ্টা

করিয়া থাকে। উহার প্রকার নির্দ্দেশ করা অসম্ভব; তবে মোটামুটি শাস্ত্রে দিগ্‌দর্শন করিয়াছেন। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসম্বাহন, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর, আত্মনিবেদন, তাড়ন, ভৎর্সন, স্নেহ, মান, প্রণয়, বিপ্রলম্ভ, উৎকণ্ঠা, অভিসার, ছলতা, চাতুর্য্য, নৃত্য, গীত, বাদ্য, ক্রীড়া-কৌশল ও সেবা এই পঞ্চবিংশতি প্রকার প্রায় এই ভক্তিতে লক্ষিত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক প্রকার বিভেদ আছে, তাহার সংখ্যা বলা সাধ্যাতীত।

ভারতী। দ্বারকা, মথুরা এবং বৃন্দাবনের পার্থক্য কি?

বাবাজী। দ্বারকায় সম্বন্ধভক্তি বটে; কিন্তু উহা স্বকীয়া। উহাতে বিধি আছে অর্থাৎ রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতি মহিষীগণ স্বামীই পরম দেবতা, স্বামীকে অভক্তি করিলে নরক হয় ইত্যাদি শাস্ত্রযুক্তি অনুসারে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কৃষ্ণকে ভক্তি করিয়া থাকেন। এইরূপ বসুদেব, দেবকী প্রভৃতির বাৎসল্য এবং উদ্ধবাদির সখ্য। দ্বারকায় ঐশ্বর্য্যমিশ্রিত সম্বন্ধভক্তি। মথুরায় যদিও কুব্জা প্রভৃতির পরকীয়রস, কিন্তু উহা সকাম বলিয়া এবং উহাতেও ঐশ্বর্য্যমিশ্রিত থাকায় আদরণীয় নহে। ব্রজে নিষ্কাম, নিরৈশ্বর্য্য, অহৈতুকী ভক্তি। কেবল কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য ব্যতীত এই ভক্তির অন্য কোনও উদ্দেশ্য নাই। ব্রজজন কৃষ্ণসুখের জন্য স্বর্গমোক্ষাদি ভোগকে তৃণতুল্য পরিত্যাগ এবং নরকাদি যন্ত্রণাকে সুবাসিত শিরীষকুসুম-বৎ পরিগ্রহ করিতে কুণ্ঠিত হন না। এই বিষয়ে একটী প্রস্তাব আছে, একদিন নারদ শ্রীকৃষ্ণদর্শনে দ্বারকায় গমন করিয়া দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ মহিষীগণের মধ্যে নানারূপ ক্রীড়াসক্ত। তখন নারদের মনে শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তাসম্বন্ধে একটু সন্দেহ উপস্থিত হইল। অন্তর্য্যামী ভগবান্ উহা ভাবিয়া ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন। নারদ দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ ষোড়শ সহস্র মহিষীর গৃহে সমকালীন বিভিন্ন অবস্থায় ক্রীড়া করিতেছেন। দেখিয়া

নারদের চৈতন্য হইল। তখন তিনি মনে মনে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া নিজ অপরাধ ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং মনে স্থির নিশ্চয় করিলেন যে, দ্বারকাবাসী-বাসিনীগণ যেরূপ একান্ত ভগবৎ-পরায়ণ, এমন আর কেহই নাই। শ্রীকৃষ্ণ মনে করিলেন, নারদের এ ভুল সংশোধন না করিলে চলিবে না। তখন হঠাৎ তাঁহার দেহে ভয়ানক জ্বর উপস্থিত হইল। তিনি অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন,—"উঃ ভয়ানক যন্ত্রণা! আর যে সহ্য হইতেছে না!! প্রাণ যায়!!! সূর্য্যাস্ত হইলে আর আমার জীবন থাকিবে না।" শুনিয়া সকলেই শশব্যস্ত। কি উপায় হইবে! বহু বহু চিকিৎসক আসিয়া নানারূপ উপায় করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই তিনি সুস্থ হইলেন না। তখন নারদ প্রশ্ন করিলেন, "প্রভো! কি উপায়ে আপনি স্থির হইবেন?" শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "যদি আমার কোনও প্রেয়সী আনন্দিতচিত্তে আমাকে চরণধূলি এবং চরণামৃত দিতে পারে, তবে আমি তৎক্ষণাৎ সুস্থ হইব, নচেৎ সূর্য্যাস্ত হইলে আর আমার দেহে প্রাণ থাকিবে না।" শুনিয়া নারদ বলিলেন, "এ আর বেশী কথা কি? যে মহিষীগণ আপনার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারেন, তাঁদের পক্ষে চরণধূলি বা চরণামৃত দেওয়া ত অতি সামান্য কথা।" এই বলিয়া নারদ একে একে রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতি ষোড়শ সহস্র মহিষীগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণের অসুস্থতার প্রতীকারস্বরূপ চরণধূলি ও চরণামৃত চাহিলেন। তাঁহারা সকলেই বিস্মিতভাবে উত্তর দিলেন, "সে কি কথা ঠাকুর! তিনি স্বামী, পরম গুরু। তাঁহাকে চরণামৃত দিয়া কি আমরা নরকে যাইব? ইহা কখনই হইতে পারে না। নারদ বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত যন্ত্রণা পাইতেছেন এবং স্পষ্টই বলিতেছেন যে সূর্য্যাস্ত হইলে আর প্রাণ বাঁচিবে না। অতএব এ বিষয়ে আপনাদের অমত করা কোনমতেই যুক্তিসঙ্গত নহে।" এইরূপে তিনি

মহিষীগণকে অনেক বুঝাইলেন ; কিন্তু কিছুতেই কাহাকেও সম্মত করিতে পারিলেন না। সুতরাং নারদ অতিশয় দুঃখিতচিত্তে তথা হইতে মথুরায় গমন করিলেন। তথায়ও কেহ নারদের এইরূপ প্রস্তাবে স্বীকৃত না হওয়ায় তিনি বড়ই চিন্তিত হইলেন। হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িল, বৃন্দাবনে ত শ্রীকৃষ্ণের বহু প্রেয়সী ছিল ; একবার গেলেও ত হইত। আবার মনে মনে ভাবিলেন, "ইঁহারা প্রধানা প্রেয়সী, ইঁহারাই যখন দিতে অস্বীকার করিলেন, তখন সে সমস্ত গোপজাতি, তাহারা কি দিবে ? বোধ হয় না ; আচ্ছা; একবার সন্দেহ মিটাইয়াই আসি।" এই ভাবিয়া শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিলেন। তথায় গিয়া দেখিলেন, ব্রজবাসি-বাসিনীগণ মৃতপ্রায়। গাভীগণ উর্দ্ধমুখে রহিয়াছে! বৎসগণ মাতৃস্তন্য পান করিতেছে না। পক্ষিগণ পক্কফলে চঞ্চু দিয়া স্থিরভাবে রহিয়াছে। অবস্থা দেখিয়া নারদ অবাক্! ক্রমে গোপীগণের নিকট গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতে না বলিতেই তাহারা বলিয়া উঠিল, "ঠাকুর! কৃষ্ণ এত কষ্ট পাইতেছেন! আমাদের চরণরজ এবং চরণামৃত দিলে যদি তিনি সুস্থ হন, এখনই আমরা দিতে প্রস্তুত আছি।" নারদ বলিলেন, "তাঁহাকে তোমরা চরণামৃত দিলে যে তোমাদের অপরাধ হইবে। অপরাধ হইলে নরকে পতন হইবে! তোমাদের ভয় হইতেছে না কি ?" গোপীগণ বলিল, "ঠাকুর! কৃষ্ণসুখের জন্য যদি নরকও হয়, সে ত স্বর্গসুখ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণসুখ ব্যতিরেকে স্বর্গসুখও নরক।" দেখিয়া শুনিয়া নারদ অবাক্ হইয়া মনে মনে উহাদিগকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন :—

"ধন্য ধন্য ব্রজবাসী! ধন্য ব্রজধাম!
কৃষ্ণসুখ লাগি যাদের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম।
কৃষ্ণপ্রীতে সর্ব্বত্যাগ আর কাঁহো নাই।
অতএব কৃষ্ণপ্রেমের অবধি হেথাই।"

এই বলিতে বলিতে গোপীগণের চরণরজ ও চরণামৃত লইয়া দ্বারকায় প্রত্যাগমনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে দিবামাত্র তাঁহার সকল যন্ত্রণার নিবৃত্তি হইল। তখন তিনি সুস্থ হইয়া নারদকে প্রশ্ন করিলেন, "নারদ, কোথা হইতে এই চরণধূলি ও চরণামৃত আনিলে ?"

নারদ। প্রভো ! ব্রজ হইতে।

শ্রীকৃষ্ণ। ব্রজবাসীর ভাব কিরূপ দেখিলে ?

নারদ। প্রভো ! আমার অপরাধ হইয়াছে ; আমি ব্রজবাসীদিগকে হেয় জ্ঞান করিয়া দ্বারকার প্রাধান্য স্থির করিয়াছিলাম। এখন বুঝিলাম—

"ব্রজের বিশুদ্ধ প্রেম, লক্ষবান যেন হেম,
অন্যত্র নাহিক তার স্থিতি।
অধিক রহুক দূরে, সমান বলিয়ে যারে,
সেহো নহে হেন মোর মতি ॥
কি আর বলিব প্রভু, হেন শুনি নাই কভু,
নরক বলিয়া নাহি ডরে।
তোমার সুখের তরে, ধর্ম্মাধর্ম্ম তুচ্ছ ক'রে,
প্রাণ দিতে পারে অকাতরে ॥
প্রেমভক্তি ব'লে যাহা, ব্রজেতে দেখিনু তাহা,
ধন্য ধন্য ধন্য ব্রজজন।
বন্দো দুই কর যুড়ি, পুনঃ পুনঃ ভূমে পড়ি,
ব্রজবাসিগণের চরণ ॥"

তখন শ্রীকৃষ্ণ আনন্দিতচিত্তে ব্রজবাসিগণের গুণগান করিতে লাগিলে, শুনিয়া নারদ এবং অন্যান্য দ্বারকাবাসিগণ নিজেদের হীনতা মনে করিয়া অতিশয় লজ্জিত হইলেন। তবে দেখুন, ব্রজবাসিগণের কি সুন্দর নিষ্কাম প্রেম !

ভারতী। আমি নিষ্কাম শব্দের অর্থ বুঝিলাম না। এদিকে শ্রুতি বলিয়াছেন, 'কামাদ্গোপ্যঃ।' আবার শ্রীমতীকে নিষ্কাম প্রেমের সর্ব্বপ্রধান পাত্রী নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; কিন্তু কৃষ্ণ অন্য নায়িকা সহ রাত্রিযাপন করায় সঙ্কেতকুঞ্জে অনুপস্থিতি হেতু পর দিবস প্রাতে শ্রীমতী দুর্জ্জয় মান করিয়া রহিলেন। এমন কি, কৃষ্ণকে উপেক্ষা পর্য্যন্ত করিলেন। কাম না থাকিলে কি এ অবস্থা হয়? আরও বলা হইয়াছে, গোপীদের আত্মসুখ নাই। আবার শাস্ত্রে পাওয়া যায়, গোপীগণের নিত্য নূতন বেশ, নিত্য নূতন অলঙ্কার এবং নানা সুগন্ধি দ্রব্য ধারণ, অঙ্গসম্মার্জ্জন, কেশসংস্কারাদি। এ কিরূপ হইল? ইহাকে কি আত্মসুখ বলা যায় না?

বাবাজী। নিষ্কাম সকাম শেষে বলিব। আগে কামশব্দের কি অর্থ তাই বুঝা যাক্। কামশব্দ উচ্চারণমাত্রেই আমরা শিহরিয়া উঠি; কারণ কামশব্দে আমরা বুঝিয়া রাখিয়াছি, ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করা। কাজেই পিতা কন্যার নিকট, স্ত্রী পুরুষান্তরের নিকট, জ্যেষ্ঠ ভাই কনিষ্ঠের নিকট এবং গুরু শিষ্যের নিকট কামশব্দ উচ্চারণ করিতে সঙ্কুচিত হইয়া থাকেন! এই কামশব্দের রূঢ়ি অর্থ যে আমরা কোথায় পাইলাম, তাহা কেহই খোঁজ করিতেছি না। অভিধান বলিয়াছেন, "কামোঽভিলাষস্তর্ষশ্চ। অন্যত্র—কামস্তু কামনা স্মৃতঃ।" অর্থাৎ কামশব্দের অর্থ আশা কিংবা তৃষ্ণা। এই অর্থেই শ্রুতি বলিয়াছেন, "কামাদ্গোপ্যঃ" অর্থাৎ গোপীগণ কৃষ্ণকামনা করিয়া কাত্যায়নীব্রত করিয়াছিলেন। কাত্যায়নী দেবী প্রসন্না হইয়া গোপীগণকে কৃষ্ণপ্রাপ্তি করাইয়া দিয়াছিলেন। এই নিষ্কাম শব্দের অর্থ—নির্ নবিদ্যতে কামো যস্মাৎ, অর্থাৎ পূর্ণকামী; যে কামের দ্বারা গোপীগণ মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণকেও ক্রীতদাসের ন্যায় আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু গোস্বামিগণ ভয় পাইলেন, কারণ তাঁহারা ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক। পাছে লোকসকল কামশব্দের রূঢ়ি অর্থ

ধরিয়া নিষ্কলঙ্ক কৃষ্ণভজনে কলঙ্ক আরোপ করে, তাই তাঁহারা একেবারে কামশব্দের লক্ষণা করিলেন—

"আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম॥"

তবে অনেক স্থলে কামশব্দ ব্যবহার করিয়া তৎপরেই বলিয়াছেন,—

"সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম।
কামক্রীড়া সাম্যে তার কহি কাম নাম॥"

সুতরাং গোপীপ্রেম কামগন্ধহীন। "কাম ঘোর অন্ধকার, প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥" আচ্ছা, কৃষ্ণলীলায় কামশব্দে যাঁহারা প্রাকৃত কাম মনে করেন, তাঁহাদিগকে আমি জিজ্ঞাসা করি, কামী পুরুষ শতকোটি রমণী লইয়া একত্রে কখনও নিজ কামচেষ্টা সফল করিতে পারেন কি? আবার তাহাতে আরও একটি আশ্চর্য্যের বিষয়—

"শতকোটি গোপীতে নহে কাম নির্ব্বাপণ।
ইহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার কুণ॥"

আরও দেখুন—সখীগণ, রূপে, কলে, কুলে, শীলে, কোন অংশেই শ্রীমতী অপেক্ষা কম নহেন; কিন্তু কামগন্ধ না থাকায় তাঁহাদের কি মধুর স্বভাব!

সখীর স্বভাব এক অকথ্য-কথন।
কৃষ্ণ সহ নিজলীলায় নাহি সখীর মন॥
কৃষ্ণ সহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজ কেলি হৈতে তাহে কোটি সুখ পায়॥

কামগন্ধ থাকিলে কোন কামিনী অন্য কান্তাসহ মিলিত কান্তকে দর্শন করিয়া কখনও কি সুখী হইতে পারে? না তাহার দ্বিগুণ দুঃখ উপস্থিত হয়? আবার শ্রীমতী কি বলিয়াছেন, শুনুন;—

"আমি কৃষ্ণপদ-দাসী, তিঁহো রস সুখরাশি,
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাৎ।
কিবা না দেন দরশন, জারে মোর তনুমন,
তবু তিঁহো মোর প্রাণনাথ ॥
সখি হে শুন মোর মনের নিশ্চয়।
কিবা অনুরাগ করে, কিবা দুঃখ দিয়া মারে,
মোর প্রাণেশ কৃষ্ণ অন্য নয় ॥
ছাড়ি অন্য নারীগণ, মোর বশ তনুমন,
মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়া।
তা সবারে দেন পীড়া, আমা সনে করে ক্রীড়া,
সেই নারীগণে দেখাইয়া ॥
কিবা তিঁহো লম্পট, শঠ ধৃষ্ট সুকপট,
অন্য নারীগণ করি সাথ।
মোরে দিতে মনঃপীড়া, মোর আগে করে ক্রীড়া,
তবু তিঁহো মোর প্রাণনাথ ॥
না গণি আপন দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ,
তাঁর সুখে আমার তাৎপর্য্য।
মোরে যদি দিল দুঃখ, তাঁর হয় মহাসুখ,
সেই দুঃখ মোর সুখবর্য্য ॥
যে নারীকে বাঞ্ছে কৃষ্ণ, যার রূপে সতৃষ্ণ,
তারে না পাইয়া হয় দুঃখী।
মুঞি তার পায়ে পড়ি, লঞা যাঙ হাতে ধরি;
ক্রীড়া করাইঞা করোঁ সুখী ॥"

কামগন্ধ থাকিতে প্রধানা নায়িকার মুখে এরূপ কথা সম্ভব হইতে

পারে কি? আর এক কথা আপনি বলিয়াছেন—কান্তান্তর-সম্মেলনে শ্রীরাধার মান হইল কেন? এই মান হইবার হেতু কান্তান্তর-সম্মেলন নহে; কারণ শ্রীমতী মান অবস্থায় সখীগণকে বলিয়াছেন, 'সখি, যে রমণী কৃষ্ণসুখ না বুঝিয়া আত্মসুখে বিমোহিত হয় এবং শিরীষকুসুম-সুকোমল কৃষ্ণাঙ্গে নখাঘাত, ভূষণাঘাত করিতে ব্যথিতা না হয়, তাহাকে কৃষ্ণপ্রেয়সীগণগণনায় গণ্য করা কখনই উচিত নহে। হায় হায়! রসিকশিরোমণি নাগররাজ যদি যোগ্যা নায়িকাসহ কেলিবিলাসে দিনযামিনী যাপন করিতেন বা করেন, তাহাতে আমার বিন্দুমাত্রও দুঃখ নাই। সখি! কি আর বলিব? তৎকালে প্রাণনাথের যে যে অঙ্গে আমার দৃষ্টি পড়িতে লাগিল, সেই সেই অঙ্গেই সেই পাষাণী কামকুহকিনীর কঠিন ব্যবহারের পরিচয় পাইয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তাই আমি তাহাকে বলিলাম, "যাও শঠ, আমার সম্মুখ হইতে অন্তরে যাও।" বুঝুন, এই মান কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য কি স্বকামের পরিচায়ক? গোপীদের নিজদেহে যে মার্জ্জন, ভূষণ, সুগন্ধিধারণ, কেশসংস্কার প্রভৃতি দেখা যায়, তাহাও আত্মসুখের জন্য নয়; সেও কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য। কারণ কোনও সময়ে কোন কেলিবিলাসাদিতে গোপীদিগের বেশভূষা স্থানচ্যুত হইলে শ্রীকৃষ্ণ নিজহস্তে তাহাদিগের সেই বেশভূষা পূর্ব্ববৎ যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া দেন। তাই গোপীগণ কৃষ্ণসুখহেতু সুসজ্জিতা হইয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিয়াছেন;—

"তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজদেহে প্রীত।
সেহোত কৃষ্ণের লাগি জানিহ নিশ্চিত॥
এই দেহ কৈল আমি কৃষ্ণে সমর্পণ।
তাঁর ধন তাঁর এই সম্ভোগ সাধন।

এ দেহ দর্শনে স্পর্শে কৃষ্ণ সন্তোষণ।
এই লাগি করেন দেহের মার্জ্জন ভূষণ॥
আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ।
এই সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গ মুখ॥
গোপীশোভা দেখি কৃষ্ণের শোভা বাড়ে যত।
কৃষ্ণশোভা দেখি গোপীর শোভা বাড়ে তত॥
এই মত পরস্পর পড়ে হুড়াহুড়ি।
পরস্পর বাড়ে কেহ মুখ নাহি মুড়ি॥
কৃষ্ণের সুখ হয় গোপীর রূপগুণে।
তাঁর সুখে সুখবৃদ্ধি হয় গোপীগণে॥
অতএব সেই সুখ কৃষ্ণসুখ পোষে।
এই হেতু গোপীপ্রেমে নাহি কামদোষে॥”

ভারতী। আমি আজ যে কত আনন্দ লাভ করিলাম, তাহা আর কি বলিব! শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এই সকল পয়ার আমি অনেকবার পাঠ করিয়াছি; কিন্তু এরূপ অর্থ কখনও আমার বোধগম্য হয় নাই। আর একটী কথা—ভক্তিমার্গাবলম্বিগণ মুক্তিকে এত তুচ্ছ করেন কেন?

বাবাজী। ভগবান্ নিজে বলিয়াছেন—

সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

সালোক্য অর্থ সমানলোকে অর্থাৎ একক্ষেত্রে বাস। ধরুন, যেমন একটী গরীব লোক কোনও একটী সাহেবের দৃষ্টিতে পড়িয়া গেল। সাহেব বিলাত যাওয়ার সময় তাহাকে সঙ্গে লইয়া গিয়া বিলাতে ছাড়িয়া দিলেন। সেই গরীব ব্যক্তি ভারতেশ্বরীর সমানলোকে বাস করিয়া কি সুখ পাইবে?

জীব নিজকর্ম্মানুযায়ী স্থাবরদেহে কিংবা সর্প, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, দেব বা মানবাদি জঙ্গমদেহে ভগবদ্রাজ্যে বাসের নিমিত্ত বহু কৃচ্ছ্রসাধ্য তপস্যা করিয়া যে সুখ প্রাপ্ত হইবে, অবৈতনিক বা স্বল্প বেতনভোগী অর্থাৎ কৃপা প্রাপ্ত বা সামান্য সাধনপরায়ণ ভগবদ্দাসদাসী অনায়াসে তাহা হইতে কোটিগুণ সুখ লাভ করিয়া থাকে। সার্ষ্টি অর্থ সমান ঐশ্বর্য্য, সামীপ্য অর্থ নিকটে বাস, সারূপ্য অর্থ সমানরূপ অর্থাৎ দ্বিভুজ, চতুর্ভুজ ইত্যাদি। যদি কোনও সুখ আস্বাদনই না হইল, তবে ঐশ্বর্য্যেই বা কি হইবে? সমানরূপে নিকটে বাস করিলেই বা কি ফল হইবে? একত্ব অর্থ নির্ব্বাণ অর্থাৎ তাঁহার সঙ্গে মিশিয়া যাওয়া। ভাবিয়া দেখুন, এই পঞ্চপ্রকার মুক্তিতে কি সুখ লাভ হইতে পারে? কাজেই সুচতুর ভগবদ্ভক্তগণ অতিশয় কষ্টসাধ্য অকিঞ্চিৎকর ফল্গুবৎ মুক্তিকে হেয় জ্ঞান করিয়া থাকেন। এমন কি, বিনাক্লেশে ভগবান্ যদি ঐ পঞ্চবিধা মুক্তি দিতে চান, ভক্তগণ একমাত্র ভগবৎসেবা ব্যতিরেকে তাহা গ্রহণ করেন না।

ভারতী। উচ্চৈঃস্বরে নাম করিবার দরকার কি? তন্ত্রাদিতেও জপেরই প্রশংসা করিয়াছেন,—

"জপাৎ সিদ্ধির্জপাৎ সিদ্ধির্জপাৎ সিদ্ধির্ন সংশয়ঃ।"

বাবাজী। মহাপ্রভু কলিযুগে সংকীর্ত্তন-যজ্ঞেই শ্রীকৃষ্ণের আরাধনার বিধান করিয়াছেন,—

"হর্ষে প্রভু কহে শুন স্বরূপ রামরায়।
নামসংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়॥
সংকীর্ত্তনযজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ আরাধন।
সেই সে সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

একটী লোক যাহা কিছু ধন উপার্জ্জন করে, তদ্দ্বারা পাড়াপ্রতিবেশী, দুঃখী দরিদ্র এবং আত্মীয় স্বজনদিগকে পোষণ করিয়া যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকে, নিজে তাহাই উপভোগ করে। আর একজন যাহা কিছু উপার্জ্জন করে, কেবল আত্মীয়,স্বজনদিগকে লইয়া নিজে ভোগ করে এবং অপর এক ব্যক্তি স্বোপার্জ্জিত ধন কেবল নিজেই উপভোগ করিয়া থাকে। এই তিন জন লোকের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ?

ভারতী। ইহা আর কে না বুঝে! যে ব্যক্তি দশজনকে পোষণ করিয়া থাকে, সেই শ্রেষ্ঠ।

বাবাজী। তবেই দেখুন, মনে মনে জপ করিলে নিজে কৃতার্থ হওয়া যায়। ঘরে বসিয়া ধীরে ধীরে নাম করিলে নিজে গোষ্ঠীসহ কৃতার্থ হওয়া যায়। আর উচ্চৈঃস্বরে নামকীর্ত্তনে মনুষ্য, ত দূরের কথা—স্থাবরজঙ্গম, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ পর্য্যন্তও নামের ধ্বনিতে চরিতার্থ হইয়া প্রেমভক্তি লাভ করিয়া থাকে। এই কারণেই মহাপ্রভু বলিয়াছেন :—

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥

সংকীর্ত্তন হইতে পাপ সংসার নাশন।
চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বভক্তি সাধন উদ্গম॥
কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন॥"

এব কলিযুগে নামকীর্ত্তন ভিন্ন আর গতি নাই। যাগযজ্ঞ, ব্রত, হোম, জপ, ধ্যান, যোগাদি কলিকালে কিছুই হইবে না; তাই শ্রীনাম

শ্লোকে তিন বারে সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগোচিত ক্রিয়াসকল নাহি করিয়াছেন।

ভারতী মহাশয় আনন্দে আত্মহারা হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন ইঁহারাও সকলে খোল করতালযোগে কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন এই হইতে প্রেমানন্দ ভারতী মহাশয় ইঁহার দাদা হইলেন এবং ইঁ তাঁহার ছোট ভাই হইলেন। এইরূপে পরস্পর মিলিত হইয়া কীর্ত্তনানন্দে দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

ইতি প্রথম খণ্ড।

